বার্ষিক
Sukhen Gupta
শিশু-সাথী

বার্ষিক
শিশু-সাথী

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড্ সন্স্ লিমিটেড
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৩, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা

চার টাকা

সূচী

এসেছি

এসেছি আমি ফিরে,
আলোক রথে এসেছি আমি
চিনিতে পার কি রে?
এনেছি শুভ সম্ভাবনা কত—
আধেক ফোটা পারিজাতের মত,
স্নান করিয়া আসিয়াছি
সপ্ত সাগর নীরে।

এনেছি আমি সাথী—
ইন্দ্রধনু আঁকা সুদিবা
জোছনা মাখা রাতি।
কমলে আমি দিয়াছি ভরি' দীঘি
পেয়েছে নব পুচ্ছ-শোভা শিখী,
দিনু দোদুল কাশ চামরে
আমি রজত ভাতি।

এনেছি জয়টিকা,
আরতি দীপ জ্বালায়ে দেছে
জ্বালামুখীর শিখা।
চাঁদ-মালা যা দিল মেনকারাণী—
এনেছি আমি,—আদর কত জানি,
আশীর্ব্বাণী পাঠায়ে দেছে
কেদার বদরিকা।
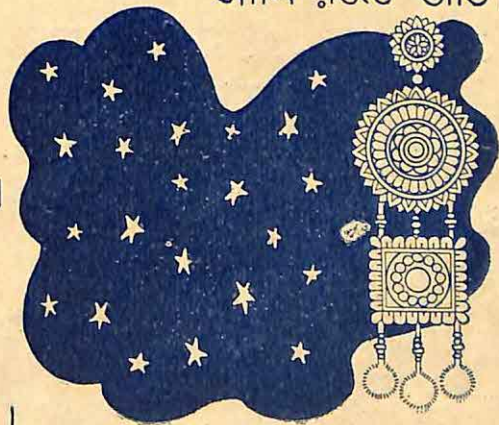
৪

শুনাবো তোমাদিকে
পূর্ণিমা চাঁদ যে কথা কয়
সাগর লহরীকে।
গৌরবময় যেই কাহিনীটিরে
মুক্তাকে তার শুক্তি কহে ধীরে,
সুদূরের যে সংবাদ দেয়
সমীর বনানীকে।

৫

সমুন্নত শির,
তোমরা হবে প্রতিভাতে
গর্ব্ব অবনীর।
সারথি নন, এবার হরি সাথী
হবে দিব্য সমুজ্জ্বল এই জাতি,
ভীষ্ম সম সংযমী আর
পার্থ সম বীর।

৬

সফলা হবে বাণী
তোমাদের এই ভাষাই হবে
সকল ভাষার রাণী।
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর দান—
হবে নাকো লাবণ্য তার ম্লান;
যুগে যুগে আনবে দেবের
প্রসন্নতা টানি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রতিশোধ
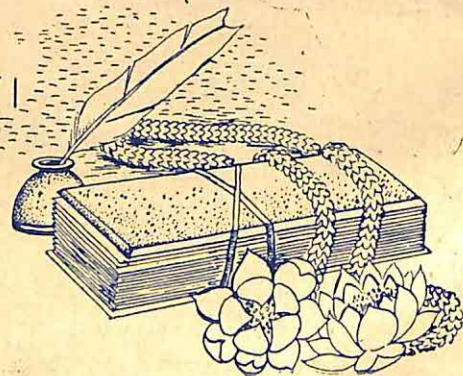
শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

ছেলেটা যখন প্রথম এ-বাড়ীতে এসেছিলো, তখন রংচটা টিনের সুটকেস আর রংজলা শতরঞ্চে মোড়া দৈন্যদশাগ্রস্ত বিছানাটার সঙ্গে নিজের যে নামটা এনেছিলো, সেটা রীতিমত জমকালো।

জিনিসের দৈন্যের পরিপূরক হিসেবে নামের বাহারটা অবশ্য কাজে লাগেনি, বরং হাসির খোরাকই জুগিয়েছিলো সকলের। সময়ে অসময়ে হাসবার জন্যে সেটা মনে না রেখে যে ভুলে গেছে সবাই, এই রক্ষে।

সেই মূল নামটা ছিলো জ্যোতিরিন্দ্রভূষণ।

নামটার ব্যাকরণসম্মত ঠিক কোনো মানে আছে কিনা সে চিন্তা ছেড়ে দিলেও—অবস্থার সঙ্গে যে নেহাৎ বেখাপ্পা, আর চেহারার সঙ্গে নিতান্তই বেমানান, এটা অস্বীকার করা চলে না।

গ্রামের ইস্কুলে 'ফ্রী' পড়ে, কলকাতার কলেজে পড়তে আসার ছুঁতোয় দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের ঘাড়ে এসে পড়া রোগা টিন্‌টিনে কালো মুখচোরা ছেলেটার হাতে বহরে এতো বড়ো একটা নাম! বাব্বা!

অতএব 'জ্যোতিটা' লুপ্ত হলো—'ইন্দ্র'ত্ব গেলো ঘুচে। রইলো শুধু—'ভূষণ'।

এই বেশ! ডাকতে সুবিধে, অবস্থায় খাপ খায়।

ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার, ধাপে ধাপে এগোতে থাকে ভূষণ, নিঃশব্দে সকলের চোখের আড়ালে।

ভূষণ কে, এ বাড়ীতে ও কেন, সেকথা এখন আর কারুর মনে পড়ে না। ও কখন খায়, কখন শোয়, কি করে আর কি করে না, সে খবর রাখবার দায় পড়েছে কার?

দৈবাৎ কোনো দিন যদি ভাত না খেলো, বামুনঠাকুর রান্নাঘরের পাট চোকাবার সময় হাঁক পেড়ে বলে—বড়োমা, ভূষণ দাদাবাবু আজ ভাত খায়নি।

'বড়োমা' হয়তো দোতলা থেকেই বিরক্ত হয়ে বলেন—কেন? তার আবার কি হলো আজ?

ভূষণকে 'দাদাবাবু' বলে পরিচয় দিলেও সত্যিকার 'দাদাবাবুর' মতো মান্য যে তাকে দেবার দরকার নেই, তা' চাকর-বাকরেও জানে, তাই বাঙলা জানা হিন্দুস্থানী ঠাকুর সুর টান করে বলে—কি জানি! আজ তো ওই মর্জি হলো!

বড়োমা কর্ত্রীর কর্তব্য সারতে—হাঁড়ির ভাতে জল ঢেলে দেবার উপদেশ দিয়ে শুয়ে পড়েন। ব্যস!

ভাত না খাওয়ার পরবর্তী ষ্টেজে হয়তো তিন বেলা পরে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা কেউ খবর দেয়—ভূষণ কলেজ ফাঁকি দিয়ে মজা করে খালি খালি বিছানায় শুয়ে আছে।

তখন ভূষণ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা সুরু হয়—ও যে নিজের দোষে রোগ করে একদিন বাড়ীর সকলকে মুস্কিলে ফেলবে, এতে আর সন্দেহ থাকে না কারুর। সাবু-বার্লির কথা একবার ওঠে, তারপর থেমে যায়। হয় বাজার থেকে আনাতে ভুল হয়, নয়তো রাঁধতে ভুল হয়ে যায়। কিছুই যদি ভুল না হয়, হয়তো উনুনে আগুন থাকে না।

কিন্তু মজা এই—শেষ পর্যান্ত মুস্কিলে পড়ার সুযোগ আর কারুর হয় না।

কোনো একবেলায় আবার দেখা যায়, রান্নাঘরের দাওয়ায় একমনে ভাত খেয়ে যাচ্ছে ভূষণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ভাতটা একটু বেশী খায়।

তবু—এ একরকম সুখের জীবন।

সুখ না হোক স্বস্তির।

কেউ যে ওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না, এই ঢের!...পড়ে-শুনে মানুষ হবে এই ইচ্ছেটা ভূষণের মনে এতো জোরালো হয়ে কাজ করে যে, অসুখের সময় এক বাটি সাবুর আশা করে করে ঘুম এসে যাবার সময় চোখ দিয়ে যে গরম গরম জলগুলো উথলে পড়ে বালিশ ভিজিয়ে দেয়, সেটা আপনিই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায় এক সময়।

কিন্তু দৈবের খেয়ালে এ সুখটুকুও ঘুচলো।

ঘোচাবার জন্যে দৈবপ্রেরিত হয়ে যিনি এলেন, তিনি কর্ত্তার বড়ো মেয়ে সুধারাণী।

তাঁর বর মস্ত বড়ো চাকরে, বোম্বাইতে থাকেন—পাঁচ-সাত বছর পরে পরে একবার আধবার বাপের বাড়ী আসেন।

তিনি এসেই—কি করে জানি না, ভূষণকে আবিষ্কার করে বসলেন। সেই হলো স্বস্তি ঘোচার গোড়া।

সুধারাণী দিন দুয়েক লক্ষ্য করে একদিন খেতে বসে বিরাট মজলিশের মধ্যে এই প্রশ্নটি ফেললেন,—ছোঁড়াটা যে তিনবেলা খায়দায়, তা গেরস্থর কি উপকারে লাগে?

শুনে সুধারাণীর মা খুড়ী পিসামারা মুখ চাওয়াচায়ি করেন।

কি উপকারে লাগে? দেড়জনের রেশন উদরস্থ করা ছাড়া? সত্যিই তো।

কই একথা তো কোনো দিন কারুর খেয়াল হয়নি?

পিসীমা বলেন—উপকার ঘোড়ার ডিম। গেরস্থর বোধ হয় আর জন্মে ওর কাছে কিছু ঋণ ছিল, তাই শোধ হচ্ছে।

—ওসব কথা বাদ দাও—সুধারাণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এই বাজারে একটা লোক পোষা অমনি? কেন চাকরটাকে বিদেয় করে দিলেই হয়? বাজার দোকানগুলো আর লাটসাহেব করতে পারবেন না?

—বাঃ! ও যে পড়ে।...খুড়ী বলেন।

—পড়ে তো তোমাদের তিনকুল উদ্ধার করবে। যে রাঁধে সে আর চুল বাঁধে না? তোমাদের এই সব বেহিসেবি কাণ্ড দেখে আমার যেন হাড় জলে যাচ্ছে। মোসো কালই তাড়াচ্ছি চাকরটাকে।

সুধারাণী মোটা শরীর, মোটা মোটা গয়না, আর বরের মোটা মাইনের দাপটে সবাইকে স্তম্ভিত করে রাখে। কেউ কথা বলতে পারে না ওর ওপর।

অতএব চাকর বিদেয় হয়।

এরপর ভূষণ থেকে 'ভূষণো'। বারবার ডাকতে হলে যা হয়ে থাকে।

—'কেন, ডাক্তারখানায় যাওয়া ভূষণো পারে না?'......'রেশন আনা—ভূষণো পারে না?'...'গম পেষাই করাতে ভূষণোকে দাও না'...'বাড়ীর ছোট ছেলেগুলোর জন্যে পয়সা খরচ করে মাষ্টার রাখা কেন, ভূষণো সকাল সন্ধ্যে দু'ঘণ্টা পড়াতে পারে না?'...

এতোদিন ভূষণকে সবাই ভুলে থাকতো, সুধারাণী আর কাউকে ভুলতে দেয় না।

অনেক দুঃখে একটু সময় করে যেই পড়তে বসে অমনি তলব হয়—'ভূষণ, চট করে দুটো কাগজি লেবু নিয়ে এসো তো।'...'ভূষণ, শীগগির একপোয়া দই—তাড়াতাড়ি'...'ওহে, তোমার বইখাতা রেখে একবার এসো দিকিন এদিকে, একবার শ্যামবাজারে যেতে হবে'......'সব সময় এতো কি পড়িস ভূষণ? যা দিকিন একবার পুরুত-বাড়ী মনসার পূজোটা দিয়ে আয়'—চলছেই।

এতো দিন সবাই যে ভুলটা করে ফেলেছিলো, সেটার শোধ তুলতে যেন উঠে পড়ে লাগে প্রত্যেকে।...তা'ছাড়া—চাকরের কাজগুলো করবে কে?

এছাড়া—কলেজ থেকে এসেই সুধারাণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পার্কে বেড়িয়ে আনা, সকালবেলা যখন সুধারাণী স্নান করতে যায় ওর কোলের ছেলেটাকে আগলানো, কেমন করে কে জানে ভূষণের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে গেছে।

তবু চলে যায় দিন। 'মানুষ' হবার সাধনা তো সহজ নয়।

তার দুর্দ্দান্ত ইচ্ছেটা ভেতরের দুর্দ্দান্ত রাগের গলা টিপে মারে। কোথায় চলে যাবে? এই রাক্ষস সহরে কোথায় আছে একটু আশ্রয়? কোথায় মিলবে দু'বেলা দু'থালা ভাত?

চলে গেলেই তো যেতে হবে গ্রামের বাড়ীতে। জলাঞ্জলী দিতে হবে লেখাপড়ার আশায়।

তার চেয়ে সহ্য করাই ভালো।…কিন্তু সুধারাণী কি টি'কে থাকতে দেবে ওকে? সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে ভূষণের সহ্যশক্তির শেষ সীমাটা দেখবে।…না কি একটা নিরীহ মানুষকে উত্যক্ত করাতেই ওর আনন্দ?…দুষ্টু ছেলেরা যে উৎকট আনন্দ পায় পাখীর ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে, ব্যাঙকে খোঁচা মেরে?

কিসের একটা ছুটিতে সুধারাণীর বর বিজয়বাবু এলেন শ্বশুর-বাড়ী।

মান্যগণ্য জামাই, বাড়ীতে হৈ-হৈ পড়ে গেলো। বাড়ীসুদ্ধ সবাই ভেবেই পায় না,—জামাইকে স্বর্গে রাখবে কি মর্ত্ত্যে রাখবে। বুঝেই উঠতে পারে না—কোন্ নন্দন কাননের ফল পেড়ে এনে খাওয়াবে।

অতএব—বুঝতেই পারছো—কপাল ভাঙলো ভূষণের।

তাকে অনবরত ছুটোছুটি করতে হচ্ছে—লেক মার্কেট থেকে নিউ মার্কেট, মাণিকতলা থেকে হাতীবাগান, কলেজ ষ্ট্রীট থেকে কালীঘাট, হাওড়া থেকে শেয়ালদা।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এক করে তিনরাজ্যের দুষ্প্রাপ্য জিনিস জোগাড় করে খাওয়াতে না পারলে আর জামাই-আদর কি? কুমীরের সাইজে গল্‌দা চিংড়ি, কচ্ছপের সাইজে কাঁকড়া, তরমুজ-প্রমাণ ল্যাংড়া আম, আর হাতীর ডিমের মতো হাঁসের ডিম এনে জামাইয়ের পাতে ফেলতে পারলে তবেই না বাহাদুরী!

সেই বাহাদুরীর যোগান দিতে বেচারা ভূষণের প্রাণান্ত।

কলেজ কামাই হচ্ছে—তা হোক। কলেজ তো পালিয়ে যাবে না? কিন্তু জামাই যে পালাবে!

তিন দিন কামাইয়ের পর সেদিন ভূষণ কলেজে যাবেই প্রতিজ্ঞা করে ভোর থেকে সাত বাজার ঘুরে সারাদিনের মতো রসদ জোগাড় করে রেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিল, সুধারাণী এসে অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

—ব্যাপার কি ভূষণ? এই সকালবেলাই পেট জ্বলে উঠেছে তোমার?

ভূষণ মুখ লাল করে বলে—কলেজ কামাই হচ্ছে রোজ রোজ—

—কলেজ? আজ তুমি কলেজে যাবে নাকি?

ভূষণ কুণ্ঠিত ভাবে যা বলে তার মর্ম্ম—যখন-তখন কামাই করে করে এমাসে তার পার্সেণ্টেজ ভীষণ কমে গেছে, কাজেই আজ আর না গেলে চলবে না।

সুধারাণী আরো অবাক হয়ে বলে—ইস্কুল (ইচ্ছে করে 'ইস্কুলই' বলে সে) না গেলে চলবে না—আর সারাদিন বাড়ী না থাকলে চলবে? তুমি যে অবাক করলে ভূষণ!

—সব তো এনে রাখলাম!…নেহাৎ নরম হয়ে বলে ভূষণ।

শুনে কিন্তু বেজায় হেসে ওঠে সুধারাণী; বলে—এনে রাখলে কি বলো? বেলা আড়াইটের সময় যে তোমাদের জামাইবাবুর আইসক্রীম

সন্দেশ আর ঠাণ্ডা দই খাওয়া অভ্যেস, সেটাও এনে রেখেছো নাকি? তা হলে—রেফ্রিজারেটারও এনেছো বোধ হয় একটা?

ভূষণের কেমন রাগ উঠে যায়। তবু অনেক কষ্টে সামলে বলে—তু'সের বরফ আনা আছে—তাইতে বসিয়ে রাখলে চলবে না?

—ভদ্রলোকের চলে না। তোমাদের 'নালতেপুরের' জামাইয়ের চলতে পারে। যাক্, এসে পড়েছে যখন তোমাদের হাতে, তোমাদের দয়ার ওপর নির্ভর!…খেয়ে উঠে ওঁর জুতো তু'জোড়া একটু বুরুশ চালিয়ে রেখে যেও দিকিন।

হঠাৎ ভূষণ একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসে। খেতে খেতে জলের গ্লাসে হাত ডুবিয়ে উঠে পড়ে, বলে ওঠে—আমি পারবো না।

—পারবে না?…সুধারাণী যেন তামিল ভাষা শুনেছে—পারবে না কি গো? ওইটুকুতে তোমার লেট্ হয়ে যাবে?

—লেট্ হওয়ার কথা নয়—জুতোটুতো ঝাড়তে পারবো না আমি।

—কী অনাছিষ্টি কথা ভূষণ? বড়ো ভগ্নীপতি গুরুজন—তার জুতোয় হাত দিলে এতো অপমান হবে তোমার?…সুধারাণী যেন আকাশ থেকে পড়েছে!—তোমার কথা শুনলে গা জলে যায় বাপু! যাও যাও বেশ ভালো পালিশ হয় যেন দেখো।

—কেন মিথ্যে বলছেন সুধাদি, আমি পারবো না।…বলে ভূষণ চলে যায়।

আর সুধারাণী যেন ফেটে পড়ে। যতো পারে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, না যদি পারে—এই দণ্ডে যেন পথ দেখে ভূষণ। অতো যার টনটনে মান তার পরের বাড়ীর ভাত খেয়ে থাকতে হয় না।…কই দু'বেলা দু'গামলা ভাত সাঁটতে তো লজ্জা করে না?…কাজ করতেই বুঝি যতো লজ্জা?

ঘণ্টাখানেক ধরে রাগের জের চলে সুধারাণীর।

বাড়ীতে মা ঠাকুরমাও সাহস করে কিছু বলতে পারেন না। মেজাজি মেয়ে…বড়োলোক জামাই…এখুনি হয়তো রাগ করে চলে যাবে। ওরা প্লেনে চড়ে যায় আসে—সোজা কথা?

মেয়ে জামাই থাকলো।

কিন্তু ভূষণ সেই যে গেলো আর ফিরলো না।

'মানুষ' হবার সাধটা তার এতো দিনে ঘুচলো বোধ হয়।

যাক ভূষণ গেলো—তার জন্যে কারুর এতো কিছু মায়া উথলে ওঠেনি। গেলো তো গেলো। কিন্তু তার সঙ্গে—বড়োলোক জামাইয়ের আটশো টাকা দামের হীরের আঙ্‌টিটা যে গেলো?

একটু আগেই চৌবাচ্চার পাড়ে ভুলে ফেলে রেখে এসেছিলেন বিজয়বাবু, তারপরেই ভূষণ গিয়েছিলো স্নান করতে।

ত্রিভুবন খুঁজে সে আঙ্‌টি তো আর পাওয়া গেলো না?

তবে? কে নেবে সে জিনিস ভূষণ ছাড়া?

হিসেবে কি বলে? দুই আর দুইয়ে চারএর মতো নিশ্চিত নয় কি?

স্তম্ভিত হয়ে গেলো সবাই! ভূষণ! এমন কাজ ভূষণের দ্বারা সম্ভব? এ যে নেহাৎ অবিশ্বাস্য। কিন্তু লাফালাফি করতে লাগলো সুধারাণী।

দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষলে যে কি হয় তাই বোঝাতে লাগলো সকলকে ডেকে ডেকে। ভূষণকে জেলে না পুরে ছাড়ছে না, এ প্রতিজ্ঞাও করতে ছাড়লো না।

তবে হলো না কিছুই।

বিজয়বাবুর ছুটি ফুরিয়েছিলো—চলে গেলেন।—'সামান্য' আটশো টাকার জিনিসটার জন্যে মাথা ঘামাবার মতো সস্তা মাথা তাঁর নয়।

যাবার সময় সুধারাণী বারবার বলে গেলো, ভূষণ যদি কোনো দিন এ বাড়ীর ছায়া মাড়ায় তা হলে যেন গলায় গামছা দিয়ে আঙ্‌টি আদায় করা হয়।

কিন্তু কোথায় বা ভূষণ আর কোথায় বা তার গলা! কতো গামছা ছিঁড়লো বাড়ীর, ভূষণের গলায় ওঠবার সৌভাগ্য আর হলো না কোনোটার।

দিন···মাস···বছর।

কতোগুলো বছর কেটে গেলো, ভূষণের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না।

পৃথিবী ঘুরছে···ঘুরছে মানুষের ভাগ্য।

যে উপরে ছিলো সে নেমে পড়ছে নীচে···নীচের তলার জীব জায়গা করে নিচ্ছে উপরে।

সুধারাণী আজ নিতান্ত দুঃখী।

অনেক দিন হয়ে গেলো—প্লেন দুর্ঘটনায় পা ভেঙে গিয়ে চাকরিটি গেছে বিজয়বাবুর, সপরিবারে তিনি এখন শ্বশুর-বাড়ীর গলগ্রহ।

যখন টাকা ছিলো অনেক, তখন বাবুয়ানা ছিলো অগাধ। কাজেই জমানো টাকাফাকা কিছুই ছিলো না, এখন একেবারে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। বলতে হবে না বোধ হয়—হাতীর ডিমের মতো হাঁসের ডিম এখন ঘোড়ার ডিমে পরিণত হয়েছে। বেলা আড়াইটের সময় 'আইসক্রীম সন্দেশ' আর 'ঠাণ্ডা দই'? শীতকালে ল্যাংড়া আম, আর গরম কালে কপি কড়াইশুঁটি? সে কি রূপকথার গল্প? না কি স্বপ্ন?

ভূষণের চাইতেও দুরবস্থা আজ সুধারাণীর পনেরো বছরের ছেলেটার। বাড়ীর সমস্ত কাজ না করলে মামাদের ধমকে ধমকে তার পেটের পীলে চমকে যায়।

বামুনঠাকুরকে জবাব দেওয়া হয়েছে, দুটি বেলা রান্না ঘাড়ে পড়েছে সুধারাণীর। 'বাজার' তো ক্রমেই খারাপ হচ্ছে আর ক্রমেই চালাক হয়ে উঠছে লোক। ছোটয় বড়োয় সাত-আটটি মানুষকে পোষা যে সহজ নয়, সে কথা আর কারুর বুঝতে বাকী নেই। তা ছাড়া—নিজের মা-বাপ গেছেন মারা। এখন আবার মেয়েটা এতো বড়ো হয়েছে যে বিয়ে না দিলেই নয়।

কিন্তু কে দেবে বিয়ে? কার গরজ পড়েছে?

মেয়ের বিয়ে তো আর সহজ কথা নয়! লুকিয়ে চোখের জল ফেলে সুধারাণী, আর ভগবানকে ডাকে।

এমনি একদিনে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

বললে হয়তো নেহাৎ বানানো গল্পের মতো শোনাবে, কিন্তু সত্যি ঘটনাও অনেক সময় গল্পের চেয়ে অসম্ভব হয়।

সুধারাণীর ছেলে দু'হাতে বাজারের থলে আর তেলের ভাঁড় নিয়ে বাড়ী ঢুকে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—বড়োমামা, আপনাকে একজন ডাকছেন।

—কে ডাকছে ?···বলে বড়োমামা এগিয়ে এলেন।

—জানি না। মনে হলো যেন কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক চিনলাম না। মস্তো গাড়ী করে এসেছেন—

'মস্তো গাড়ী' শুনে বড়োমামা ব্যস্ত হয়ে ছোটেন। আর কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীতে একটা সোরগোল ওঠে—জ্যোতিরিন্দ্র এসেছে···জ্যোতিরিন্দ্র ··

জ্যোতিরিন্দ্র ? কে সে ? কই, কারুর তো মনে পড়ছে না !

চাপাগলায় বলাবলি হয় 'ভূষণ !' 'ভূষণ ওঃ !' তাই বটে, ভূষণের ভালো নামটা জ্যোতিরিন্দ্রই বটে।···এতো বড়ো গাড়ী চড়ে এতো দামী স্যুট পরে যে এতো দিন পরে দেখা করতে এলো, তাকে কি আর ডাকনামে ডাকা চলে ?

অতএব—জ্যোতিরিন্দ্র ! বলতে ভারিক্কী, অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়।

বাড়ীসুদ্ধু সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লেগে গেছে—যেন ভূষণের বাড়তি দু'খানা ডানা গজিয়েছে।

বড়োদালানে খেতে দেওয়া হয়েছে ভূষণকে, বাড়ীর মধ্যে সব থেকে ভালো আসনটা পেতে। এতো কম সময়ের মধ্যে যতোটা আয়োজন করা সম্ভব, ত্রুটি হয়নি তার।

সুধারাণীর খুড়ীমা, জ্যেঠীমা, পিসীমার দল চারদিকে ঘিরে বসে 'এটা খাও' 'ওটা খাও' করছেন, আর নানা ছলে গল্প করছেন—জ্যোতি হঠাৎ ওরকমে চলে যাওয়ায় কী সাংঘাতিক দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন তাঁরা, আর কী মনোকষ্টই পেয়েছিলেন !

একেবারে ঘরের ছেলের মতো—তাকে হারিয়ে কষ্ট হবে না ?

কম খোঁজাটাই কি হয়েছিলো ?···কি করে জানবেন, হঠাৎ সে দেশ ছেড়ে চলে গেছে—একেবারে মাদ্রাজে।

শুনতে শুনতে ভূষণ হঠাৎ মুখ তুলে হেসে বলে—আমি চলে যাওয়ার পর আর কিছু খোঁজেননি আপনারা ? মনে পড়ছে না ?

চমকে উঠে সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করে।···

মনে পড়ছে বৈ কি !···প্রত্যেকেরই মনে পড়েছে সেই আঙটির কথা···কিন্তু এখনকার জ্যোতিকে—ভূষণ বলে ভাবতেই পারা যায় না যে !···তাই মনের কথা মনেই চাপা দিতে হয়েছে।

খেতে খেতে বাঁ হাতে পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে ভূষণ। আর কিছুই নয়—সেই আঙ্‌টি। বলে—চিনতে পারছেন? কী সর্ব্বনাশ!

সত্যিই সে আঙ্‌টি তবে নিয়েছিল ভূষণ?...অবাক হয়ে বাক্যহারা হয়ে গেছে সবাই!

ভূষণ কিন্তু সকলকে আরো অবাক করে দিয়ে জোরে হেসে উঠে, বলে—কি ভাবছেন? চোরটার সাহস তো কম নয়? দশ বছর পরে সেই চোরাই মাল নিয়ে আবার এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোতে সাহস করেছে? তাই না?

—'না না, সে কি' —'আমরা তো—ইয়ে—' —'মোটেই আমরা—'

—বাঃ! কেনই বা সন্দেহ করবেন না? আমিও গেলাম—হাজার টাকা দামের আঙ্‌টিটাও হাওয়া—কার না সন্দেহ হয়?...কিন্তু বলুন পিসীমা, তখন যদি আমি এসে বলতাম—অসাবধানে পড়ে থাকতে দেখে মজা করে লুকিয়ে রেখেছিলাম ওটা, বিশ্বাস করতেন আপনারা? কক্ষনো না। নিশ্চয় ভাবতেন—লোভের বশে চুরি করে ফেলে এখন সামলাতে পারছে না ছোকরা। তাই কিনা বলুন? এখন বিশ্বাস করবেন জানি, তাই আনতে ভরসা হলো।...বলে হো-হো করে হাসতে থাকে ভূষণ।

এতোক্ষণে আর সকলেও হেসে ওঠে তার সঙ্গে, যেন ভারী একটা মজার কথা হয়েছে।

খাওয়া হলে ভূষণ বলে—কিন্তু সুধাদি এখন আছেন কোথায়? আসলে যার জিনিসটা—

সুধারাণীর খুড়ীমা, যিনি মোটেই দেখতে পারেন না সুধারাণীকে, তিনি ঠোঁট উল্টে বলে ওঠেন—কোথায় আর যাবেন—এইখানেই আছেন। কেন ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলে না? ওই তো মুকুল—সুধার বড়ো ছেলে।

মুকুল! ভূষণ চমকে ওঠে—সেই মুকুল! সেই ফর্‌সা ধবধবে মোটাসোটা হাফপ্যান্ট পরা ছোট্ট ছেলেটা! এই রোগা কালো ময়লা কাপড়জামা পরা! কেন?

সুধারাণীর খুড়ীমা বলেই চলেছেন এদিকে—এই দেখো না—এখনকার দিনে সাত-আটটা মানুষকে পোষা। জামাই তো এ্যাক্‌সিডেন্টে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে পড়ে আছেন আজ ছ'-সাত বছর। সবই আমাদের চালাতে হচ্ছে। সোজা খরচ! কি বলবো—যেমন স্বভাব তেমনিই হয়েছে। জানতো সুধাকে? কী রকম অহঙ্কার ছিলো? এখন একেবারে—

—থাক্ খুড়ীমা...ওই সুধাদি?...বলে ভূষণ আন্দাজীই চলে আসে রান্নাঘরের দোরে।

কিন্তু কোথায় সুধা? রান্নাঘরের কোণে বসে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদছে কেন?

ময়লা ছেঁড়া শাড়ী পরা, হাতে একগাছি মাত্র চুড়ি, রোগা কালো এই মানুষটাই কি সুধারাণী?—মোটা শরীরে মোটা মোটা গহনা পরে যে অহঙ্কারে ফেটে পড়তো?

কিন্তু ভূষণেরও কি সুধারাণীর খুড়ীমার মতো আনন্দ হবে—অহঙ্কারীর দর্পচূর্ণ হয়েছে দেখে?

'মানুষ' হবার জন্যে যে চিরদিনের সাধনা ছিল তার! সবই বৃথা হবে?

ভূষণ দরজার কাছ থেকে একটু সরে এসে ডাকে—ও সুধাদি, আপনি যে বেরোচ্ছেনই না? কী এত কাজে ব্যস্ত?

সুধারাণী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

ভূষণ নমস্কার করে হেসে বলে—খুব মেয়ে তো আপনি? এই দশ বছর ধরে রাগ পুষে রেখে দিয়েছেন?

সুধারাণী অপ্রতিভ হয়ে বলে—রাগ কি বলো ভূষণ? তোমার কাছে মুখ দেখাবার মুখ আমার কই ভাই? যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে—

—থাক থাক হয়েছে—ভূষণ থামিয়ে দেয়—তবু ভালো যে আমার পুরানো নামটা আপনি একটু মনে রেখেছেন। এসে পর্য্যন্ত 'জ্যোতি' 'জ্যোতি' শুনে শুনে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম।…কিন্তু—আপনার কথাটা তো দেখছি মন্দ নয়? চুরি করে ভেগে পড়লাম আমি, আর লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আপনার?…বেশ!…দেখুন, আমার তো লজ্জার লেশ নেই! দিব্যি এলাম—চব্যচোষ্য খেলাম।…কিন্তু সুধাদি, এতো ভালো ভালো রান্না শিখে কেবল মাত্তর নিজের ভাইদের খাওয়াতে হয় বুঝি? ভূষণো হতভাগার ভাগ্যে হবে না?…চলুন এবার এই ভাইটির কাছে।…উহুঁ—কোনো আপত্তি শুনবো না। ছেলেমেয়ে জামাইবাবু সব্বাইকে ধরে নিয়ে পালাবো, দেখি কেমন না গিয়ে থাকতে পারেন?…আচ্ছা, আজ যাচ্ছি—কাল ঠিক হয়ে থাকবেন কিন্তু! আমি বড়দাকে পিসীমাকে বলে টলে ঠিক করে রেখে যাচ্ছি।…ছোট ভাইটির যে মা নেই সেটা মনে না রাখলে চলে? এলোমেলো সংসারটা গুছিয়ে দেবে কে?

* * * *

দশ বছর আগে একদিন এইখানে—এই দালানে দাঁড়িয়েই কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিল ভূষণ—ভবিষ্যতে একদিন সে মানুষ হয়ে বড়োলোক হয়ে সুধারাণীর ব্যবহারের উচিত শোধ নেবে!

সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হলো ভূষণের? তাই মুখে তার অমন প্রসন্নতা?

সত্যই সে তা হলে—মানুষ হয়েছে? হয়েছে বড়োলোক?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জয়াপীড় বিনয়াদিত্য কাশ্মীরদেশের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির সমাদর করিতেন। জয়াপীড়ের সভাপণ্ডিত উদ্ভটভট্ট দৈনিক লক্ষ দীন্নার (কড়ি) বেতন পাইতেন। কুট্টনীমত নামক গ্রন্থ-রচয়িতা দামোদর গুপ্ত এবং মনোরথ, চটক, শঙ্খদত্ত, সন্ধিমান্, বামন প্রভৃতি মহাকবিগণ কাশ্মীররাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। রাজার শিক্ষাগুরু ক্ষীরপণ্ডিত এবং অন্যান্য বিদেশীয় ব্যাকরণবিদের সাহায্যে এই সময়ে কাশ্মীরদেশে মহাভাষ্য নামক সুবিখ্যাত ব্যাকরণগ্রন্থের পঠনপাঠন অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। এমন কি, রাজমন্ত্রী শুক্রদন্তের প্রধান পাচক থক্কিয় পাণ্ডিত্যের জন্য জয়াপীড় কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিল। অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও, জয়াপীড় মাঝে মাঝে খাম-খেয়ালির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেন।

রাজা জয়াপীড়ের পিতামহ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য। কথিত আছে যে, এক লক্ষ পঁচিশ হাজার রথের দ্বারা গঠিত বিরাট বাহিনী লইয়া সম্রাট্ মুক্তাপীড় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। পিতামহের অনুকরণে জয়াপীড়ও দিগ্বিজয়ী রূপে খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সেনাদলে আশী হাজার রথ সংগৃহীত হইল।

দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের নানা দেশ জয় করিতে করিতে রাজা জয়াপীড় পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে দীর্ঘকাল বিদেশবাসের জন্য তাঁহার সৈন্যগণ স্বদেশে ফিরিতে উৎকণ্ঠিত

হইয়া উঠিল। সৈন্য ও সেনানায়কগণ অনেকে কাশ্মীরে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। জয়াপীড় ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, সামন্তরাজগণের মধ্যে যাহার ইচ্ছা সে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। অতঃপর অবশিষ্ট সেনা লইয়া কাশ্মীররাজ প্রয়াগ অর্থাৎ আধুনিক এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে, প্রয়াগতীর্থে মহারাজ জয়াপীড় ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণার সহিত একটি কম একলক্ষ অশ্ব দান করিয়াছিলেন। নানা দেশের তীর্থযাত্রীরা প্রয়াগ হইতে কলসীতে গঙ্গাজল বহিয়া লইয়া যাইত। জয়াপীড় এইরূপ অসংখ্য কলসীতে আপনার নাম উৎকীর্ণ করাইয়া বিতরণ করিলেন। ফলে কাশ্মীররাজের খ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়াপীড় খেয়ালী ছিলেন। এই সময়ে তিনি কিছুকাল ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে অভিলাষী হন। প্রয়াগে সৈন্যদল রাখিয়া তিনি 'রাজপুত্র কল্লট' এই ছদ্মনামে একাকী পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন। ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে জয়াপীড় একদিন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্দ্ধন (আধুনিক বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থল) নগরে উপস্থিত হন। সেই সময় জয়ন্ত নামক জনৈক সামন্ত নরপতি পুণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জয়াপীড় জয়ন্তের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া গোপনে ঐ নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়দেবের একটি বিশাল মন্দির ছিল। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন রাত্রিকালে ঐ মন্দিরে ভরতমুনির শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্যগীত হইত। একদিন সন্ধ্যাকালে মহারাজ জয়াপীড় দেবালয়ে উৎসব দেখিতে গেলেন। সেখানে বসিয়া নর্ত্তকীগণের নৃত্য দেখিতে দেখিতে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িলেন। দেবালয়ের প্রধানা নর্ত্তকী কমলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিল। সে দেখিল, এই অপরিচিত ব্যক্তিটি মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে দক্ষিণ হস্ত কাঁধের দিকে তুলিতেছেন। কমলা বুঝিল যে, ইনি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইবেন; কারণ পশ্চাতে অবস্থিতা পরিচারিকার হস্ত হইতে ইহার ক্রমাগত পানের খিলি লইবার অভ্যাস আছে। সে তাহার জনৈক সখীর হস্তে কয়েক খণ্ড গুবাকু দিয়া তাহাকে জয়াপীড়ের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইতে বলিল। ইহার পর যেমনই কাশ্মীররাজ অন্যমনস্কভাবে কাঁধের দিকে হাত তুলিলেন, অমনই কমলার সখী তাঁহার হস্তে একখণ্ড গুবাকু দিল। রাজা অভ্যাসবশে গুবাকুখণ্ড মুখে পূরিলেন। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া কমলার সখীকে দেখিতে পাইলেন। এই সূত্রে ধনবতী নর্ত্তকী কমলার সহিত জয়াপীড়ের পরিচয় হইল। ইহার পর কমলাকে বিবাহ করিয়া তিনি তাহার গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন সায়ংকালে জয়াপীড় সন্ধ্যাবন্দনার জন্য নদীতীরে গিয়া বাড়ী ফিরিতে কিছু বিলম্ব করিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, সকলে তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কমলাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা জানিতে পারিলেন যে, রাত্রিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চলে একটি সিংহ আসিয়া উপদ্রব করে। একটিমাত্র সিংহের ভয়ে নগরবাসীরা রাত্রিকালে গৃহের বাহির হইতে সাহস করে না, শুনিয়া মহাবীর জয়াপীড় অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে

তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং সিংহের আগমন-পথে তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিংহ আসিল এবং জয়াপীড়কে দেখিতে পাইয়া সগর্জ্জনে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। সিংহ লাফাইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাশ্মীররাজ নির্ভয়ে তাঁহার বামহস্ত উহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন এবং দক্ষিণ হস্তস্থিত ছুরিকা দ্বারা উহার উদর বিদীর্ণ করিয়া

কমলার সখী তাঁহার হস্তে একখণ্ড গুবাকু দিল

ফেলিলেন। এক আঘাতেই পশুরাজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আহত হস্তখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া জয়াপীড় কমলার গৃহে ফিরিলেন।

পরদিন প্রভাতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসনকর্ত্তা জয়ন্তের নিকট সিংহের নিধনবার্ত্তা পৌঁছিল। তিনি বিস্মিতচিত্তে নিহত সিংহটিকে দেখিতে গেলেন। মৃত সিংহের মুখমধ্যে একটি স্বর্ণবলয় পাওয়া গেল। উহা পরীক্ষা করিলে দেখা গেল, উহাতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। জয়ন্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কাশ্মীররাজ গোপনে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনিই সিংহটিকে নিহত করিয়াছেন। জয়ন্তের আদেশে তখনই দূতেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া জয়াপীড়ের সন্ধান করিতে লাগিল। শীঘ্রই নর্ত্তকী কমলার গৃহে তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল। তখন জয়ন্ত অমাত্য ও

পুরনারীগণের সহিত কমলার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কাশ্মীররাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে আনিলেন। শীঘ্রই জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত জয়াপীড়ের বিবাহ হইল। কথিত আছে যে, গৌড়রাষ্ট্রের পাঁচজন নরপতিকে পরাজিত করিয়া জয়াপীড় তাঁহাদের রাজ্য আপনার শ্বশুর জয়ন্তকে দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেনাপতি দেবশর্ম্মা কাশ্মীররাজের সেনাদলের সহিত পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার পরামর্শে জয়াপীড় অবিলম্বে নবপরিণীতা পত্নীদ্বয়ের সহিত স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

দিগ্বিজয় উপলক্ষে জয়াপীড়কে কয়েক বৎসর কাশ্মীরের বাহিরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্যরক্ষার কোন সুব্যবস্থা তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সুযোগে তাঁহার শ্যালক জজ্জ কাশ্মীররাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর জজ্জকে পরাজিত করিয়া জয়াপীড় সিংহাসন পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে শ্রীদেব নামক জয়াপীড়পক্ষীয় জনৈক চণ্ডাল ক্ষেপণীয় যন্ত্রের সাহায্যে অব্যর্থ সন্ধানে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িয়া জজ্জকে নিহত করিয়াছিল।
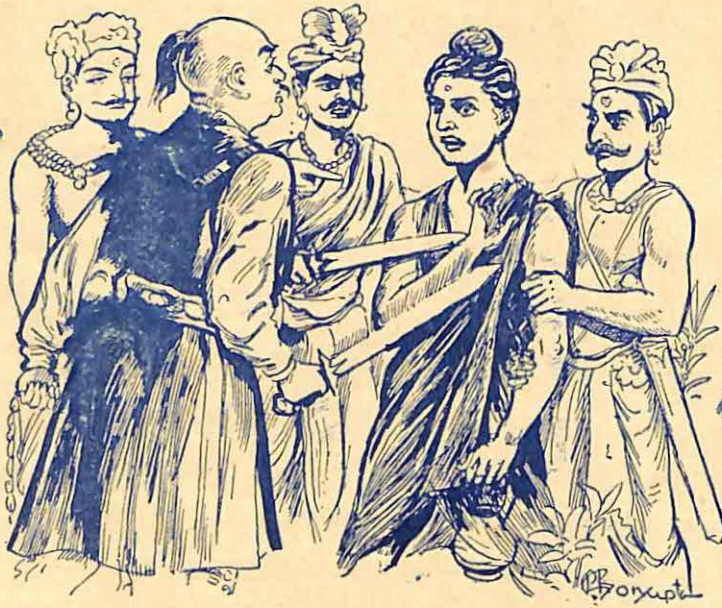
সিংহাসন পুনরধিকারের কিয়ৎকাল পরে জয়াপীড় আর একবার অবিমৃষ্য-কারিতার পরিচয় দিলেন। কাশ্মীরদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে এই সময়ে ভীমসেন নামক নরপতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জয়াপীড় ভীমসেনের রাজধানী অধিকার করিতে অভিলাষী হন। একদিন তিনি ছিদ্রান্বেষণের জন্য ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে কয়েকজন সাধুর সহিত ভীমসেনের দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ঐ দুর্গে জয়াপীড়ের পূর্ব্ববৈরী জজ্জের ভ্রাতা সিদ্ধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে রাজাকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ ভীমসেনকে সংবাদ পাঠাইল। অবিলম্বে জয়াপীড় ধৃত হইলেন। তাঁহাকে এক সুদৃঢ় গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইল।

বন্দী হইয়া জয়াপীড় নিজের অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বুদ্ধিহারা

হইলেন না। কিরূপে বন্দীদশা হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ভীমসেনের রাজ্যে লূতা নামক একপ্রকার সংক্রামক বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইল। অনেক লোক মরিতে লাগিল। যে কেহ উক্ত রোগে আক্রান্ত হইত, লোকে সর্ব্বপ্রকারে তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিত। এই ব্যাপার জানিয়া বুদ্ধিমান্ জয়াপীড় মুক্তির উপায় স্থির করিলেন। তিনি জনৈক ভৃত্যের সাহায্যে কয়েকটি গাছগাছড়া সংগ্রহ করিলেন। পিত্তবর্দ্ধক ঔষধ সেবনের ফলে পিত্ত কুপিত হওয়ায় তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। পরে মনসাসিজের আটা গায়ে মাখিয়া তিনি অঙ্গে দূষিত ব্রণ বাহির করিলেন। রক্ষকদিগের মুখে জয়াপীড়ের রোগের বিবরণ শুনিয়া ভীমসেন তাঁহাকে লূতাগ্রস্ত বলিয়া বুঝিলেন। জয়াপীড়ের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ; অথচ তাঁহাকে দুর্গমধ্যে রাখিলে দুর্গবাসিগণের সমূহ বিপদ্। ভাবিয়া চিন্তিয়া ভীমসেন তাঁহাকে দুর্গের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে বুদ্ধিকৌশলে কাশ্মীররাজ বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে উপস্থিত হন। এই কাহিনীটি পরবর্ত্তী কালে ঔরংজীবের কবল হইতে মারাঠাবীর শিবাজীর পলায়নের বিবরণ স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইহার কয়েক বৎসর পরে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় বৃহৎ একদল সেনা সংগ্রহ করিয়া নেপাল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অরমুড়ি নামক একজন সুকৌশলী মহাবীর নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পরাজয়ের সম্ভাবনায় কাশ্মীররাজের সেনাদলের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না ; পর্ব্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ দেশে কাশ্মীরসৈন্যকে মাঝে মাঝে গুপ্ত আক্রমণে বিব্রত করিয়া পলাইয়া যাইতে লাগিলেন। জয়াপীড় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া নেপালের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কিন্তু শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিবার কোনই সুযোগ পাইলেন না। এই যুদ্ধে নেপালরাজ অরমুড়ি যে সেনাপতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাসে উহার অনুরূপ আরও দুই-চারিটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিন জয়াপীড় গভীর ভেরীধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কিছু দূরে নেপালরাজ স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন। অবিলম্বে কাশ্মীরসেনা সেইদিকে ধাবিত হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তাহারা একটি নদীর পরপারে নেপালরাজের সেনাদল দেখিতে পাইল। নদীটিতে মাত্র জানু পরিমাণ জল রহিয়াছে এবং পার হইতে বিশেষ কোন বাধা নাই দেখিয়া জয়াপীড় সেনাগণকে পদব্রজেই অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু কাশ্মীরসেনার অগ্রভাগ যখন নদীর পরপারের কাছাকাছি পৌছিয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ প্রবল জলস্রোত আসিয়া নদীর বেলাভূমি পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কাশ্মীরসেনার বিপদের সীমা রহিল না। অগণিত সৈন্য জলে ডুবিয়া মরিল, কিংবা খরস্রোতে ভাসিয়া গেল। কাশ্মীরসেনার হাহাকার এবং নেপালসৈন্যের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। স্রোতে রাজা জয়াপীড়ের বসন-ভূষণ ভাসিয়া গেল ; তিনি সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। নেপালরাজের সৈন্যগণ বায়ুপূর্ণ চর্ম্মভেলার সাহায্যে

কাশ্মীরপতিকে নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া আনিয়া বন্দী করিল। এই যুদ্ধে অরমুড়ির রণকৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। নেপালরাজ বাঁধ দ্বারা নদীর জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া কাশ্মীরসেনাকে পদব্রজে নদী পার হইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া উহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। কালগণ্ডিকা নদীর তীরবর্ত্তী একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদে রাজা জয়াপীড়কে আবদ্ধ রাখা হইল। অরমুড়ির বিশ্বস্ত অনুচরগণ উহার পাহারায় নিযুক্ত রহিল।

জয়াপীড় বন্দী হইবার পর তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতি দেবশর্ম্মা হতাবশিষ্ট কাশ্মীরসেনার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দূতমুখে অরমুড়িকে জানাইলেন যে, তিনি জয়াপীড়ের সঞ্চিত ধনরত্নের সহিত কাশ্মীরের সিংহাসন নেপালরাজকে সমর্পণ করিতে রাজী আছেন। এই প্রস্তাবে খুশী হইয়া অরমুড়িও দেবশর্ম্মার নিকট দূত পাঠাইলেন। কথাবার্ত্তা কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেবশর্ম্মা আসিয়া কালগণ্ডিকা নদীর পারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং অল্পসংখ্যক অনুচর সঙ্গে লইয়া নদীর পরপারে রাজা অরমুড়ির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অরমুড়ি তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কোশপান (অর্থাৎ একপাত্র হইতে জলপান অথবা শালগ্রাম শিলা ধৌত জলপান) করিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিত্রতা দৃঢ় করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে দেবশর্ম্মা নেপালরাজকে জানাইলেন যে, কাশ্মীররাজের অধিকাংশ ধনরত্নই গুপ্ত আছে এবং উহা কোথায় কি অবস্থায় আছে কৌশলে তাহা জয়াপীড়ের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে জোর করিলে জয়াপীড় গুপ্তধনের কথা প্রকাশ করিবেন না; আবার সন্ধান না পাইলেও ঐ ধন উদ্ধার করা যাইবে না। সুতরাং স্থির হইল যে, দেবশর্ম্মা জয়াপীড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কথায় ভুলাইয়া গুপ্তধনের সন্ধান জানিবেন।

নিরস্ত্র অবস্থায় দেবশর্ম্মা জয়াপীড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বন্দী রাজার দুরবস্থা দেখিয়া প্রভুভক্ত মন্ত্রীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। গৃহের পশ্চাৎদিকে একটি গবাক্ষ ছিল; উহার ঠিক

নীচেই কালগণ্ডিকা নদী এবং পরপারে কাশ্মীরসেনার শিবির। দেবশর্ম্মা পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, ঐ গবাক্ষের ছিদ্রপথে নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়ুন। তারপর সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া আপনার সৈন্যদলের সহিত মিলিত হউন।"

রাজা জয়াপীড় বিষণ্ণহাস্যে বলিলেন, "মন্ত্রী, এত উঁচু হইতে জলে পড়িয়া খরস্রোতে সন্তরণ সম্ভব নহে। চর্ম্মনির্ম্মিত ভেলার সাহায্য পাইলে হয়ত উহা সম্ভব হইত। কিন্তু এতদূর হইতে খরস্রোতে পড়িলে চর্ম্মেরও বিদীর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তোমার পরামর্শে আমার মুক্তি সম্ভব নহে।"

দেবশর্ম্মা কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি দুই দণ্ডকাল পায়ুক্ষালন গৃহে (পায়খানাতে) কাটাইয়া আসুন। আমি ইত্যবসরে আপনার মুক্তির উপায় স্থির করিব।"

জয়াপীড় ঘরের বাহিরে আসিলেন। দণ্ড দুই পরে পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। একখণ্ড বস্ত্র দৃঢ়রূপে গলায় বাঁধিয়া মন্ত্রী দেবশর্ম্মা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! ঐ বস্ত্রখণ্ডের একপ্রান্তে বিশ্বস্ত মন্ত্রী লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রভু, আমি এইমাত্র মরিলাম। আমার দেহ এখনও বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে। আমার মৃতদেহ আপনার চর্ম্মভেলার কাজ করিবে। এই শবের সাহায্যে জলে পড়িয়া নদী পার হউন।" মন্ত্রীর প্রভুভক্তির এই আশ্চর্য্য পরিচয় পাইয়া রাজা জয়াপীড়ের চক্ষে জল আসিল। কিন্তু আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি দেবশর্ম্মার শবের সহিত নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অতি কষ্টে নদী পার হইয়া কাশ্মীরসেনার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য দেবশর্ম্মা যেভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

বৃদ্ধবয়সে রাজা জয়াপীড় অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কায়স্থগণ (অর্থাৎ দলিল-পত্রাদির লেখক, হিসাব-রক্ষক ও রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্ম্মচারীরা) পরামর্শ দিল, "মহারাজ, অর্থের জন্যে দিগ্বিজয়াদির প্রয়োজন কি? আপনার রাজ্যেই ত অজস্র ধন রহিয়াছে!"

তাহাদের পরামর্শে রাজা নানা ভাবে প্রজার অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর কাল তিনি কৃষকদিগের প্রাপ্য শস্য ভাগ না দিয়া সমস্ত শস্য নিজে আত্মসাৎ করিলেন। এমন কি, দেবতা-ব্রাহ্মণের ভূমিও তিনি কাড়িয়া নিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা দলে দলে দেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। অনেকে সম্পত্তিচ্যুত ও অপমানিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে দিতে আত্মহত্যা করিলেন।

একদিন রাজা জয়াপীড় তুল্যমূল্য নামক ব্রাহ্মণভোগ্য গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ গ্রামের নিরানব্বই জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ভূমিহারা হইয়া চন্দ্রভাগার জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতেও রাজার মনে অনুশোচনা জাগিল না। কয়েক জন ব্রাহ্মণ রাজার কাছে তাঁহাদের অভিযোগ জানাইতে আসিয়াছিলেন। দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিতে গেল। ব্রাহ্মণেরা বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, প্রাচীন

কালে মনু, মান্ধাতা, রামচন্দ্র প্রভৃতি কত বড় বড় রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ত কখনও ব্রাহ্মণদিগকে অপমানিত করেন নাই!"

জয়াপীড় ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "কি স্পর্দ্ধা! যাহারা ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া বেড়ায়, তাহারা আবার প্রাচীন ঋষিদের অনুকরণে লম্বা লম্বা কথা বলিতেছে!"

ইহা শুনিয়া ইট্টিল নামক ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, যুগানুসারে রাজা যেমন গুণসম্পন্ন হন, প্রজারাও তাঁহার অনুরূপ হয়। আপনার ন্যায় রাজার পক্ষে আমরাও ঋষিতুল্য জানিবেন।"

রাজা উপহাস করিয়া বলিলেন, "ওঃ! এই যে তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র, তপোনিধি বশিষ্ঠ কিংবা মহামুনি অগস্ত্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ!"

ইট্টিল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি যদি হরিশ্চন্দ্র, ত্রিশঙ্কু কিংবা নহুষ হন, তবে আমাকেও বিশ্বামিত্রের ন্যায় তাপস বলিয়া মনে করিতে পারেন।"

জয়াপীড় অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্রের ক্রোধে হরিশ্চন্দ্র নষ্ট হইয়াছিলেন। তুমি রাগ করিয়া আমার কি করিতে পার?"

ব্রাহ্মণ সক্রোধে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া উত্তর দিলেন, "আমি কুপিত হইলেও এই মুহূর্ত্তে আপনার মস্তকে ব্রহ্মদণ্ড পড়িতে পারে।"

রাজা উপহাস করিয়া বলিলেন, "ওহে তপোধন, তবে এখনই আমার মাথায় ব্রহ্মদণ্ড পড়ুক না!"

"ওরে মূর্খ, এই যে পড়িল"—ইট্টিল যেমনই এই কথা বলিলেন, অমনই চন্দ্রাতপের অবলম্বনভূত প্রকাণ্ড স্বর্ণদণ্ড রাজার অঙ্গে খসিয়া পড়িল। কথিত আছে যে, দণ্ডাঘাতে জয়াপীড়ের অঙ্গে যে ক্ষত হইয়াছিল, ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া উহাই তাঁহার প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিল।

শারদ গীতি

—শ্রীসন্ধ্যা গঙ্গোপাধ্যায়

এলো কি শরৎ সন্ধ্যা
গন্ধ-উদাস বনে বনে!
কাঁপিছে কনকচাঁপা
বাতাসের শিহরণে।
আজি কার চরণধ্বনি
এ পথে উঠল রণি—
বাজিল কোন্ সে গীতি
বনের বীণায় আপন মনে?

আজি এই রৌদ্র-ছায়া
দুলছে মৃদু ডালে ডালে,
আজি ঐ আকাশ পারে
রূপের শিখা আগুন জ্বালে।
দূরের ঐ মধুর বাঁশী
কে বাজায় হেথায় আসি?
পথহারা পথিক বুঝি
ফিরে এলো সঙ্গোপনে!

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

হাওড়ার জলধর সরকার মশায় খুবই ধনী লোক। আশে-পাশে নগদ টাকায় তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। লোকে বলে, তাঁর দোতলার লোহার সিন্দুকটা সোনার গয়নায় বোঝাই।

নাদুস-নুদুস্ চেহারার একটু বেঁটে মানুষ তিনি। রংটা ফর্সাই বলা চলে। দাড়ি-গোঁফ কামানো ; চক্‌চকে তেলা টাকটির ওপর রোদ্দুর প'ড়ে ঠিকরে যায় যেন।

সপ্তাহের সাতটি দিনই তিনি খুব ব্যস্ত থাকেন, শুধু দুপুরবেলা আহারের পর খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করেন মাত্র।

সে দিনটি রবিবার। দুপুরবেলা আহারের পর জলধরবাবু যেমনি ওপরে যাওয়ার উপক্রম করেছেন, অমনি ডাকঘরের পিওন হাঁকলে, "চিঠি আছে বাবু!"

এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানি নিয়েই তিনি একদম পাথর হয়ে গেলেন।

পোস্টকার্ডের চিঠি। লেখকের নাম নেই, কোথা থেকে এসেছে তারও উল্লেখ নেই। খুব স্পষ্ট অক্ষরে এইটুকু লেখা আছে—"বুধবার রাত্রি ৮টায় ডাকাতি হবে আপনার বাড়ীতে।"

খানিকক্ষণ পরে জলধরবাবুর সম্বিত ফিরে এল যেন। মনে যেন একটু জোর পেলেন। ভাবলেন, "আচ্ছা, এখুনি খবর দিচ্ছি পুলিসে। করাচ্ছি ডাকাতিটা! টাকা আয় করছি ডাকাতকে দেওয়ার জন্যে! একি মগের মুলুক নাকি!"

চিঠি নিয়ে তিনি যান থানায়। ইন্‌স্‌পেক্‌টর, দারোগা প্রভৃতি সকলেই জলধরবাবুকে ভরসা দিয়ে বলেন, "এটা একদম ধাপ্পা, বুঝেছেন জলধরবাবু, একদম ধাপ্পাবাজি! এ যুগে আগে থেকে খবর দিয়ে এসে ডাকাতি করা চলে না। ওরা কি বোঝেনি যে, আপনি চিঠি পেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকবেন না, পুলিসে খবর দেবেনই? তবে হাঁ, হ'ত বটে সে যুগে ডাকাতি আগে খবর দিয়ে, তখন তো আর এরকম শহর ছিল না, থানা আর পুলিসও ছিল খুবই কম। যাই হোক্, এ রকম শহরে ভয় কিসের? বুধবার সন্ধ্যার আগেই আমরা সদলবলে হাজির থাকব আপনার বাড়ীতে। আপনি বাড়ী গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে পারেন।"

নিশ্চিন্তমনে জলধরবাবু ফিরে আসেন বাড়ীতে।

বুধবার জনকয়েক পুলিসের লোক ও ছ'জন দারোগা নিয়ে স্বয়ং ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেব যান জলধর-বাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যার একটু আগেই।

সুদীর্ঘ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ী। রাস্তার ওপরেই ফটক। ফটক থেকে লাল রাস্তা প্রায় পঞ্চাশ গজ গিয়ে মিশেছে সাজানো-গুছানো বারান্দায়। বিস্তীর্ণ প্রাংগণের সবুজের গালচের মাঝখানে রাস্তাটাকে একটা লাল পাড় ব'লে মনে হয়।

জলধরবাবু খুব সমাদর ক'রে তাঁদের বসালেন। কন্‌স্টেবল ছাড়া সবাই এসেছেন সাদা পোষাকে। জলখাবার ও চা খেয়ে সকলেই বারান্দায় ব'সে গল্প-গুজব করছেন। বারান্দার উত্তর প্রান্ত থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির মুখের কাছের ঘরটিতে রয়েছে লোহার সিন্দুকটি। সামনের দরজা খোলা রেখে ভেতরের দরজা ও জানলাগুলো বন্ধ ক'রে জলধরবাবু সিন্দুকের সামনে ব'সে আছেন। নীচে তো সবই পুলিসের লোক, আর ভয় কি?

একটি মোটর গাড়ী এসে থামে ফটকে। চক্‌চকে কালো রঙের গাড়ীটি মাঝারি রকমের। গাড়ীতে মাত্র একটি লোক। লোকটি নেমে আসে গাড়ী থেকে। বেশ ফর্‌সা, ছিপ্‌ছিপে চেহারা। কালো চুলে চক্‌চকে টেড়ি, ছোট্ট গোঁফ, চোখে বাহারি চশমা, গায়ে ইস্তিরি করা শার্ট, দিশি ধুতির কোচাটা লুটিয়ে পড়েছে তার ঝক্‌ঝকে কালো পাম্পসু অবধি, জামার ওপর গিলে করা একখানি দিশি উড়ুনি জড়ানো। বাঁ হাতে রিস্ট ওয়াচটি চক্‌চক্ করছে, আর ঝুলছে খুব সুন্দর একটি চামড়ার ব্যাগ্। সত্যিই একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ফটক থেকে ভদ্দর লোকটি বেশ হাসি-হাসি মুখে চ'লে আসছে বারান্দার দিকে।

পুলিসের লোকেরা ভাবে—এ লোকটি নিশ্চয়ই জলধরবাবুর আপনার লোক। মাত্র একটি লোক তো। এতে আর সন্দেহের কী আছে?

ভদ্দর লোকটি বারান্দায় এসেই মৃদু হেসে নমস্কার জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেল ওপরে।

নীচের বারান্দায় দেওয়াল-ঘড়ীতে তখনই টং টং ক'রে আটটা বাজল। ডাকাতির খবরটা স্রেফ ধাপ্পা, এই নিয়েই তখন পুলিসের লোকেরা হাসি-ঠাট্টা আর গল্প-গুজব করছেন।

ভদ্দর লোকটি সোজা গিয়ে দাঁড়াল জলধরবাবুর সামনে, বাঁ হাতটি বাড়িয়ে রিস্ট ওয়াচটি দেখিয়ে বললে, "এই দেখুন আটটা ; চু—প !" ব'লেই পিস্তলটি ধরল জলধরবাবুর বুকের ওপর।

জলধরবাবুর বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল এক মুহূর্তেই।

সুদর্শন এই যুবকটি চাপা গলায় বললে, "জল্‌দি চাবি বার করুন, আর সিন্দুকে যা আছে আমার ব্যাগে ভরতি ক'রে দিন্। হা ক'রে দেখছেন কি ? দেরি করবেন না একটুও ! কোন রকমের শব্দ যেন না হয়। শব্দ হলে শুধু আপনিই মরবেন না, আরো অনেকেই মরবে। ভরতি করুন জল্‌দি !"

কম্পিত হস্তে জলধরবাবু টাকা ও সোনায় ব্যাগটি ভরতি করেন।

যুবক ভদ্দর লোকটি বলে, "ধন্যবাদ ! এবার আসুন আমার সঙ্গে, আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবেন। আপনার গায়ে গা দিয়েই আমি যাব কথা কইতে কইতে। জানবেন আমার পিস্তলের মুখ লাগানো থাকবে আপনার পাঁজরার সংগে। খুব কড়া নজর রাখব আপনার চোখের ওপর। আমার কোন রকমের সন্দেহ হলেই আপনার বুকটা হয়ে যাবে এফোঁড়-ওফোঁড়।"

হাসতে হাসতে ভদ্রলোকটি নেমে এসে বারান্দা পার হয়ে যায়। জলধরবাবু চলেছেন তার গায়ের সংগে লেগে। ফটকে গিয়ে গাড়ীতে উঠেই ভদ্দর লোক হেসে বলে, "নমস্কার জলধরবাবু !"

গাড়ী অদৃশ্য হয়ে যায় তীরের বেগে।

জলধরবাবু চীৎকার করে ওঠেন—"আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল !"

চীৎকার শুনে ছুটে যায় পুলিস। ডাকাতি হয়ে গেছে শুনে পুলিসও হতভম্ব। এ যে রূপকথার মতো। এও কি বিশ্বাস করা যায় ?

সব শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পুলিসের যতটা সময় লাগল, তার মধ্যে গাড়ীখানা যে কোন্ পথে কত মাইল চলে গেছে তার সন্ধান রাখে কে ?

তখনই খবর ছুটে যায় চারদিকে। পুলিসও অনেক গাড়ী নিয়ে নানা দিকে দৌড়াদৌড়ি করে সমস্ত রাত ধ'রে। মোট কথা পুলিস আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও কোন হদিস্ পেলে না কোন দিনই।

তারা এইটুকু ধ'রে নিলে যে, এটা সাধারণ ডাকাতি নয়, এ কাজ বাংলার বিপ্লবী দলের। অতএব যাদের ওপর সন্দেহ আছে তাদের বাড়ী খোঁজ করা এবং গ্রেপ্তার করা দরকার, বিশেষ ক'রে যারা ফেরারী হয়ে আছে। পুলিসের খাতায় নাম আছে, দু'একবার ধরাও পড়েছে, এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এ কাজ তাদেরই নিশ্চয়।

বহু জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে, নানা কৌশল ক'রে অনেক বাড়ীতে ঢুকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও কোন সন্ধান পায় না পুলিস। গোয়েন্দা পুলিসের চেষ্টার বিরাম নেই।

সন্ধান নিতে নিতে হুগলী শহরের একটি বাড়ীর ওপর খুব গভীর সন্দেহ হয় পুলিসের। এই বাড়ীতে তখন থাকেন এক ব্রাহ্মণ বিধবা এবং তাঁর দুটি ছেলে। বড় ছেলেটির সংগে যুগান্তর দলের বিশেষ সংযোগ ছিল ব'লে তার জেলও হয়েছিল, অন্তরীনেও তাকে থাকতে হয়েছিল কয়েক বছর।

নানা রকমে কিছু কিছু প্রমাণ পেয়ে গোয়েন্দা পুলিসের এই বিশ্বাস হয়েছে যে, এই বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়ে আছে দু'জন বিশিষ্ট বিপ্লবী।

ছোট্ট বাড়ী। নীচে তিনখানি ও ওপরে মাত্র দুইখানি ছোট ঘর। চারদিক ফাঁকা। উঠোনের মাঝখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। ঘর দু'খানি নীচে থেকেই বেশ ভাল ক'রে দেখা যায়।

ভোরবেলা বিধবা মা উঠে দেখেন, বাড়ীর চারদিকে লালপাগড়ী মোতায়েন। পুলিসের কর্তারা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

মা গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলেন—"আসুন।"

পুলিসের কর্তারা জানান তাঁদের অভিপ্রায়।

মা বলেন—"বেশ তো, আসুন ভেতরে।"

পুলিসের বিশেষ বিশেষ লোক সকলেই এসে একে একে তিনখানি ঘরেই ঢুকে দেখেন কেউ নেই। রান্নাঘরটি খুঁজে দেখতেও তাঁরা ভোলেন না।

এবার মা তাঁদের নিয়ে আসেন উঠোনে সিঁড়ির গোড়ায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বলেন—"আসুন, ওপরের ঘর দেখে যান।"

ওপরের ঘরের দরজা খোলা। তা ছাড়া, যাদের ধরবার জন্যে কর্তারা এসেছেন, তারা সে ঘরে থাকলে কি মা এমনি সমাদর ক'রে হাসিমুখে নিয়ে গিয়ে তাদের ধরিয়ে দিতে পারেন? এ অসম্ভব।

এই ভেবেই পুলিসের বড়কর্তা বলেন, "থাক্ মা, আর দেখবার দরকার নেই। আচ্ছা আমরা আসি।"

পুলিস বাড়ী থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মা ওপরে উঠে ঘরে গিয়ে ঢোকেন।

দুটি যুবক মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, "পুলিসকে তো আচ্ছা বোকা বানিয়ে দিলেন মা, আমরা তো গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম।"

—"ভগবানের কৃপায়ই এ যাত্রা বেঁচে গেলে বাবা, তাঁরই ইচ্ছায় এই বুদ্ধিটা চট্ ক'রে মাথায় এলো।"

এই মা—রাজেশ্বরী দেবী—মাত্র এক বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন হুগলী শহরের প্রতাপপুরের সেই বাড়ীতেই।

হাওড়ার ডাকাতি আর হুগলীর এই ঘটনাটি গল্পের চেয়েও অদ্ভুত নয় কি?

পূজা

শ্রীকালিদাস রায়

আবার ফিরিয়া এলো পূজা ;
রুদ্ধ আজি নদীপথ, পাননি ইন্দ্রের রথ,
ঘোটকে আসেন দশভুজা।
চারিদিকে তারি ফল, কাঁদে বাস্তহারা দল,
অন্নাভাবে দেশে হাহাকার,
দুর্লভ বসন আজ, পূজায় কি দিবে সাজ
পিতা শিশুসন্তানে তাহার ?
ধনধান্য নাই ঘরে, মা আসিল রিক্ত করে,
মিটিল না বৎসরের সাধ ;
সময়ে হয়নি বৃষ্টি, পড়েছে শনির দৃষ্টি,
জলাভাবে হয়নি আবাদ।

যত দাবি পূজার সময় ;
চারিদিকে দেনাদায়, সবাই পাওনা চায়,
তবু পূজা করিতেই হয়।
আনন্দময়ীর পূজা বলিয়া যায় না বুঝা,
বড় কষ্টে দীন আয়োজন,
দুঃখিনী সংবরি শোক, একহাতে মুছি চোখ,
অন্য হাতে ঘষিছে চন্দন !
আলিপনা দিতে তার হাত কাঁপে বার বার,
দীর্ঘশ্বাস নৈবেদ্যের ’পরে,
চাহিতে প্রতিমা পানে কাঁপে বুক অভিমানে,
রুদ্ধ ক্ষোভে আঁখি জলে ভরে।

জিজ্ঞাসি মা তোরে দশভুজা,
কত কাল এইরূপে দুর্দ্দশার দীপে ধূপে
নিবি দুর্গা দুর্গতের পূজা ?
মহোৎসবে মাতোয়ারা সুখী যারা পূজে তারা
অসুরেরে ষোড়শোপচারে ;
তারা ত পূজে না তোরে, পূজা নিস্ জোর করে,
তুই শুধু কাঙালেরি দ্বারে।
যারে তুই দুঃখ দিস্, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিস্,
তারি পূজা পাস্ তুই এসে।
হয় দুঃখ দূর কর, নয় তুই এর পর
আসিস্ না এ অভাগ্য দেশে !

নয় তুই বল সোজা কথা—
আছে শুধু মমতাই, নাই কোন ক্ষমতাই
ঘুচাইতে দুঃখ দৈন্য ব্যথা।
তোরে মা যে জন পূজে পরাগতি সে না খুঁজে
স্বর্গ মোক্ষ তার লক্ষ্য নয় ;
এই শুধু আশা রাখে, যে ক’দিন মর্ত্ত্যে থাকে,
দুধে ভাতে যেন সুখে রয়।
তাই যদি না-ই দিবি, তবে পূজা কেন নিবি ?
দে’ মা এই জ্ঞানটুকু তায় ;
ডেকে বল, “ওরে মূর্খ, পূজায় ঘোচে না দুঃখ,
ঘুচে আত্মশক্তি-সাধনায়।”

শ্রীসুনির্মল বসু

কেবলরাম ওরফে ক্যাবলা সব বিষয়েই ওস্তাদ। মজার মজার ফন্দিতে তার মগজখানা ঠাসা। আমাদের পাড়ার কোনো কাজে ক্যাবলা না থাকলে সব মাটি। সে একাই একশো। সে পড়াশোনাতেও ভালো, আর খেলাধূলাতেও তার জুড়ি নেই।

ক্যাবলা বয়সে আমার থেকে কিছু ছোট, কিন্তু তাকে না হলে আমার যেন সময়ই কাটতে চায় না। এমন একটা গুণী ছেলের সঙ্গ কে আর না চায় বলো!

একবার ঠিক হোলো আমাদের পাড়ায় একটা আনন্দ-সম্মেলন হবে। আমি একটা মজার প্রস্তাব করলাম। পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু নতুন ধরনের কিছু আনন্দ পরিবেশন করতে হবে। সবাই অদ্ভুত সাজপোষাক করে, বহুরূপীর সাজে এসে আত্মপ্রকাশ করবে। কে কোন্ ছদ্মবেশ ধারণ করবে, আগে থেকে কেউ তা জানবে না।

পাড়ার লাইব্রেরী হলে ছোট্ট একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি হোলো। সন্ধ্যার সময় হাজির হোলো সব দর্শকের দল।

রঙ্গমঞ্চে প্রথম দেখা গেল একটি কাবুলীকে। সাজপোষাক হয়েছে নিখুঁত। আমাদের এক বন্ধু শাটুল যে এই কাবুলীর বেশে অভিনয় করছে, আমিও প্রথমে তা ধরতে পারি নি। তারপর ছেলেমেয়েরা নানান্ সাজে ষ্টেজে এসে দেখা দিতে লাগল। কেউ ধোপা-ধোপানী, কেউ মাদ্রাজী পণ্ডিত, কেউ সাঁওতালী মেয়ে ইত্যাদি। সকলের সাজপোষাকই নিখুঁত হয়েছিল।

তারপর এলো শেষ দৃশ্য। হঠাৎ রঙ্গমঞ্চটা অন্ধকার হয়ে গেল, তারপর যে দৃশ্য দেখা গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে, তা ভাবলে এখনো বুক কেঁপে ওঠে। একটা জীবন্ত কঙ্কাল নাচতে নাচতে ষ্টেজে এসে হাজির হোলো। বাস্‌রে বাস্‌! সেই ভূতুড়ে মূর্ত্তি অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করল, আর নাকি সুরে গান ধরলো—

"আমি শ্যাঁওড়া গাঁছের ভূঁত,—
শাঁকচুন্নি আঁমার মাঁসী, পেত্নীগুঁলি আঁমার দাঁসী,
আঁত্মীয় আঁর জ্ঞাঁতি-কুঁটুম—যঁত যঁমের দুত,—
অঁদ্ভুত মোঁর চেঁহারাটা নাঁইকো কোঁনো খুঁত।"

তার বিকট চেহারা আর অদ্ভুত ভঙ্গি দেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। পরে সকলে জানলো এটা কেবলরামের কীর্ত্তি। কালো কাপড়ের উপর টুকুরো টুকুরো সাদা নেকড়া সেলাই করে সে এই ভয়ঙ্কর ভূতের পোষাক তৈরি করেছিল। অন্ধকারে দেখলে অতি বড় সাহসীরও অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

কিছুদিন হোলো আমরা গ্রামের বাড়ীতে এসেছি। হঠাৎ একদিন কেবলরাম এসে হাজির। ক্যাবলাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমাদের আর আমোদের শেষ নেই। সব থেকে মজার কথা— ক্যাবলা সঙ্গে তার সেই ভূতুড়ে পোষাকটা এনেছে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর একদিন বহুরূপী সাজের আয়োজন করবো, মতলব করে বসেছি।

দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল,—এর মধ্যে হোলো এক ভীষণ কাণ্ড।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বেশ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাতটাও বোধ হয় অমাবস্যার কাছাকাছি। চারধারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক হাত দূরের জিনিসও চেনা ভার।

অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করে সবেমাত্র তন্দ্রামত এসেছে, হঠাৎ বাড়ীতে ডাকাত পড়লো। গ্রামের বাইরে মাঠের প্রান্তে আমাদের বাড়ী। কেউ যে এসে সাহায্য করবে তারও উপায় নেই, চিৎকার করেও কোন ফল নেই।

ডাকাতের দল সংখ্যায় বেশ পুরু। লাঠি, সড়কী, বল্লম নিয়ে এসেছে। প্রায় সকলের হাতেই মশাল। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, বাস্‌ রে! কী দানবের মত জাঁদরেল চেহারা তাদের! মুখে সব মুখোস আঁটা! তারা হৈ হৈ করছে, দরজা ভাঙবার জন্যে লাঠি-সড়কী চালাচ্ছে!

বাড়ীর মেয়েরা তো ভয়ে কান্নাই শুরু করে দিল। পুরুষদের মধ্যে আমি, আমার ছোট ভাই আর ক্যাবলা। ক্যাবলা বাইরের ঘরে একা আছে। আমরা দুটি পুরুষ অন্দর-মহলে। বন্দুক-টন্দুক কিছু নেই আমাদের সঙ্গে—সম্পূর্ণ নিরুপায়, অসহায়!—

এদিকে ডাকাতের দল প্রায় দরজা ভেঙে ফেলেছে, আমরাও চরম বিপদের জন্যে প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ এ কী কাণ্ড! এ-যে অদ্ভুত ব্যাপার! ডাকাতের দল হঠাৎ মশাল টশাল ফেলে আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে ছুট লাগালো মাঠের মধ্য দিয়ে।

এ কী ব্যাপার! কিছুক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে কেবলরাম এসে হাজির। বললে—"ব্যাটাদের সব তাড়িয়ে দিয়েছি।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—"তুমি ডাকাতদের তাড়ালে! সে কী হে কেবলরাম?"

ক্যাবলা হাসতে হাসতে বললে—"ঠিক আমি নই, আমার সেই ভূতুড়ে পোষাক। ডাকাতদের সাড়া পেয়েই আমি চটপট ভূতুড়ে পোষাকটা পরে হাত দুটি উঁচুতে তুলে গুটিগুটি তাদের দিকে এগিয়ে চললাম। এই দৃশ্য দেখে, ডাকাতের দল কি আর দাঁড়ায়? একেবারে টেনে লম্বা সেই রাণীডাঙার মাঠ পেরিয়ে!"

কেবলরামের উপস্থিত-বুদ্ধির জন্যে আমরা সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। অদ্ভুত আমাদের ক্যাবলা বা কেবলরামের কীর্ত্তি!

কলা-বৌ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

মা শত্রুদলনী অসুরমর্দ্দিনী দশভুজার সম্মুখে দক্ষিণ পার্শ্বে অবগুণ্ঠনে আবৃতা লজ্জাবনতা ঐ যে কলা-বৌ, উনি কে? শিশুমনের এই যে প্রশ্ন, তাহা চিরন্তন। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহারা বুঝিতে পারে যে, উনি অন্য কেহ নহেন, মা জগজ্জননীরই রূপান্তর। একই স্থানে দুই ভাবের দুইটি মাতৃমূর্ত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য কি, তাহা অবশ্য ভাবিয়া দেখিবার মত বিষয় বটে। আর্য্য-ঋষির কল্পনাতে অনাবশ্যক কিংবা অবান্তরের কোন স্থান নাই, সুতরাং উহার নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। উহার বিষয় একটু চিন্তা করিলে তাহা যে কি, আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। উনি আর কেহই নহেন, উনি আমাদের অন্নবস্ত্রদাত্রী চিরকল্যাণময়ী পল্লী-জননীর প্রতীক। আর্য্য-ঋষির ভাবমাধুর্য্য-কল্পিত এই নারী মূর্ত্তির আলোচনার আজ নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

দুর্গোৎসব বাঙ্গালার বিশ্ববিদিত নিজস্ব সর্ব্বপ্রধান উৎসব। বঙ্গপল্লীর সকল স্তরের সকল শ্রেণীর নরনারী সানন্দে সাগ্রহে সর্ব্বতোভাবে স্মরণাতীত কাল হইতে উহাতে যোগদান করিয়া আসিতেছিল। যুগ-পরিবর্ত্তনে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আজ তাহা স্থানবিশেষে, নগরের কৃত্রিম আবহাওয়ার ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কলা-বৌ আজও সেই পল্লীস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। হৃতগৌরব পল্লী-জননীর এই নীরবতার মধ্যেও তাঁহার মাতৃস্নেহের উৎস-ধারা আজও প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ইঙ্গিতে এ কথাই যেন বলিতেছেন—দুর্ভাগা বাঙ্গালী, হে মোর সন্তানগণ! ভুলিও না তোমাদের কৃষ্টি, ভুলিও না তোমাদের বৈশিষ্ট্য। শান্তির তরে আজ যে ছুটিয়াছ নগরে নগরে, সে কি দিতে পারে কৃত্রিমতা যাহার সব অন্তরে বাহিরে? নগর-চাঞ্চল্য

মাঝে শান্তি কোথায়? তাই বলি বক্ষে মোর, আয় ফিরে আয়! শান্তি-পিপাসু হে মোর সন্তানগণ! আমার স্নিগ্ধ শ্যামল বক্ষ শান্তির আধার, প্রকৃতির লীলাভূমি নিজস্ব তোমার। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, নব রূপ দাও, অচিরেই শান্তি লাভ করিবে।

বিশ্বজননী বৎসরে ছয় মাস অন্তর অন্তর মোহমুগ্ধ নিদ্রিত মানবকে জাগ্রত করিবার জন্য দুরাচার-অসুর-দলনী দশভুজারূপে দেখা দিয়া থাকেন। বিমুগ্ধ মানবকে শক্তিপূজায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার রূপ, বাণী এবং কর্ম্মচাঞ্চল্য নিতান্ত বিস্ময়কর। এই জাগ্রত শক্তিরূপিণী বিশ্ব-জননীর বাণী—"হে মোর সন্তানগণ! তোমাদের অন্তরের ও বাহিরের পাপরূপ শত্রু দলনে তৎপর হও। সেজন্য যত কিছু অস্ত্রের প্রয়োজন তাহা ধারণ কর, সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া পাপকে দলন কর। এমন কি প্রয়োজন হইলে পশুশক্তিকেও করতলগত এবং পদানত করিয়া পাপ দলনে নিয়োগ কর।" তাই মায়ের এক হাতে বিষধর সর্পপুচ্ছ, পদতলে পশুরাজ সিংহ। উভয়েই শত্রুদলনে তৎপর। সুব্যবহারে পশুশক্তিও মহৎ ফল প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাও অনাবশ্যক নহে। পাপ দমনের যে কি মহৎ ফল, জননী তাহাও জলন্ত ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। উহা হইতে ধনরত্নের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, সর্ব্বজ্ঞানের আধার সরস্বতী, শৌর্য্য-বীর্য্যের আধার কার্ত্তিকেয়, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ, পাপ দমনের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হন, অর্থাৎ যা কিছু কাম্য সকলই লাভ হইয়া থাকে। শুধু কি তাই, ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখ। ঐ যে যোগিরাজ মহেশ্বরকে দেখিতেছ,' তাঁহারই মত তুমি অবশেষে সর্ব্বাতীত হইয়া পরম মঙ্গলময় শিবত্বের অধিকারী হইবে। মায়ের এই যে মহাশক্তি রূপ, মানব তাহার একাগ্র উপাসক হইয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ করুক, দুর্গোৎসবে আর্য্য-ঋষি তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছেন।

মায়ের এই অসুরমর্দ্দিনীরূপের পার্শ্বে সলজ্জ মাতৃরূপের অবতারণার প্রয়োজন যে কি, আমাদিগকে তাহাই এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কলা-বৌএর অন্য নাম নবপত্রিকা। তাহার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাহার অবগুণ্ঠনের ভিতর ঋষিগণ কি কি জিনিস স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে বঙ্গপল্লীর চিরপরিচিত অতি সাধারণ অথচ প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুল্মলতা প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেণীর উদ্ভিদই স্থাপন করা হইয়াছে। তাহাতে রহিয়াছে কলা, ধান, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, জয়ন্তী, মানকচু, কালকচু, শ্বেত-অপরাজিতা— এই নয়টি জীবন্ত উদ্ভিদ। উহাদেরই সমাহারে কলা-বৌএর কোমলাঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাকে দেখিলেই বাঙ্গালী পল্লীবধূর সলজ্জ মাতৃমূর্ত্তির কথা আমাদের মনে পড়ে। সন্তানের, এমন কি পরিবারের সকলের তুষ্টি, পুষ্টি, স্বাস্থ্য যেমন তাহারই হস্তে ন্যস্ত, তেমনি উদ্ভিদ-জগতের উপরই সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে মানবের সকল বিষয় নির্ভর করিয়া থাকে। তাই প্রকৃতিরূপা বিশ্বজননীকে আর্য্য-ঋষিগণ এই সকল উদ্ভিদের সমবায়ে পল্লী-জননীর রূপদান করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্থান যে সকল সময়ে সর্ব্বাগ্রে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নাই। মানবের সুস্থ সুপুষ্ট

দেহের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। তাই মায়ের এই রাজসিক রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির সম্মুখে পল্লী-জননী কলা-বৌকে স্থাপন করিয়া তাঁহারা দূরদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিরই পরিচয় দান করিয়াছেন। উৎসব-মুগ্ধ মানব ক্ষণকালের জন্যও যাহাতে অন্ন-বস্ত্রদানকারী পল্লী-জননী অন্নদার কথা বিস্মৃত না হয়, তাহার জন্যই তাঁহাদের এই সুচিন্তিত ব্যবস্থা। পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদগুলির রূপগুণের কথা এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, তাঁহাদের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করি।

প্রথম কলাগাছের কথাই আলোচনা করা যাক। কদলীর পত্রকাণ্ডের মসৃণ শ্যাম শোভা সকলকেই আনন্দ দান করিয়া থাকে। সকল প্রকার শুভ কার্য্যেই তাহার স্থান সর্ব্বাগ্রে। পুষ্পোদ্গম কালে তাহার সেই শোভা যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার কচি পুষ্প-গুচ্ছ, থোর প্রভৃতি বাঙ্গালীর পুষ্টিকর প্রিয় খাদ্য। সুমিষ্ট পাকা কলার ত কথাই নাই, শিশু হইতে দন্তহীন বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের নিকট উহা সমভাবে আদৃত হইয়া থাকে। দরিদ্র পল্লীবাসীর কুটির-পার্শ্বে এবং ধনীর সযত্ন-রক্ষিত বাগানে কলাগাছ সমভাবে বর্দ্ধিত হইয়া পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। উহার ভেষজগুণও উল্লেখযোগ্য। তাই কদলীকে আর্য্য-ঋষিগণ মাতৃ-অর্চ্চনায় গ্রহণ করিয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য সম্মানই প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ধানগাছের কথা। ধানগাছ তৃণশ্রেণীর অন্তর্গত। বঙ্গপল্লীর মাঠে মাঠে ধানের সবুজ কোমল কাণ্ডপাতা যখন হাওয়ার তালে তালে নাচিতে থাকে, তখন মাঠের বুকে যে জীবন্ত সবুজ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিতান্ত নিরানন্দের মনেও আনন্দের উৎপত্তি হয়। সুপক্ক অবস্থায় ধান ও ধানগাছ যখন সোনার বর্ণ ধারণ করে, তখন উহারা মাঠকে আবার এক নব সৌন্দর্য্য দান করিয়া থাকে। ধান নিতান্ত দুর্ব্বল তৃণ হইলেও মানবের অন্যতম প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য চাল উৎপাদন করে, এবং দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে অন্ন বিতরণ করিয়া থাকে। এই ধানকেও আর্য্য-ঋষিগণ মাতৃ-অঙ্গ গঠনে সযত্নে স্থান দান করিয়া মাতৃপূজা লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যুগল বেল এবং পত্রকাণ্ডও এই মাতৃ-অঙ্গ গঠনে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। বসন্তে নবপত্রোদ্গমকালে বিল্ববৃক্ষ এক অতি প্রিয়দর্শন কোমল শ্যামরূপ ধারণ করে। তারপর উহার পত্রাবলীর সবুজ বর্ণ ঘনতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা নব নব রূপ ধারণ করিতে থাকে। পুষ্পোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষে মৌমাছির গুঞ্জন আরম্ভ হয়। তারই পরে উহাদের ক্রমবর্দ্ধিত ফলগুলি পল্লব অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসে। বিল্বের মাতৃরূপ তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিল্বফল পল্লী-জননীর একটি বিশেষ দান। পাকা বেল সুখাদ্য এবং পুষ্টিকর। গুণের দিক দিয়া পাকা বেলের চাইতে কাঁচা বেলের স্থান অনেক উপরে। রোগ বিশেষে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে উহা ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই কাজ করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উহার যথেষ্ট ফলশ্রুতি আছে।

তারপর দাড়িম্বগাছের কথা। উহা পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর আঙ্গিনাতে সযত্নে বর্দ্ধিত হয়। উহার ফল পুষ্প পাতা সকলই সুন্দর। শুধু তাহাই নহে, উহার ফল মূল পত্র

সকলই মানুষের অসুখ-বিসুখে ঔষধ এবং পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার লাল কোমল ফুলদল সকলকেই আনন্দ দান করে। তারপর ফুল হইতে উৎপন্ন ফল যখন ধীরে ধীরে পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সকলেই উহার অম্লমধুর রস পানের জন্য আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং দাড়িম্বের মাতৃ-আসনে স্থান লাভ কখনও অযৌক্তিক নহে।

অশোকের পত্রপুষ্পের সৌন্দর্য্য পল্লীকে বসন্তকালে যে এক অভিনব শ্রীসম্পন্ন করে, তাহা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? সবুজ পত্রের মাঝে লালফুলের শত শত গুচ্ছ উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষকে এক বিশেষ দর্শনীয় রূপে পরিণত করে। শুধু কি তাই, অশোক ঔষধ প্রদানকারী এক বিশেষ উদ্ভিদ রূপে সকলের নিকট পরিচিত। উহা শীতবীর্য্য, হৃদ্‌যন্ত্রের উপকারী, গুল্ম, শূল, উদরী প্রভৃতি রোগের পক্ষে এবং নানারূপ স্ত্রীরোগে মহা উপকারী।

জয়ন্তীগাছ পল্লী-সাধারণের অতি পরিচিত গাছ। উহার বহুফলক পত্রে শোভিত কাণ্ড এবং পুষ্পগুচ্ছ উহাকে এক স্নিগ্ধ শান্ত মূর্ত্তিরূপে পরিণত করে। অযত্নে বর্দ্ধিত হইলেও ঔষধ হিসাবে উহার পত্রমূল ইত্যাদি পল্লীবাসী কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। উহার মূল মস্তকে ধারণ করিলে কোন কোন জ্বর নিবারিত হয় বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। উহার পাতা বিষদোষ নাশক এবং চক্ষুর হিতকারী।

শ্বেত-অপরাজিতা পল্লীর অন্য আর একটি অতি সাধারণ লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। উহার ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ পত্রাবলীর মাঝে মাঝে শ্বেত প্রজাপতির মত ফুলগুলি যখন ফুটিয়া থাকে, তখন বড়ই মনোরম দেখায়। উহা ঔষধলতারূপেও বিশেষভাবে পরিচিত। উহা কুষ্ঠরোগ, মূত্ররোগ ও বিষদোষে উপকারী, দৃষ্টিশক্তিরও উন্নতি সাধন করে। কলা-বৌএর মাতৃমূর্ত্তিতে উহাও স্থান লাভ করিয়াছে। এমন কি পল্লীর অতিসাধারণ অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ্, যথা—হলুদ, মানকচু, কালকচুও আর্য্য-ঋষিগণ এই মাতৃদেহ গঠনের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। উহাদের প্রত্যেকের রূপ-গুণ সকলেরই পরিচিত। উহারা অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ উদ্ভিদ্ হইলেও উহাদের ভেষজ গুণও উল্লেখযোগ্য।

আয়ুর্ব্বেদ মতে হরিদ্রা ও মানকচুর গুণ—হরিদ্রা কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্ত দমনকারী, বর্ণ এবং ত্বকের দোষ দূর করে, এবং শোথ পাণ্ডু ও ব্রণ আরোগ্য করে। মানকচু লঘুপথ্য, শীতবীর্য্য, শোথ ও রক্তপিত্ত দূর করে। কালকচুর প্রচলিত নাম দাতর। উহা অরুচি রোগের ঔষধ হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

কলা-বৌএর অঙ্গীভূত এই সকল অতি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের কথা চিন্তা করিলে আমরা আর্য্য-ঋষির মাতৃপূজার এক বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির পরিচয় পাই। উহা হইতে তাঁহারা যে সাধারণ গাছপালার পূজক, সেকথা মনে করা নিতান্ত ভুল, বরং তাঁহারা যে গুণগ্রাহী এবং গুণেরই পূজক, উহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। শুধু তাহাই নহে, যে স্থানেই তাঁহারা কোন বিশিষ্ট

শক্তি অথবা গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, সে স্থানেই পরম পিতা ভগবানের মূর্ত্ত অভিব্যক্তি চিন্তা করিয়া ভক্তিসহকারে মাথা নত করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

যদ্ যদ্ বিভূতি মৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

"হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। যেথানে যে বিভূতি, শ্রী এবং প্রভাব দেখিবে, তাহাই আমার তেজ ও অংশ বলিয়া মনে করিবে। অথবা হে অর্জ্জুন! সবিস্তারে এত কথা জানিয়া তোমার কি হইবে? তুমি জানিয়া রাখ যে, আমার একটি মাত্র অংশ দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আমি ধারণ করিয়াছি। উহার যা কিছু সকলই আমি।"

আর্য্য-ঋষিগণ বৃক্ষলতা, দেবদেবীর পূজা এবং উপাসনার অন্তরালে—এক এবং অদ্বিতীয় সেই ভগবানের উপাসনারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহারা প্রত্যেকেই সেই অদ্বিতীয় ভগবানের আধার বিশেষ, সুতরাং সেইভাবে উহারা যে প্রত্যেকেই পূজার্হ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মণি-মুক্তা

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

সাগর মাঝারে আছে রত্ন অগণন।
নিরাপত্তা চাও? কর কিনারে গমন।
(সেখ সাদী)

পিপীলিকা কামড়ায়, পায়ে কাঁটা ফোটে;
সব দুঃখ জেনো নিজ কর্ম্মদোষে জোটে।
(সেখ নসিরুদ্দীন, চিরাগ-ই-দিল্লী)

যে ছড়ায় কাঁটা পথ মাঝে মোর অসূয়া ভরে।
জীবনের কাঁটা সব যেন তার ফুল হয়ে ঝরে!
(সেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া)

শ্রীনিখিল সেন

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরল কি সেক্ পোক।

কতটুকু বা বয়স। এখনো পুঁচকে ছেলেমানুষ। দু'গাল বেয়ে তার চোখের জল ঝরতে লাগল দরদর ধারায়।

ঘরে লাকড়ি ছিল না। কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল সে বনে। কিন্তু বনে, কাঠ কুড়ানও অপরাধ! দেশের শত্রু লি সিউঙ ম্যানের পুলিস তাকে ধরে তাই মেরেছে নিষ্ঠুরের মত।

ভাঙা কুঁড়েটার দাওয়ায় বসে ঠাকুরমা ছটফট করছিলেন নাতির জন্যে। বুড়ী আবার চোখে পায় না দেখতে।

নাতির পায়ের শব্দ শুনে ঠাকুরমা বলে উঠলেন, 'কি দাদা, কাঠ পেলি?'

কি সেক্ পোক তখন কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনাটা বললে ঠাকুরমাকে।

বুড়ী ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর চুপি চুপি বলল, 'ছাড়া পেলে শেয়ালগুলো অমন দাঁত খিঁচোয় বই কি! মেরে ফেলতে যখন পারবি নে, ওদের পেছন না নিলেই পারিস্।'

'আমি নাই বা পারলাম,' ফোঁস করে উঠল কি সেক্ পোক। চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ইল এন-দা মেরে কত সাবাড় করে দিলে।'

ইল এন কি সেক্ পোকের বড় ভাই, সে গেরিলা যোদ্ধা। ঘরে থাকে না। মিশমিশে অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাত্রে কোনদিন হয়ত বা এল। আপাদমস্তক বর্ষাতিতে তার ঢাকা। পায়ে

বুট; গায়ে খাকি সামরিক পোশাক। পিঠে ঝুলান টমিগান। হাতে থাকে বাঁধাকফি বা শালগম, কোন দিন হয়ত বা পাহাড়ী নদী থেকে ধরা মাছ। ইল এন এসে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে, ঠাকুরমাও ফেটে পড়েন খুশিতে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে ইল এন এসে শোয় তাঁর পাশে 'ক্যানের' মধ্যে, আর বলতে থাকে গেরিলাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা—দেশদ্রোহী লি সিউঙ ম্যানের ফৌজ আর পুলিসের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ান দেশভক্তদের অসীম দুঃসাহসের গল্প।…

কি সেক্ পোক কান খাড়া করে শোনে। শুনতে শুনতে বুক তার গর্বে ফুলে ওঠে, দম আসে বন্ধ হয়ে। দুঃখও হয়। সে যদি দাদাদের মত বড় হোত! প্রতিশোধ নিত সেও পিতৃহত্যার। লি সিউঙ ম্যানের সেপাইরা ঠিক যমদূতের মত এসে বাপকে তার নিয়ে গিয়েছিল ধরে। তারপর এক গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে তাকে ফাঁসি দিয়েছিল। সে প্রায় বছর খানেক হোল।

সেদিনকার কথা এখনো তার মনে আছে। চোখের উপর ভেসে ওঠে অদ্ভুত পোশাক-পরা লম্বা সেই লোকটার হিংস্র মুখখানা। ওই তো তার বাবাকে ফাঁসি দিতে হুকুম দিয়েছিল। তাদের কোরীয় ভাষা লোকটা জানে না। গাছতলায় নিয়ে গিয়ে ফাঁসির দড়িটা যখন তার বাপের গলায় পরিয়ে দিচ্ছিল, তখন লোকটা কি যেন সব বললে বিদেশী ভাষায়। দোভাষী তা গাঁয়ের সবাইকে বুঝিয়ে দিলে; বললে, 'গেরিলাদের যারা সাহায্য করবে, এমনি করে তাদের মরতে হবে।'

বুড়া ঠাকুরমা তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিলেন। বিদেশী ওই অফিসারটার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে অনুনয় করেছিলেন, এবারকার মত বাবাকে যেন প্রাণে রেহাই দেয়। কিন্তু লোকটা অমন করে পা ছুঁড়লে, ঠাকুরমা ছিটকে পড়লেন দূরে। বিদেশী অফিসারটার হাতে ছিল রূপোমোড়া একটা ছড়ি। ছড়িটা সে ঠাকুরমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। সাঁ করে গিয়ে লাগল ঠাকুরমার চোখে। চোখ ফেটে ঠাকুমার ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সেই থেকে তিনি দেখতে পান না চোখে, অন্ধ হয়ে গেছেন।

বিদেশী সেই অফিসারটার বাজখাঁই গলা এখনও তার কানে লেগে আছে। ওই তো জল্লাদকে হুকুম দিয়েছিল তার বাপকে ফাঁসি দিতে। ছড়ির খোঁচা দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল তার ঠাকুরমাকে।

সে তা ভুলে কি করে? সে কি ভুলবার মত ঘটনা!

একদিন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, গাঁয়ে এমন সময় খবর এল: লি সিউঙ ম্যানের সৈন্যরা সব যুদ্ধে হেরে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার বীর যোদ্ধারা ওদের তাড়া করেছে দক্ষিণমুখো। কথাটা কি সেক্ পোকও শুনল। সে তখন ছুটে গিয়ে বাপের বাঁশের ছড়িটা নিয়ে এল। ছড়িটাকে সে ভেঙে সমান দু' টুকরো করে নিলে। ঠাকুরমার কাছ থেকে এক টুকরো লাল সিল্কের ন্যাকড়া চেয়ে নিয়ে সে ছোট ছোট দুটি লাল ঝাণ্ডা বানালে।

উত্তর কোরিয়ার গণ-বাহিনীর প্রথম পল্টনকে যখন মার্চ করে আসতে দেখা গেল, কি সেক্ পোক তখন করল কি, সে তাদের কুঁড়ের চালায় উঠে ছোট ছোট সেই লাল ঝাণ্ডা দুখানা দোলাতে লাগল, আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করতে লাগল—'ম্যানস্থ মুগ্যান কিম্ ইল্ সুঙ্!'*

গণ-বাহিনী এসে পড়ার কিছুদিন পর ইল এন গাঁয়ে ফিরে এল। সে কৃষক-সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হোল। কৃষকদের মধ্যে সে যখন জমি বিলির তদারক করত, কি সেক্ পোকের ছোট বুকখানা তখন আনন্দে নেচে উঠত। দাদাকে তার গাঁয়ের সবাই কত মান্য করে, ভালবাসে অমন। জমি বিলির ব্যাপারে তার দাদার ন্যায়-বিচারের কত তারিফ করে সবাই।

বুড়া ঠাকুরমা চোখে দেখতে পান না। তবু তিনি আপন মনে বিড়-বিড় করতে থাকেন, 'আমার চোখ নেই রে, তবু দেখতে পাচ্ছি, গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে কি সুখ-শান্তিই না ফিরে এসেছে!'

কিন্তু বেশি দিন এই সুখ-শান্তিতে থাকা গেল না। আবার সাম্রাজ্যবাদী বর্গীরা এসে বাদ সাধল। লি সিউঙ ম্যান এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ওরা লেলিয়ে দিলে উত্তর কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে। সারা দুনিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও করলে: আসল আক্রমণকারী হোল উত্তর কোরিয়া। আর ওদের ঠেকাতে বিদেশী যুদ্ধবাজরা উত্তর কোরিয়ায় পাঠাতে লাগল লাখে লাখে সৈন্য-সামন্ত, বোমারু বিমান আর তাদের সেরা নৌ-বহর। তাদের কোপানলে পড়ে কোরিয়ার কত শত গ্রাম-নগর বোমার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কত অসহায় শিশু প্রাণ হারাল—কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ধরণীর বুক থেকে! চারদিকে পড়ে গেল হাহাকার!

কি সেক্ পোকের গাঁয়েও পিটুনী পুলিস এসে তাঁবু গাড়ল। গ্রামবাসীদের সবাইকে ওরা ধরপাকড় করতে লাগল। এনে জড়ো করতে লাগল পুরানো সেই গাছটার নীচে যার ডালে কি সেক্ পোকের বাপকে একদিন ওরা ফাঁসি দিয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা তো ভয়েই অস্থির! তাদের লক্ষ্য করে ঢেঙা মত একজন অফিসার বলে উঠল, 'কমিউনিস্টদের কে কে তোমরা অভিনন্দন করেছিলে, বল। কই, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

সবাই চুপ। কোনো কথা নেই কারো মুখে। লি সিউঙ ম্যানের এক প্রাক্তন পুলিস তখন এগিয়ে এল। ইতিপূর্বে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। বিদেশী সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসেছে। বিদেশীরা ওই দেশদ্রোহীটাকে মোড়ল করে দিয়েছে গাঁয়ের। ওরই কথামত সেপাইরা গ্রামবাসীদের গুলি করে মারে।

পুঁচকে কি সেক্ পোককেও ওরা পাকড়ে এনেছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে সে কটমট করে তাকাচ্ছিল ওই মোড়লটার দিকে। মোড়লের চোখ গিয়ে পড়ল তার উপর। ইল এন-এর কথাও

* লক্ষ বছর বেঁচে থাক কিম্ ইল্ সুঙ্ (উত্তর কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী)!

তার মনে পড়ে গেল। ইল এন তার প্রকাণ্ড বাড়িখানাকে দখল করে তাদের কৃষক-সমিতির সদর দপ্তর বানিয়ে তুলেছিল। জমিগুলো তার দিয়েছিল বাজেয়াপ্ত করে আর জোয়ান জোয়ান তার দশটা বলদ ধরে নিয়ে গিয়েছিল জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে।

মোড়ল তা ভোলেনি। কি সেক্ পোকের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রতিহিংসার কুটিল হাসি হাসলে।

'হুজুর, এই ছোড়াটার ভাই এখানকার সব কমিউনিস্টদের নেতা।' বলে হাতের ছড়িটা দিয়ে সে কি সেক্ পোককে দেখিয়ে দিলে অফিসারকে। আরও বললে, 'এই তো প্রথম কমিউনিস্টদের লাল ঝাণ্ডা দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, হুজুর!'

'তাই নাকি?' অফিসারটা তাকাল কি-সেক্‌ পোকের দিকে। তারপর গর্জে উঠল, 'এই ছোড়া, এদিকে আয়!'

কি সেক্‌ পোকের বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল। ভয়ে কচি মুখখানা হয়ে গেল সাদা ফ্যাকাশে। সে একবার ইতস্ততঃ করলে। তারপর দৃঢ়পদে অফিসারটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মাথা উঁচু করে।

'লাল ঝাণ্ডা তুই কেমন করে ওড়ালি দেখা তো?' অফিসারটা তাকে শুধালে। মুখে ঠোঁটে তার কুটিল হাসি।

কি সেক্‌ পোক অমনি দিলে এক ছুট্‌। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বাড়ি এসে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা লাল ঝাণ্ডা দুটো কুড়িয়ে নিলে। তারপর তা নিয়ে অফিসারটার সামনে এসে হাজির হোল। বললে, 'এমনি করে উড়িয়েছিলাম।'...

লাল ঝাণ্ডা দুটো সে মাথার উপর তুলে ধরলে। তারপর ফুস্‌ফুস্‌ ফুলিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'ম্যানস্থ মুগ্যান কিম্‌ ইল্‌ স্থঙ্‌!'

ভীড়ের মধ্য থেকে একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। বোকা ছোড়াটার পরিণাম ভেবে সবাই হায় হায় করে উঠল।

অফিসারটা চাপা ক্রোধে ঠোঁট কামড়ালে; বললে, 'এ দুটো ছাড়া লাল ঝাণ্ডা আর নেই এ তল্লাটে? আমি এ দুখানার ব্যবস্থা করছি।'

অফিসারটা সৈন্যদের দিকে ফিরে দাঁড়ালে। আদেশ দিলে, 'ছোড়াটার হাত দুখানা কেটে নাও!'

এটি উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ৪ঠা অক্টোবরের কথা। ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর কোরিয়ার ছুন্‌ছন এলাকায়।

সূর্য তখন মুঠি মুঠি সোনালি রোদ ছড়াচ্ছিল; বনের গাছপালাগুলো মর্মরিত হচ্ছে ঝিরঝিরে হাওয়ায়; পাহাড়ী নদীটি কুল-কুল করে বয়ে চলেছে আপন মনে। আর তারই পাশে গাছের একটা গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা বছর নয়েকের একটা ছোট ছেলে। নিঃসাড় মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার বুকের উপর। কনুই পর্যন্ত হাত দুখানা তার কাটা। চুইয়ে চুইয়ে তখনও রক্ত ঝরছে নীচে—বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা দুটি লাল ঝাণ্ডার ঠিক উপরটায়!......

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ঘুমের ভিতরে তখনো স্বপন-কল্লোল-সুর আবেশে বাজে,
সন্ধান পেয়ে সিঁধ কেটে চোর রাতের আঁধারে ঢুকেছে একা
দীপহারা গৃহমাঝে।
নাহি জানে কেহ : পুষ্পবিতানে পড়েছে একটি আলোক-রেখা!
রজনী তখন শেষ হয়ে এলো, ভোরের ভজন গাহিছে পাখী,
ঝরে ঝরে পড়ে নীহারবিন্দু পর্ণকুটীর-আঙিনা 'পরে,
নাম জপে রত সাধু ভট্টজী ধেয়ানের আলো পুলকে মাখি
প্রভুর করুণা তরে।
বুঝেছে ভক্ত সাঁচ্চারে ছেড়ে ঝুটারে নিয়েছে মানুষ বেছে,
পার্থিব ধনে স্পৃহা তার নাই, নিত্য ধনের ভিখারী সে যে।

একে একে যত ছিল তৈজস টাকাকড়ি আর দ্রব্য ভার—
অগোচরে সবি লইয়াছে চোরে, শেষে ভাবে—'একি হলো গো দায়!'
মাথায় পসরা তুলে নিতে সে যে হেরিছে নয়নে অন্ধকার,
চোরাই ধনের বিষম বোঝাটি হয়েছে কঠিন পাষাণ প্রায়।

সে বোঝা বহিতে সাধ যায় তার, বিকল হৃদয় বিফলে কাঁদে :
কোন মতে আনি টানাটানি করি আঙিনার কোলে লুকায়ে রয়,
দূর হতে তার দুর্দ্দশা দেখি ভট্টজী আসি হাসিয়া কয়—
'বন্ধু! তোমার সাথে
মোর ঘর হতে যত জঞ্জাল বাহির হয়েছে হেরিয়া আমি
নিজেরে ধন্য মানি—
—এবার আমারে করিয়াছে কৃপা তস্কর বেশে জীবন-স্বামী,
নাহি ভয় তব, ধর বোঝা শিরে—' কহে ভট্টজী বোঝাটি টানি!
তুলে দিল তাহা মস্তকোপরি, পিছনের পানে চাহে না ফিরে,
কিছু দূরে গিয়া সেই বোঝা লয়ে ফিরে আসে চোর কুটীর-দ্বারে,
নাম গানে গানে সাধু ভট্টজী ডাকে ভগবানে প্রাণের তীরে।
নীরবে দাঁড়ায়ে অশ্রুসজল নয়নে সে চোর হেরিছে তারে।

শান্ত সৌম্য মধুর মূরতি ভেদিয়া উঠেছে দিব্য শিখা,
হেরিতে হেরিতে ভাবিল সে চোর—'আমি যে পাতকী গতি কি হবে!
প্রতিদিবসের জীবনে আমার কত কলঙ্ক-কালিমা লিখা।
যাদের জন্য করিতেছি চুরি তারা কি জগতে সাধুই রবে?
আমার পাপের অংশ কি কেহ নেবে না ভুলেও ভুবনে কভু!
ভালোবাসা দিয়ে বেঁধেছি যাদের, বাঁধন ছিঁড়িবে তারা কি তবু?'
জাগে অনুতাপ অন্তর মাঝে অতীতের কথা পড়েছে মনে,
কত সংসার শূন্য করেছে রিক্ত করেছে পান্থজনে।

বোঝা ফেলে দিয়ে ওই চোর শেষে কেঁদে কহে—'প্রভু! পাপের ভারে
হইয়াছি ব্যথাতুর।
কৃপা কর মোরে ওগো দয়াময়! পাপের বোঝাটি করগো দূর—'
ভক্তচরণ পরশ লভিয়া তস্কর হলো পরম সাধু,
শুধায় দেশের তরু কিশলয়—'ভট্ট ঠাকুর! জানো কি যাদু?—'

ওস্তাদের মার

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রেলগাড়ীর সঙ্গে ভুঁড়ির যে এমন আড়াআড়ি সম্পর্ক, এর আগে কোন দিন সেটা টেরও পাননি শিবু মামা। ঝটাং ঝট্—ঝটাং ঝট্ দিল্লী মেল ছুটছে। সেই সঙ্গে ছুটছেন শিবু মামাও। নামবেন হাথরাসে—সেখান থেকে বেড়াতে যাবেন মথুরায়। কিন্তু দুলুনির চোটে সন্দেহ হচ্ছে—সশরীরে নয়, অশরীরী হয়েই তাঁকে মথুরায় পৌছুতে হবে।

চিত্ হয়ে শুলেন—ভুঁড়িটা অ্যাটলান্টিকের মতো দুলতে লাগল। কাত্ হয়ে শুলেন—পেটের মধ্যে সোডার বোতলের মতো ঝাঁকাতে লাগল। উপুড় হয়ে শুলেন—সারা শরীর বলের মতো লাফাতে লাগল।

নাঃ—অসম্ভব!

টাকার শোকে শিবু মামার হৃদয় হাহাকার করতে লাগল। মিথ্যেমিথ্যিই এতগুলো টাকা খরচ করে সেকেণ্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করলেন। ঘুমোনোই যদি না গেল তা হলে ঘুষোঘুষি করে জানলা দিয়ে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় চাপলেই বা ক্ষতি ছিল কি? বরং সেইটেই ঢের ভালো হত, শিবু মামা ভেবে দেখলেন। ভিড়ের চাপে নড়াচড়া করা তো দূরের কথা, ট্যাঁ ফোঁ করার জো থাকত না ভুঁড়ির। বরং এক ফাঁকে মোটাসোটা কারুর কাঁধের উপর মাথাটাকে চড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়েও নিতে পারতেন খানিকটা।

কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসের এই সুখশয্যা শরশয্যা বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

কামরায় দুটি মাত্র প্রাণী। ও পাশের বার্থে রোগা পটকা এক ছোকরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

শিবু মামার হিংসে হতে লাগল। এই রাত বারোটায় তিনি যখন ঠায় জেগে, তখন আর একজন এমন করে সুখনিদ্রা দিচ্ছে! তাঁর নাকে যখন শামা পোকা ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তখন আর একজন নাক ডাকাচ্ছে! এ কী নির্মম নিষ্ঠুরতা! কী হৃদয়হীন স্বার্থপরতা!

এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যাবে না।

শিবু মামা আস্তে আস্তে উঠে এলেন।

—মশাই, শুনছেন?

সাড়া নেই।

—শুনতে পাচ্ছেন, অ মশাই?

—উঁ?—ঘুমন্ত ছোকরার নাকের ডাক বন্ধ হল।

—শুনুন না একবার—

—অ্যাঁ—কী হয়েছে?—এইবার ছোকরা ধড়মড় করে উঠে বসল: ব্যাপার কী? এত রাতে এমন করে ডাকাকাকি করছেন কেন?

শিবু মামা টাক চুলকে নিলেন একবার।

—না ইয়ে, এই জিজ্ঞেস করছিলুম, আপনি ঘুমুচ্ছেন কিনা।

খানিকক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শেষে ফ্যাঁচ-ফ্যাচ করে উঠল ছোকরা।

—আচ্ছা লোক তো মশাই! ঘুমুচ্ছি কিনা জানবার জন্যে আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন!

শুনে শিবু মামা ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসলেন।

—আহা তা নইলে বুঝব কি করে যে সত্যিই ঘুমুচ্ছেন না চালাকি করে মটকা মেরে পড়ে আছেন।

—এই মাঝরাতে দিল্লী মেলে কোন্ দুঃখে মটকা মেরে পড়ে থাকব মশাই! চালাকিই বা করতে যাব কার সঙ্গে? আপনি ত ভারী ফেরেব্বাজ লোক! যান—যান কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করে বিরক্ত করবেন না। ঘুমুতে দিন্।

—চটছেন কেন দাদা?—মুখভরা হাসি টেনে শিবু মামা লোকটির বিছানার পাশে বসে পড়লেন, বসে পড়লেন একেবারে গা ঘেঁসেই। বললেন—সত্যিই তো আর ঘুমুচ্ছিলেন না। দিব্যি নিরিবিলিতে শুয়ে শুয়ে হাঁসের ডিম খাচ্ছিলেন।

—কী যা তা বকছেন মশাই! মাথা খারাপ নাকি আপনার? শান্তিপুরের গোঁসাই বংশের ছেলে আমি। হাঁসের ডিম খাওয়া কী বলছেন, হাঁস দেখলে গঙ্গাস্নান করে ফেলি।

—সেই জন্যেই তো দিল্লী মেলে চাদর মুড়ি দিয়ে চুপি চুপি ডিম খাচ্ছিলেন!

লোকটা এবার তেড়ে উঠল—মিথ্যে বদনাম দেবেন না মশাই! জানেন এর জন্যে আপনার নামে মানহানির মামলা করতে পারি আমি?

—না, পারেন না।—শিবু মামা আবার ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসলেন : হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছেন।—বলেই খপ্ করে লোকটার চাদরের তলায় হাত দিয়ে একটা ডিম বের করে আনলেন : এটা কী ?

—অ্যাঁ—ডিম !—লোকটার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, ডিম।

—অসম্ভব, হতেই পারে না।

—হতেই পারে না ! তা হলে বালিশে ডিম পাড়ল বলতে চান ? হাঁসে ডিম পাড়ে মশাই,
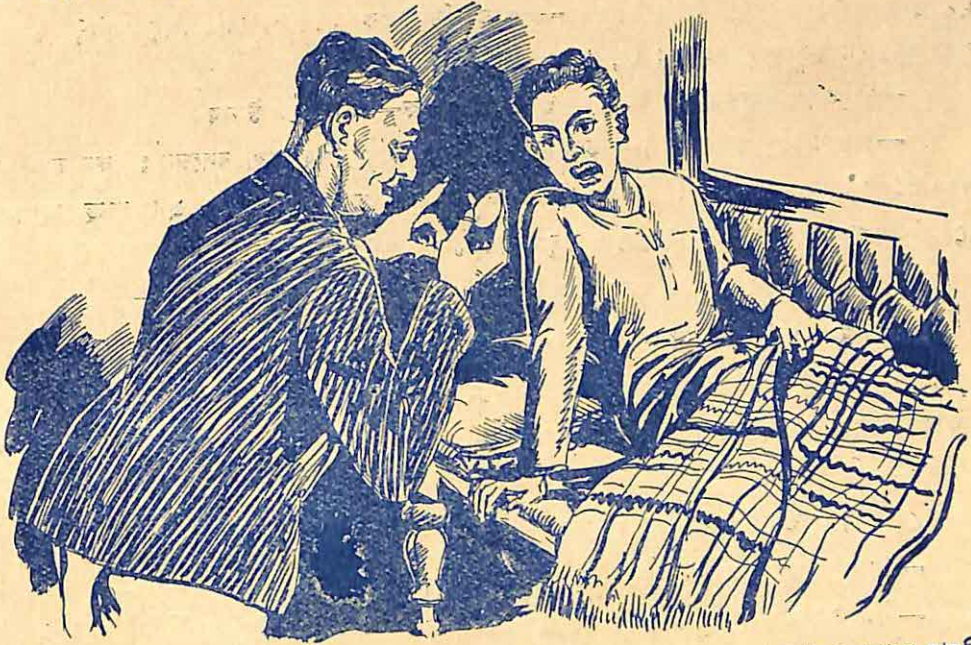
মুরগীতেও পাড়ে, ঘোড়াও পাড়ে কখনো। কিন্তু বালিশে ডিম পাড়ে—এ তো কখনও শোনা যায়নি ! তাও আবার সেদ্ধ ডিম !

—তা হলে আপনিই চালাকি করে আমার বালিশের নিচে ডিম রেখেছেন।—লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

—আমি ? আমি কেন রাখতে যাব ? কী দায় আমার ? পরের বিছানায় সেদ্ধ ডিম রাখার চেয়ে নিজের পেটে রাখাই আমি ঢের বেশি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি।

—চক্রান্ত ! ভীষণ—ভয়ঙ্কর চক্রান্ত !—লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলল : আমার সর্বনাশ করবার ফন্দি ! জানেন, আমি ডিম খেয়েছি শুনলে বাবা দারোয়ান দিয়ে আমাকে বের করে দেবেন ? তিন লাখ টাকার সম্পত্তি একেবারে বরবাদ !

শিবু মামা বললেন : আহা-হা, চুক্ চুক্!

—চুক্ চুক্? চুক্ চুক্ করেই চুকিয়ে দিলেন আপনি? এদিকে যে আমার বুক ধুক্ধুক্ করছে মশাই! উঁহু, এসব আপনারই ষড়যন্ত্র। হীন, কুটীল ষড়যন্ত্র। নিশ্চয় কোনো গুণ্ডাদলের লোক আপান! নির্ঘাৎ!—লোকটার গলা কাঁপতে লাগল, চিড়বিড় করে উঠে দাঁড়াল সে : আমি—আমি এখুনি চেন টানব—

চেন টানবার আগেই তাকে টেনে বসিয়ে দিলেন শিবু মামা।

—আহা-হা, অত ক্ষেপছেন কেন? আমার সামনে ডিমটা খেতে যদি আপনার চক্ষুলজ্জা হয়, তা হলে আমিই খেয়ে নিচ্ছি না হয়।—সশব্দে ডিমটাকে মুখে পুরলেন শিবু মামা, চোখ বুজে পরম আরামে চিবুতে লাগলেন : হুঁ, ভালোই ডিমটা। পচা নয়।

—রাখুন আপনার ভালো ডিম। ছাড়ুন আমাকে—আমি চেন টানব।

—অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?—ডিমটাকে ম্যানেজ করে শিবু মামা বললেন : কেন ভয় পাচ্ছেন এমন করে? আমার মতো নিরীহ একটা ভালো লোককে দেখে গুণ্ডা বলে ভ্রম হচ্ছে আপনার? দুটোর জায়গায় চারটে চোখ নিয়েছেন, তবু মানুষ চিনতে পারেন না?

বলেই খাঁ করে শিবু মামা ছোকরার নাকের ওপর থেকে চশমাটা তুলে নিলেন।

—আহা—করছেন কী? চশমা দিন্ মশাই—

—কী হবে চশমা দিয়ে? যে চশমা পরে ভদ্রলোককে গুণ্ডা বলে মনে হয়, সে চশমা থাকলেই কী, আর গেলেই কী?—বলেই শিবু মামা জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে দিলেন—বার করে আনলেন খালি হাত।

ছোকরা আর্তনাদ করে উঠল।

—অ্যাঁ! করলেন কী? ফেলে দিলেন চশমাটা?

—দিলাম বই কি! চুকিয়ে দিলাম আপদ।

—সোনার ফ্রেমের চশমা মশাই, বাইফোকাল লেন্স। কমসে কম দু'শো টাকা দাম। জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন! আপনি তো বদ্ধ পাগল!—ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল : এইবার আমায় কামড়ে দেবেন দেখছি! আর পাগলে কামড়ালেই জলাতঙ্ক! আমি চেন টানব—নির্ঘাৎ চেন টানব—

বলেই এক লাফে চেন ধরে ঝুলে পড়তে গেল। কিন্তু তার আগেই তাকে ধরে ঝুলে পড়লেন শিবু মামা। একেবারে চিত্ করে ফেললেন মেজের ওপর।

ছোকরা গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বলল : হেল্প হেল্প—মার্ডার!

মার্ডার! কিসের মার্ডার? কে কাকে মার্ডার করে?—শিবু মামা ছোকরার ঘাড় ধরে বার্থের ওপর তুলে দিলেন : আমি থাকতে কে মার্ডার করবে আপনাকে?

—আমার দু'শো টাকা দামের চশমা—

—চশমা চশমা করে ক্ষেপে গেলেন যে। ওই তো আপনার বুক পকেটে চশমা রয়েছে—বলেই ঝাঁ করে তার পকেট থেকে চশমাটা বের করে আনলেন শিবু মামা।

—অ্যাঁ!

—অ্যাঁ কী মশাই! নিজের পকেটে চশমা রেখে চেন টানতে যাচ্ছিলেন! এক্ষুনি পঞ্চাশ টাকা ফাইন দিতে হত, খেয়াল আছে!

—আপনি—আপনি ভেল্‌কি জানেন মশাই!—ছোকরা বিড়-বিড় করে বললে।

—ভেল্‌কি! ভেল্‌কি টেলকির কোনো ধার ধারি না আমি। একরাশ ডিম খেয়ে আপনার পেট গরম হয়ে গেছে, তাই ওসব খেয়াল দেখছেন।

—খবর্দার বলছি, ডিম ডিম করবেন না!—এত দুঃখের মধ্যেও খেঁকিয়ে উঠল লোকটা: জানেন, বাবার কানে গেলে কী অবস্থা হবে আমার? স্রেফ কান ধরে রাস্তায় নামিয়ে দেবেন আমাকে!

—ভয় নেই মশাই—আশ্বাস দিয়ে শিবু মামা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসলেন: আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না। বলেই বা আমার লাভ কী? আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করে আপনার বাবা তো আর আমাকে সম্পত্তি তুলে দেবেন না। সে ভরসা থাকলে না হয় দেখা যেত চেষ্টা করে। আমি বলছিলাম, ভবিষ্যতে অমন করে আর রাত জেগে ডিম খাবেন না। মাথা গোলমাল হয়ে যায় ওসব খেলে।

শিবু মামা উঠে পড়লেন।

—নিন, ঘুমুন এবার।

নিজের সীটে ফিরে এলেন শিবু মামা, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্তে টানতে লাগলেন। ছোকরা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে রইল। অনেকগুলো কথা তার গলার ভেতর গজ-গজ করে উঠছিল, কিন্তু বলবার মতো সাহসই খুঁজে পেল না সে।

তারপর সত্যিই মাথা গরম হয়ে গেছে মনে করে নিজের ব্রহ্মতালুতে টক্ টক্ করে টোকা দিলে গোটা তিনেক। দু'বার পেটে থাবড়া দিয়ে বুঝতে চাইল সত্যি সত্যিই পেট গরম হয়েছে কিনা। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল—পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করল তার।

শিবু মামা চুপচাপ বসে সিগারেট টানতে লাগলেন।

* * *

ঝটাং ঝট্—ঝটাং ঝট্—

দিল্লী মেল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সমানে ছুটছে। রাত প্রায় দুটো। গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে ছোকরা।

—খুন—খুন—বাঁচাও—

বিকট বিকৃত গলার চীৎকার উঠল একটা। সে চীৎকারে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠতে গেল ছোকরা, তারপর চাদরে পা জড়িয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেজের ওপর।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তাতে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল তার। এক মুহূর্তে সারা শরীর হিম হয়ে গেল, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ।

নিজের বার্থে হাত-পা ছড়িয়ে চিত্ হয়ে পড়ে আছেন শিবু মামা। একটা ধারালো চকচকে ছোরা তাঁর গলায় বসানো। একরাশ রক্ত জমেছে তাঁর বুকের ওপর। চোখ দুটো বিস্ফারিত—ট্রেনের তালে তালে শুধু তার ভুঁড়িটা দোল খাচ্ছে।

আর একটা আর্তনাদ তুলেই সে পেছন ফিরে চেনের দিকে লাফ মারল। এবার আর তাকে বাধা দিলে না কেউ। চেন ধরে সটান ঝুলে পড়ল সে।

ঘটাং ঘট্—ঘ্যাস্-ঘ্যাস্-ঘ্যাস্—দিল্লী মেল থেমে গেল।

বাইরে কোলাহল উঠল। ট্রেন থেকে নেমে পড়ল লোকজন। খানিক পরেই ঘটাং করে খুলে গেল কামরার দরজা। লণ্ঠন হাতে ঢুকলেন গার্ড, তার পেছনে আরো পাঁচ-সাতজন। ছোকরা তখনো চেন ধরে ঝুলছে চোখ বুজেই।

—ব্যাপার কী? অমন করে ঝুলছেন কেন চেন ধরে?—হেঁড়ে গলায় জানতে চাইলেন গার্ড।

—খুন হয়েছে!—তেমনি চোখ বুজে জবাব দিলে ছোকরা।

—খুন? কোথায় খুন?—হকচকিয়ে গার্ড উঠে এলেন ভেতরে: কে খুন হল? লাশ কই?

—পাশের বার্থে।

—পাশের বার্থে!—গার্ডের বিস্ময় সীমাহীন: পাশের বার্থে তো কেউ নেই মশাই। একটা বিছানা আছে বটে, কিন্তু লাশফাশ তো দেখছি না।

—আছে—আছে, ভালো করে দেখুন।

—ভালো করে দেখব? লাশ কি ছারপোকা মশাই যে বিছানার ভেতরে ফস্ করে লুকিয়ে যাবে?—গার্ড বার্থের নীচে উবু হয়ে বসে উঁকিঝুঁকি মারলেন: কিচ্ছু না—কোথাও কিছুই নেই। লাশ গেল কোথায়?—গার্ড বিরক্ত হয়ে ছোকরার জামা ধরে টান মারলেন: নেমে পড়ুন না মশাই! খামোকা ছিঁড়ছেন কেন কোম্পানির চেন?

টয়লেটের দরজা খুলে শিবু মামা বেরিয়ে এলেন।

—ব্যাপার কী, এত চেঁচামেচি কিসের? আবার গাড়ীতে গার্ড সাহেব যে! কী হল?

শিবু মামার গলা শুনে ছোকরা চেন ছেড়ে দিয়ে ধপ্ করে পড়ে গেল মাটিতে।

—আপনি—আপনি!

—হাঁ, আমি। আমি বই কি। অত ঘাবড়ে গেলেন কেন? চেন ধরেই বা ঝুলছেন কি জন্যে?

—আপনি, আপনি খুন হননি?—ছোকরার গলা দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বেরুল একটা।

—আমি খুন হব? কেন, কোন্ দুঃখে? খুন হওয়ার কী দায় আমার? এখনো খেয়াল দেখছেন বুঝি?—শিবু মামার স্বরে ভৎর্সনা: বললাম রাত্তিরে অত ডিম খাবেন না—পেট গরম হবে···

—থামুন—গার্ড হেঁড়ে গলায় বাধা দিলেন, এগিয়ে গেলেন ছোকরার দিকে: ইনিই খুন হয়েছিলেন বলছেন আপনি?

মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না ছোকরার। শুধু ঘাড় নাড়ল বোকার মতো।

—কতটা সিদ্ধি খেয়েছিলেন?

ছোকরা ফ্যাঁচ করে উঠল: সিদ্ধি খাই না আমি।

শিবু মামা মাথা নাড়লেন: ঠিক। সিদ্ধি উনি খান না। কয়েকটা ডিম খেয়েছিলেন খালি। তাইতেই পেট গরম হয়ে এই কাণ্ড।

—খবর্দার, ডিম ডিম করবেন না।—ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল।

গার্ড বললেন: হুম্! চুপ করুন এবার। আপনার নাম?

—ঘনশ্যাম গোঁসাই।

—যাবেন কোথায়?

—এটাওয়া।

একটা নোট বই বের করে টুকে নিলেন গার্ড: নামবার আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যাবেন কোম্পানিকে।

সদলবলে গার্ড বিদায় নিলেন। আবার গাড়ী ছাড়ল।

ঘনশ্যাম ঝিম মেরে বসে ছিল। খানিক পরে মাথা তুলে বললে: বুঝেছি!

শিবু মামা মিটমিট্ করে হাসছিলেন, বললেন: কী বুঝেছেন?

—আপনি ম্যাজিসিয়ান।

খেলা যথেষ্ট দেখানো হয়েছে মনে করে খুশিতে হা হা করে হেসে উঠলেন শিবু মামা: এতক্ষণে বুঝেছেন দেখছি। বড্ড দেরীতে বোঝেন আপনি!

ঘনশ্যাম বললে: হুঁ!

শিবু মামা বললেন: মিথ্যে ঘুমিয়েই সময় নষ্ট করতেন। তার চাইতে দিব্যি সারারাত ম্যাজিক দেখলেন। ভালো লাগল না?

ঘনশ্যাম বললে: চমৎকার! কিন্তু আপনার ম্যাজিকের টিকিটের হার বড্ড বেশি। পঞ্চাশ টাকা।

শিবু মামা আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন।

ঘনশ্যাম বললে: আপনার ম্যাজিক খুব এন্‌জয় করলাম মশাই! শুধু মনে প্রাণে নয়, দেহেও বটে। দু দু'বার যা আছাড় খেয়েছি মেজের ওপর, সাতদিনে গায়ের ব্যথা সারলে হয়!—ঘনশ্যাম একবার ঘড়ির দিকে তাকাল: কিছু যদি মনে না করেন—আমিও এক আধটু ম্যাজিক জানি।

—আপনিও ম্যাজিক জানেন ?—এবার শিবু মামার তাজ্জব লাগবার পালা।

—হাঁ, অল্প-সল্প !—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘনশ্যাম মনে মনে কী একটা হিসেব করল : তবে আপনার মতো অত ভালো নয় ! এতক্ষণ পরে এই প্রথম হাসল সে : দশ মিনিটের মধ্যে ট্রেনের এই কামরাটাকে আমি ফুলবাগান বানিয়ে দিতে পারি।

—ফুলবাগান !—শিবু মামা হাঁ করলেন।

—হাঁ, ফুল। রাশি রাশি ফুল—গাছভরা ফুল—

—বলেন কী মশাই ! অনেক ম্যাজিক দেখেছি, করেছিও অনেক, কিন্তু দশ মিনিটে রেলের কামরাকে ফুলবাগান বানিয়ে দেওয়া যায়, এমন তো কখনো শুনিনি।

—এটা আফ্রিকান ম্যাজিক ! সারা ভারতবর্ষে একমাত্র আমিই জানি।

—বটে ! তবে তো দেখতে হচ্ছে। শিখেও নিতে পারি। আজকাল ম্যাজিক দেখে কেউ পয়সা দেয় না মশাই, তাই বিনা পয়সায় দেখাতে হয় সব জায়গায়। এরকম একটা ম্যাজিক করতে পারলে তো লাল হয়ে যাব—অন্ন মারা যাবে পি. সি. সরকারের !—শিবু মামা ছট্‌ফট্‌ করে উঠলেন : কই দেখান ম্যাজিক।

ঘনশ্যাম এগিয়ে এল শিবু মামার দিকে।

—রেডি ?

—রেডি।

শিবু মামার চোখের সামনে হাওয়ায় হাত বুলোতে লাগল ঘনশ্যাম : চোখ বুজুন। একদম বুজে থাকুন। ঠিক দশ মিনিট পরে যেই বলব, চোখ খুলবেন। দেখবেন—চারদিকে ফুল—রাশি রাশি ফুল—

বাইরে গাড়ীর বেগ একটু একটু করে কমে আসছে। একটা ষ্টেশন এল বোধ হয়।

শিবু মামা চোখ বুজলেন।

—ভালো করে—খুব ভালো করে বুজুন। দশ মিনিটের আগে খুলবেন না। তারপর চারদিকে দেখবেন ফুল—শুধু ফুল—অজস্র ফুল—

গাড়ীটা ষ্টেশনে ইন্‌ করল।

ঠিক দশ মিনিট পরেই চোখ খুললেন শিবু মামা। ট্রেন ততক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে।

ফুল দেখলেন শিবু মামা ! অজস্র অপর্যাপ্ত ফুল !

কামরায় ঘনশ্যাম নেই। তার অ্যাটাচি নেই, সেই সঙ্গে নেই শিবু মামার স্যুটকেসটাও। নগদে আর জিনিসপত্রে তাতে সাত-আটশো টাকা ছিল কম্‌সে কম !

মোক্ষম ম্যাজিক দেখিয়েছে ঘনশ্যাম—একেবারে ভ্যানিশিং ম্যাজিক ! আর শিবু মামা গাড়ীভর্তি অজস্র ফুল দেখতে লাগলেন ! সর্ষে ফুল !
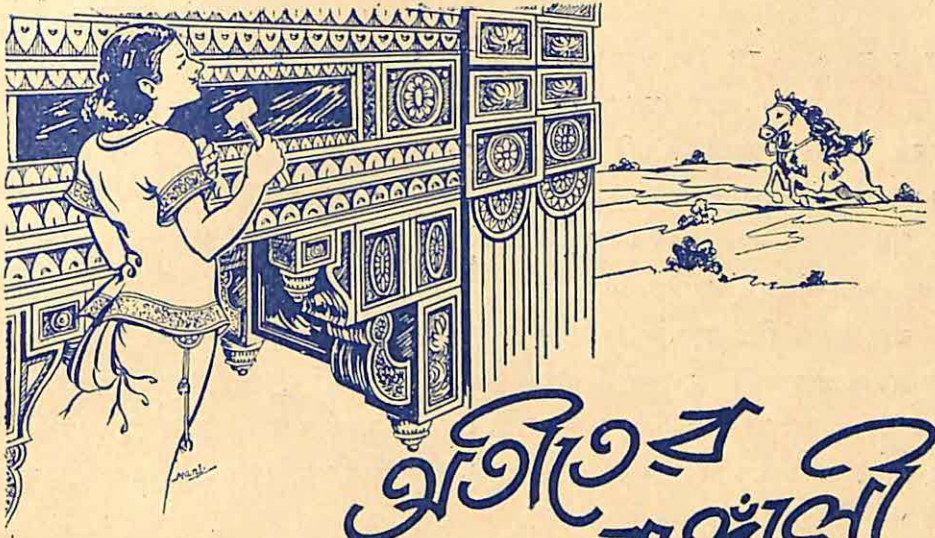
শ্রীঅপূর্ব্বসুন্দর মৈত্র

শিবাদলের সম্মিলিত ঘোষণায় ত্রিযামার দ্বিতীয় পাদ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। রুদ্ধ ঘরে প্রজ্জলিত প্রদীপের সম্মুখে সমাসীন গৌরকান্তি যুবকের পাঠ-তন্ময়তা গেল ভেঙ্গে। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন, নদীর পরপারে বন-শীর্ষরেখার প্রান্ত ছুঁয়ে সপ্তমীর খণ্ড চাঁদ অস্তে নেমেছে। এমন সময় দ্বারে যেন করাঘাত হ'ল।

"কে ?"

"আমি বিক্রমসেন, দ্বার খোল।"—কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় চঞ্চল।

গৌরযুবক ত্রস্তে উঠে দ্বার খুলে দিলেন। দ্রুতপদে প্রবেশ করলেন বিক্রমসেন। শ্যামকান্তি দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ যুবক।

"কি সংবাদ বিক্রমসেন ?…এতো রাত্রে ?"

"সংবাদ অত্যন্ত গুরুতর,—রাজ্যের পক্ষে গুরুতর এবং অশুভ, কিন্তু তোমার পক্ষে শুভ। যদি অতীতের বাসনাকে আজও বিসর্জ্জন দিয়ে না থাক, যদি গৌড়বঙ্গের দুর্দ্দশার অবসান সত্যই চাও, তবে এ-সুযোগ অবহেলা করো না অমাত্য! গৌড়ের রাজদণ্ড অক্ষমের হাত থেকে এইবার তুমি নিজের হাতে তুলে নাও।"

"বিক্রমসেন!…কি বলছ তুমি ?"

"যা বলছি মিথ্যে নয় ভাই! মৌখরিরাজ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৌড়ের অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত। বোধ হয় কাল প্রত্যুষেই তারা আক্রমণ সুরু করবে। বৃদ্ধ শক্তিহীন মহারাজ মহাসেনগুপ্ত

সংবাদ পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। পরাজয় যে নিশ্চিত, এ সকলেই বুঝতে পেরেছে। একমাত্র ভরসা তুমি। তাই তোমাকে মহারাজ এই মুহূর্ত্তে রাজসভায় আহ্বান করেছেন। কিন্তু তুমি যদি নিজের শক্তিতে মৌখরিদের পরাস্ত করতে পার, তবে কেন করবে ঐ অক্ষম গুপ্তরাজের দাসত্ব!…গৌড়ের সিংহাসন তোমাকেই অধিকার করতে হবে শশাঙ্ক!"

"ছি…ছি!…ওকথা বলো না বন্ধু! আমি মহারাজের অমাত্য, তাঁর সেবক।…এমন পাপ চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও অনুচিত।…"

জ্বলে উঠলেন বিক্রমসেন,—"অনুচিত!…কেন অনুচিত? দেশের সমৃদ্ধি এবং জাতির কল্যাণের জন্যেই রাজার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন পূরণে রাজা যদি অক্ষম হন, তবে তাঁর অপসারণই ত ধর্ম্ম। চতুর্দ্দিক থেকে শত্রুদলের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গৌড়বঙ্গ আজ বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠেছে; প্রজাসাধারণ বিপন্ন, ভীত, সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ মহারাজ পরাজয়ের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় প্রজাপালনের দায়িত্ব যদি নিজের হাতে তুলে না নাও……"

"না না, তা হয় না বিক্রমসেন, তা হয় না…" প্রতিবাদ করে উঠলেন শশাঙ্ক—"আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি শত্রুদের দূর করবার চেষ্টা করব, গৌড়বঙ্গকে বিপন্মুক্ত করবার চেষ্টা করব। কিন্তু রাজাকে তাঁর সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে আমি আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে পারব না ভাই, পারব না আমার মনুষ্যত্বের অবমাননা করতে।"

বিক্রমসেন ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন,—"তুমি মহামূর্খ শশাঙ্ক! তোমার কোন আশা কোন দিনই সফল হবে না!"

হেসে উত্তর দিলেন গৌরকান্তি গৌড় যুবক,—"তোমার অভিশাপই সফল হোক বন্ধু! এম্‌নি মূর্খতাই যেন আমার চিরকাল থাকে। চলো, মহারাজের কাছে যাই।"

দ্রুতপদে দুই বন্ধু রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ।

আসমুদ্র-হিমাচল-বিস্তৃত বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র হতে হতে গৌড় ও মগধের সীমাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারেও গুপ্তের আর আধিপত্য নেই। কামরূপের বিস্তৃত অঞ্চলে ভাস্করবর্ম্মার প্রতাপ সুপ্রতিষ্ঠিত। গুপ্তের গৌরব-সূর্য্য চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের অস্তগমনের পর হূন্, তিব্বতী, চালুক্য, কামরূপ ও মৌখরির অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী পুনঃ পুনঃ আঘাতে গুপ্ত-গৌরব ক্রমশঃ ক্ষয় হতে হতে অবলুপ্তির পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। আজ মৌখরির এই অতর্কিত আক্রমণে বুঝি তার গৌড়বঙ্গ-মগধ-বিধৃত শেষ অস্তিত্বটুকুও নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়।…

…কিন্তু সব ভয়, সব আতঙ্কের হ'ল অবসান। শশাঙ্কের বীরত্বে মৌখরিবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিজয়ীর জয়টিকা ললাটে এঁকে সদর্পে শশাঙ্ক রাজধানীতে ফিরে এলেন।…
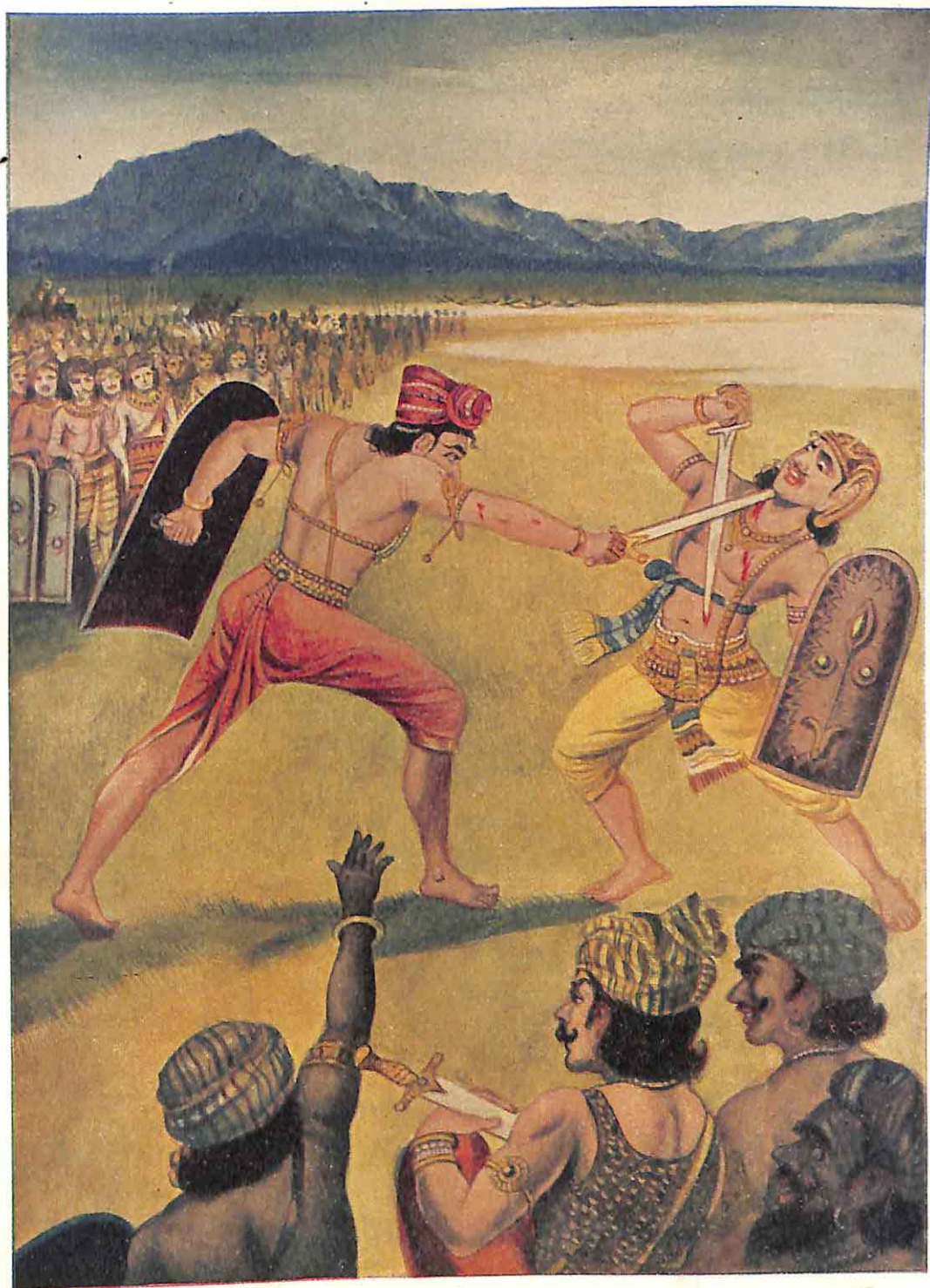
দ্বৈতযুদ্ধে গৌড়াধিপের অসি রাজ্যবর্দ্ধনের প্রতাপের অবসান ঘটাল। [পৃঃ ৫৩

তারপর অমাত্য হলেন মহামাত্য। প্রজাসাধারণ হ'ল নিঃশঙ্ক!...

বৃদ্ধ গুপ্তরাজ একটি নির্ভরযোগ্য অবলম্বন পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।...শশাঙ্কের মনও রাজসেবায় এবং সম্মানে তৃপ্ত ও সুখী হয়ে উঠল। কিন্তু বন্ধুর দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হ'ল না।

বিক্রমসেন শশাঙ্ককে উত্তেজিত করেন,—"দাসত্বই কি তোমার উপজীবিকা হবে? তোমার বাহুতে শক্তি, কপালে রাজতিলকের চিহ্ন! ছি...ছি...কাপুরুষের মতো এ কি তোমার আচরণ!"

দৃঢ়চিত্ত শশাঙ্ক তবু উত্তর দেন,—"শক্তির অপব্যবহার করে অপরের অধিকার থেকে তাকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করায় কোন কৃতিত্ব নেই, আমি তা চাই না।...আমার কপালের রাজতিলক যদি বিধাতার হাতেই অঙ্কিত হয়ে থাকে, তবে মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আমি রাজার আসন অধিকার করব বন্ধু,...অমানুষ হয়ে নয়।"

শশাঙ্কের বিশ্বাস অল্পকালের মধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল। বিক্রমসেনের আকাঙ্ক্ষারও হ'ল নিবৃত্তি।...বোধ করি বিধাতার বিধানেই শেষ গুপ্তরাজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

কাল এগিয়ে যায়। তার অশ্রান্ত গতির সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গিয়ে থামি সেই কালে যখন সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ আর রাজকীয় আয়োজনে গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, উৎকল এবং গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গদ রাজ্য শশাঙ্কের শক্তির সম্মুখে এখন অবনমিত। বঙ্গ এবং মগধও গৌড়াধিপের অধীন। কিন্তু শশাঙ্কের এই শৌর্য্য ও সৌভাগ্যে গৌড়বঙ্গের প্রতিবাসী রাজ্য কামরূপের নরপতি ভাস্করবর্ম্মা ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অতীতে তিনি বঙ্গকে আঘাত করেছেন, লুণ্ঠন করেছেন তার সম্পদ। আজ প্রতাপশালী বঙ্গ অতীতের সেই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে যে ভুলবে না, নিমিষেই তা বুঝতে পেরে ছুটে গেলেন উত্তরাপথের একমাত্র শক্তিমান নরপতি থানেশ্বরাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনের কাছে। রাজ্যবর্দ্ধনও তাঁর পরমাত্মীয় মৌখরির সাম্প্রতিক পরাজয়ে অপমানিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ভাস্করবর্ম্মার মুখে তাঁর সঙ্কল্পের কথা শুনে রাজ্যবর্দ্ধন খুশী হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ বন্ধুত্বের শপথ গ্রহণে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। স্থির হ'ল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিক থেকে যুগপৎ গৌড় আক্রমণ করে শশাঙ্ককে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে। তারপর আক্রমণের পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল।

এমন সময় কান্যকুব্জের দূত এল ঝড়ের মতো। ঝড়ের মতোই সে সংবাদ দিল—মালবরাজ দেবগুপ্তের আক্রমণে কান্যকুব্জের মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মা পরাজিত হয়ে নিহত হয়েছেন, কান্যকুব্জ দেবগুপ্তের অধিকৃত, শশাঙ্ক বিপুল বাহিনী নিয়ে দেবগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। রাণী রাজ্যশ্রী দেবগুপ্তের কারাগারে বন্দিনী।...

নির্ম্মেঘ আকাশ থেকে সহসা যেন বজ্রপাত হ'ল। এতো বড় দুঃসংবাদে, এতো বড় আঘাতে রাজ্যবর্দ্ধন স্তম্ভিত নির্ব্বাক! ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মা নিহত? আদরিণী ভগিনী রাজ্যশ্রী দেবগুপ্তের কারাগারে বন্দিনী? এতো স্পর্দ্ধা ঐ ক্ষুদ্র মালবরাজের এবং তার সহযোগী শশাঙ্কের?...

থানেশ্বরের সমস্ত সৈন্য একদণ্ডের মধ্যে সজ্জিত ও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। সহস্র সহস্র অশ্বখুরে ধুলো উড়িয়ে উল্কার মতো ছুটে চললেন রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জের দিকে—গ্রহবর্ম্মার মৃত্যুর আর ভগিনীর অপমানের প্রত্যুত্তর চাই…রাজ্যশ্রীর বন্ধনমুক্তি চাই…দেবগুপ্তের ছিন্নমুণ্ড চাই… প্রতিশোধ…প্রতিশোধ!…

* * * *

কান্যকুব্জের রাজপুরীতে বন্দিনী বিধবা রাজ্যশ্রী আসন্ন কি এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। গৌড়রাজ শশাঙ্ক দেবগুপ্তকে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত, এ সংবাদ তিনি পেয়েছেন। দুই শত্রুর কবলে পড়ে হয়ত তাঁকে লাঞ্ছনা ও অমর্য্যাদার চরম সীমায় পৌছাতে হবে। পাষণ্ড দেবগুপ্তের বন্ধু শশাঙ্ক হয়ত আরও নিষ্ঠুর নীচাশয় হবে। হয়ত সে… না না, কিছুতেই তা হবে না—বীর প্রভাকরবর্দ্ধনের দুহিতা তিনি—সতী রমণী। প্রাণ দিয়ে মান রক্ষা করে যাবেন—এই তাঁর স্থির সঙ্কল্প ….

বাইরে উল্লসিত সৈন্যের জয়ধ্বনিতে শশাঙ্কের আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হ'ল। চরমমুহূর্ত্ত সন্নিকট জেনে রাজ্যশ্রী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এমন সময় সহসা কারাগারের দ্বার খুলে গেল। দ্বারমুখে রাজ্যশ্রী দেখলেন এক অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি। বন্দিনীর অন্তরের সমস্ত আশঙ্কা—সমস্ত উত্তেজনা সহসা শান্ত হয়ে গেল। অপলক চোখে তিনি শুধু চেয়ে রইলেন সৌম্য সুন্দর শান্ত মূর্ত্তি সেই পুরুষের দিকে। ধীরে ধীরে সুন্দর পুরুষ নিকটে এসে দাঁড়ালেন। করযোড়ে অপরাধীর মতো বললেন,—"আমাদের এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, তবু ক্ষমা চাই মহারাণী!—মোহের বশে দেবগুপ্ত ভুলে গেছে যে নারীর অসম্মান, নারীর লাঞ্ছনা বীরের ধর্ম্ম নয়। আমার সহযোগী বন্ধুর এই কাপুরুষোচিত আচরণে আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছে মহারাণী! ক্ষমা করে আমার সে লজ্জা দূর করুন।"

রাজ্যশ্রী নীরবে শুধু চেয়েই রইলেন।

শশাঙ্ক আবার বললেন,—"অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি প্রস্তুত মহারাণী!...বলুন কি করলে আপনি খুসী হবেন।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কান্যকুব্জের রাণী বললেন,—"খুসীর দিন আমার ফুরিয়ে গেছে রাজা শশাঙ্ক! ক্ষণপূর্ব্বে প্রতিশোধের যে বাসনা হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল, গৌড়াধিপের মহানুভবতার মাধুর্য্যে তাও নিভে গেছে। এ জগতে কাম্য আর আমার কিছুই নেই।"

রাজ্যশ্রীর দুঃখে শশাঙ্ক ব্যথিত হলেন। দুর্ভাগ্যের কারণ স্মরণ করে লজ্জিত চিত্তে নতমুখে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন,—"অতীতের কর্ম্ম যদি বর্ত্তমানের কর্ম্মে পরিশোধিত হ'ত, তবে সেই হ'ত আমার প্রথম কাজ। কিন্তু তা ত হবার নয়। আপনার পথ মুক্ত মহারাণী, বলুন কোথায় আপনি যেতে চান, আমি নিজে নিরাপদে আপনাকে সেইখানে রেখে আসব।"

ধীরে ধীরে বললেন রাজ্যশ্রী,—"আপনার কল্যাণ হোক! গৌড়াধিপের এ কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যেরও প্রতিকার নেই। আপনার সাহায্যে আমার কোন লাভ হবে না। আমার পথ আমার গন্তব্য স্থল আজ আমারই অজ্ঞাত। দেখি কোথায় যেতে পারি। কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি এই অকরুণ পৃথিবীতে।"

মুক্ত কারাকক্ষের দ্বারপথে নির্ব্বাক রাজা শশাঙ্কের ব্যথিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে রাজ্যহারা রাজ্যশ্রী রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় যে গেলেন কেউ তা জানল না, বুঝল না।

* * * *

পরদিন বিপুল বাহিনী নিয়ে ক্ষিপ্ত রাজ্যবর্দ্ধন এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কান্যকুব্জের উপরে। প্রচণ্ড যুদ্ধে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। দেবগুপ্ত হলেন নিহত। তবু একা শশাঙ্কের বিক্রমে থানেশ্বরাধিপতির প্রতিশোধ-কামনা ব্যর্থ হ'ল,—ব্যর্থ হয়ে গেল জয়ের সব আশা, ভেঙ্গে গেল সব গর্ব্ব! দ্বৈতযুদ্ধে গৌড়াধিপের তীক্ষ্ণধার অসি রাজ্যবর্দ্ধনের বক্ষে আমূল বিদ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত স্পর্দ্ধা ও প্রতাপের অবসান ঘটাল।

থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে বয়স্য-পরিবেষ্টিত প্রমোদরত যুবরাজ হর্ষবর্দ্ধনের কাছে নিদারুণ দুঃসংবাদ এল আচম্বিতে। হাস্যকলরোল মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। হর্ষবর্দ্ধনের অন্তরে দুঃখের তীব্র আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধের আগুনও জ্বলে উঠল বিদ্যুতের মতো। ভ্রাতার মৃত্যু এবং ভগিনীর দুর্দ্দশা ও অপমানের মূলে ক্ষুদ্র গৌড়াধিপ শশাঙ্ক! এতো বড় তার স্পর্দ্ধা—এতো তার দুঃসাহস! ..তৎক্ষণাৎ থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করে হর্ষবর্দ্ধন সভাসদ ও পারিষদবর্গের সম্মুখে ক্রোধোদ্দীপ্ত উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা জানালেন,—"যদি চারপক্ষ কালের মধ্যে পৃথিবী গৌড়শূন্য করতে না পারি, তবে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।"

সভায় 'সাধু সাধু' রব উঠল। নবীন উৎসাহে থানেশ্বরের বিপুল বাহিনী সমর-সজ্জা সুরু করল।

প্রভাত সূর্য্যের রাঙা আলো এসে পড়েছে কান্যকুব্জ রাজপুরীর তোরণ-দ্বারে। রক্তালোকে রক্তপ্রস্তর দ্বিগুণ রক্তিম। সেই প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খনন-দণ্ডের আঘাতে খণ্ড খণ্ড আলোর মতোই ঠিকরে পড়ছে চতুর্দ্দিকে। শিল্পীর হাতের খনিত্রে তোরণশীর্ষে শশাঙ্কের বিজয়গাথা ফুটে উঠছে—

"চতুরুদধি-সলিল-বীচিমেখলা দ্বীপগিরিপত্তনবতী বসুন্ধরার অধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্ক।"

সম্মুখের দূরবিস্তৃত প্রান্তরের যে প্রান্তে নবীন সূর্য্য তখনও স্নিগ্ধ হয়ে আছে, সেই দিক থেকে কে একজন অশ্বারোহী অতি দ্রুত রাজপুরীর দিকে ছুটে আসছে। বেগে তোরণের সম্মুখে এসে সে বল্গা আকর্ষণ করে সহসা নেমে গেল।...

দ্বারের রক্ষী প্রশ্ন করল,—"কে তুমি?...কি তোমার প্রয়োজন?"

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পরিশ্রান্ত আগন্তুক ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল,—"মহারাজ কোথায়? কোথায় সেনাপতি বিক্রমসেন? কোথায় তাঁদের দেখা পাব শীঘ্র বল।"

চমকিত গৌড় শিল্পীর হাতের খনিত্র সহসা মাটিতে পড়ে গেল। অশ্বারোহী উর্দ্ধে একবার চেয়ে হতভম্ব প্রহরীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পুরীর মধ্যে উল্কার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * * *

"ভাস্করবর্ম্মা গৌড় আক্রমণ করেছে? কামরূপের ভীরু ভাস্করবর্ম্মা?"

"হ্যাঁ মহারাজ!"

"বিশ্বজিৎ পরাজিত?"

"দুর্ভাগ্য আমাদের।"

"অপদার্থ রাজপ্রতিনিধি।"

"রাজস্থানীয়ের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না মহারাজ! কিন্তু গৌড়ের অধিকাংশ সৈন্যই এখন কান্যকুব্জে, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ভাস্করবর্ম্মার গতি রোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।"

বিক্রমসেন শশাঙ্ক ও দূতের অতি নিকটেই দাঁড়িয়ে আগ্রহে এতক্ষণ তাদের কথোপকথন শুনছিলেন। শঙ্কিতকণ্ঠে সহসা তিনি বলে উঠলেন,—"এতদূর এসে এতো বড় জয়ের পরও কি আমাদের পরাজয় মেনে নিতে হবে? দু'কূল হারিয়ে আমাদের কি দাঁড়াবারও ঠাঁই থাকবে না?"

দৃঢ়কণ্ঠে শশাঙ্ক বললেন,—"নিশ্চয়ই থাকবে। গৌড় আমার চিরজীবনের ঠাঁই। কার সাধ্য সে অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করে? প্রস্তুত হয়ে নাও বিক্রম...অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে এখুনি গৌড়ের দিকে যাত্রা করতে হবে। আর সময় নেই!"

অবিলম্বে অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে শশাঙ্ক গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন। কান্যকুব্জে রেখে গেলেন একজন রাজপ্রতিনিধি ও কিছু সৈন্য। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অল্পশক্তির বাধা টিকল না, কান্যকুব্জ হর্ষবর্দ্ধনের অধিকারভুক্ত হ'ল।

* * * *

এদিকে শশাঙ্কের আগমন সংবাদ পেয়ে ভাস্করবর্ম্মা সভয়ে গৌড় পরিত্যাগ করে কামরূপে ফিরে গেছেন। সুতরাং বিনা পরিশ্রমেই গৌড় বিপন্মুক্ত হ'ল। কিন্তু শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত হবার অবকাশ পেলেন না। কান্যকুব্জ পুনরধিকার করে অল্পদিনের মধ্যেই হর্ষবর্দ্ধন এসে মগধ আক্রমণ করলেন। আবার সাজ সাজ রব উঠল এবং গৌড়বঙ্গের অগণিত প্রজা জন্মভূমির সম্মান ও নিরপত্তা রক্ষার জন্য অসি হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল। বহুকাল ধরে প্রবল যুদ্ধ চলল। কিন্তু উত্তরাপথের রাজচক্রবর্ত্তী প্রবল-প্রতাপ হর্ষবর্দ্ধনের শক্তিও গৌড়ের শক্তিকে বশীভূত করতে পারল না। অবশেষে বহু সৈন্য ক্ষয় করে গৌড়বঙ্গ জয়ের আশা চির-কালের জন্য ছেড়ে ভগ্নচিত্তে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ফিরে গেলেন সুদূর থানেশ্বরে।
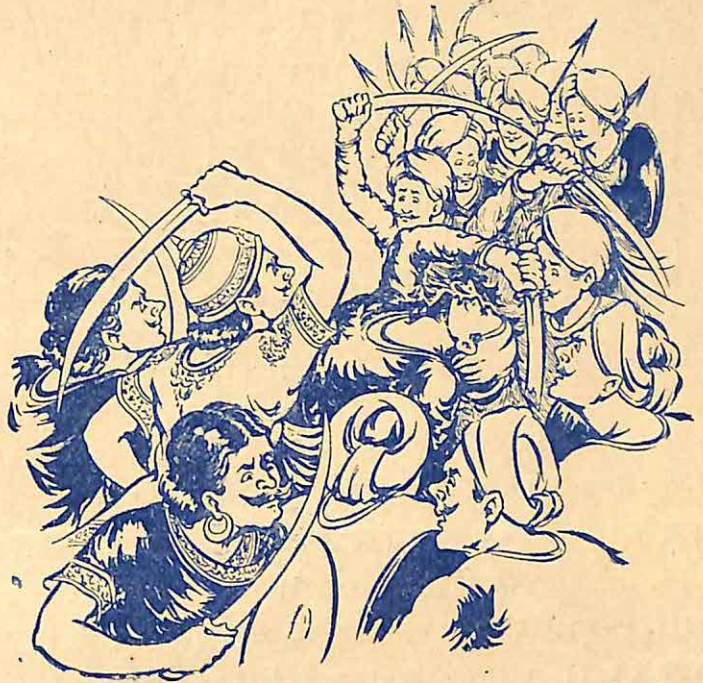
আর বিজয়ী শশাঙ্ক? বিপন্মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে তিনি কি ছুটে গেলেন ভাস্করবর্ম্মাকে শাসন করতে? তিনি কি রাজ্যবিস্তারে ও রাজ্যশাসনে মন দিয়ে গৌড়বঙ্গকে সুখে-সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুললেন? তাঁর মতো বীর মহানুভব নরপতির পক্ষে হয়ত তা সম্ভব হ'ত; হয়ত বাঙ্গলার সীমা বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বহন করে সেই সুদূর ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বঙ্গের সমুদ্রপ্রান্ত থেকে আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমপ্রান্তের বন্ধুর পর্ব্বত পর্যান্ত বিস্তারিত হ'ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য গৌড়ের, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর! বহুকালের সম্মুখ-যুদ্ধে বীর শশাঙ্কের দেহের আর কোন স্থানই অক্ষত ছিল না। যুদ্ধের শেষেও সে ক্ষতের নিরাময় হ'ল না। ক্রমবর্দ্ধমান বিষাক্ত ক্ষতের অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জয়ের অল্পকাল পরেই একদিন তিনি সকল যন্ত্রণার কবল থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পেয়ে চলে গেলেন কোন্ অজানা লোকে। যাবার আগে শুধু প্রাণাধিক বন্ধু বিক্রমসেনকে পাশে ডেকে ক্লিষ্টকণ্ঠে বলে গেলেন,—"আমার মাধব রইল বন্ধু, আর রইলে তুমি। আমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তোমরাই সফল করে তুলো!" কিন্তু শশাঙ্কের সে স্বপ্ন পুত্র মাধব ও বিক্রমসেনের প্রচেষ্টায় আর সফল হ'ল না।

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নানাপ্রকার বিচিত্র জীব-জন্তু-ভরা পৃথিবীর এই বিরাট স্থলভাগ যে কোন কালে জীব-বিবর্জ্জিত ছিল, আমরা সে-ধারণাই ঠিকমত করতে পারি না, নয় কি? অন্ততঃ একথা ভাবতে আমাদের ভাল লাগে না। অথচ জীবনেতিহাসের প্রথমার্দ্ধটা খুঁজে পাওয়া যায় কেবল জলের তলদেশ থেকেই। জীবন-নাট্যের প্রথম যবনিকা যেখানে উত্তোলিত হল, দেখা গেল, সেখানে শুধু কৃষ্ণজলরাশি নেচে চলেছে;—দৃশ্যাভিনয় প্রথম যখন সুরু হল, তখন পৃথিবীর মহাদেশগুলি ছিল শ্যামশ্রী বিবর্জ্জিত ভয়াবহ মরুভূমি মাত্র। পাহাড়ের নগ্নচূড়ায় অথবা নির্জ্জন প্রান্তরে মাঝে মাঝে যেটুকু স্পন্দন পরিলক্ষিত হত, তার মূলে ছিল ঝড় ও বৃষ্টি।

মাটি বলতে আমরা এখন যা বুঝি, গোড়ার দিকে পৃথিবীর প্রাথমিক ভূমি সেরূপ ছিল না। এই আধুনিক মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়েছে উদ্ভিদের আবির্ভাবের পরে—তাদের গঠনমূলক শক্তির প্রভাবে। আজকের মৃত্তিকায় যে শ্যামল শষ্পের কোমল আস্তরণ স্পঞ্জের ন্যায় জল সংরক্ষণের দ্বারা সূর্য্যের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তৎকালীন পৃথিবীতে তার ছিল একান্ত অভাব। বিশাল মহাদেশগুলি তখন শুধু ভীষণ মরুভূমিতেই পর্য্যবসিত ছিল।

সবুজ ঘাসের আবরণ না থাকায় সূর্য্য-কিরণ, ঝড় ও বৃষ্টির রুদ্র প্রভাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূখণ্ডগুলি কিছুকালের মধ্যেই ক্রমশঃ ধ্বসে ভেঙে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রাথমিক মৃত্তিকায় তার কাজ হল অনেকটা পলিমাটির মত। এইভাবে অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় উদ্ভিদের জন্মলাভের সম্ভাবনা ঘটল। পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী পলিমাটি-যুক্ত আর্দ্র ভূমিতে প্রথম অভিযান সুরু হল শেওলা ও ব্যাকটেরিয়ার।

এই যুগের মধ্যভাগ অবধি উদ্ভিদ-জীবন ক্রমোন্নতির যে স্তরে এসে উপনীত হয়েছিল, তার সর্ব্বোচ্চ পরিণতি হল সামুদ্রিক আগাছা। এই কাণ্ডবিহীন পত্র-পল্লবহীন জট-পাকানো ভাসমান জলের আগাছা স্থলে গিয়ে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল কেমন করে? আমরা জানি, জল, নাইট্রোজেন আর কার্ব্বন হল উদ্ভিদের প্রাণশক্তির উপাদান। জলে অবস্থানকালে আশপাশের খাদ্য থেকে এই তিনটি উপাদান যে ভাবে সংগৃহীত হত, এখন স্থলে এসে ঠিক সেইভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই জলের আগাছাকে এখন কার্ব্বন সংগ্রহ আর সেই কার্ব্বনের সদ্ব্যবহারের জন্যে আলো-বাতাসের মধ্যে উঁচুতে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে এবং জল ও নাইট্রোজেন-সমন্বিত খনিজ লবণ সংগ্রহের জন্যে মাটির নীচে শিকড় বিস্তার করতে হয়েছে। পত্র-পল্লব বাতাস থেকে যে কার্ব্বন ডায়োক্সাইড সংগ্রহ করে এবং শিকড় মৃত্তিকা থেকে যে জল ও নাইট্রোজেন শোষণ করে, তাদের পারস্পরিক সংমিশ্রণ ব্যতীত চিনি বা গাছের খাদ্য তৈরী হতে পারে না। গাছের পাতায় যে সবুজ ক্লোরোফিল-টিস্যু থাকে—যার জন্যে পাতার রং সবুজ দেখায়—সেই ক্লোরোফিল-টিস্যুতেই এই সংমিশ্রণ ঘটে থাকে। যেমন শ্বাসনলীর দ্বারা বাইরের নাসারন্ধ্রের সঙ্গে আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ফুস্‌ফুসের যোগাযোগ থাকে, গাছগুলিতেও তেমনি একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম নলী-প্রণালীর দ্বারা পাতা ও শিকড়ের যোগসূত্র বিদ্যমান আছে। ভাসমান জলীয় আগাছাকে নিজের ভার বহন করতে হত না—জলই সে ভার বহন করত। কিন্তু স্থলের গাছকে নিজেকেই নিজের ভার বইতে হয়। তাই ভার-কেন্দ্রের অবস্থিতির জন্যে শক্ত ডাঁটা বা কাণ্ডের উদ্ভব হল; পরে অতিরিক্ত ভার-সাম্যের জন্যে মূল কাণ্ড শাখা-প্রশাখা বিস্তার করল। এ ছাড়া প্রখর সূর্য্য-তাপে যাতে ভূ-নিম্ন-সংগৃহীত জল বাষ্পীভূত হয়ে উবে না যায়, স্থলের গাছকে তারও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল। আমরা যাকে বল্কল বা গাছের ছাল বলে জানি, আসলে তা হল গাছেরই মরা সেলের তৈরী প্রাচীর মাত্র। সূর্য্যের উত্তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যেই এই বহিরাবরণের সৃষ্টি হয়েছে।

জলীয় উদ্ভিদের বংশরক্ষা বা বংশবৃদ্ধি অতি সহজভাবে হয়ে থাকে। তাদের নগ্ন প্রজনন-সেলগুলি যখনই প্রক্ষিপ্ত হয়, তখনই তাদের সংগঠনের কাজ সুরু হয়ে যায়। স্থল-উদ্ভিদের বীজ-সেলগুলি কিন্তু এইরকম নগ্ন অবস্থায় প্রক্ষিপ্ত হলে জলাভাবে সহজেই মারা পড়ত। তাই যাতে জল ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে, সেজন্যে স্থল-গাছের প্রজনন-সেলগুলি ক্রমে ক্রমে চার স্তরে উন্নীত হয়ে পরিশেষে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথমে রেণু, পরে বীজ, তারপরে পরাগ-কেশর এবং সবশেষে ফুল—এই চারটি পর্য্যায়ে উন্নীত হয়ে প্রজনন-সেলগুলি যখন শুষ্ক ভূমিতেও কার্য্যকরী হয়েছে, তখন দেখতে পাই স্থল-উদ্ভিদের এই রকম পূর্ণতা লাভ করতে অতিবাহিত হয়ে গেছে পুরো পঁচিশ কোটী বছর।

মানব-সভ্যতার ন্যায় এই উদ্ভিদ্-জীবন ধীরে ধীরে তার সীমা বিস্তার করেছে। জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থেকে জয়ী হবার জন্যে জলের উদ্ভিদ্ স্থলে এসে সূর্য্যতেজকে কাজে লাগিয়েছে। এর ফলে

পৃথিবী হয়ে উঠেছে অপরূপ শ্রীমণ্ডিতা—মরু-সদৃশ প্রান্তর হেসে উঠেছে শ্যামলিমায়। এই উদ্ভিদই প্রথমে জলচর প্রাণীর স্থলাভিযানের বিজয়-তোরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আবার স্থলচর জীবের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মানুষের ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা সূচিত হয়ে গেছে।

জগতে যা কিছু নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হয়েছে, তার মূলে আছে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয়তা এবং পরোক্ষভাবে বৈচিত্র্য-প্রিয়তা বা নূতনের মোহ। ঠিক এই কারণেই জলের জীব স্থলচরে পরিণত হতে পেরেছে।

আমরা জানি, প্রাণী দু'রকমের—মেরুদণ্ডী (অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড আছে—যেমন: মাছ, ব্যাঙ্, সাপ, পাখী, মানুষ প্রভৃতি), আর অমেরুদণ্ডী (অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড নেই—যেমন: জেলী মাছ, কেঁচো, চিংড়ী, আরশুলা, শামুক প্রভৃতি)।

স্থল-উদ্ভিদের আবির্ভাবের পর প্রথমে কয়েক প্রকার নিম্নতর অমেরুদণ্ডী ক্রাস্টেসিয়া (চিংড়ী জাতীয় প্রাণী) সমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে ডাঙায় এসে বাস করতে থাকে। তারপর কীটপতঙ্গ এবং কয়েক প্রকার মোলাস্কা (শামুক জাতীয় প্রাণী) জল ছেড়ে স্থলে গিয়ে উদ্ভিদের মধ্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সেইখানেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এইসব নিম্নতর সামুদ্রিক প্রাণী থেকে কিন্তু মেরুদণ্ডী স্থলচর জীবের অভ্যুত্থান হয়নি। স্থলচর জীবের যে বিবর্তনের ফলে আজ মানুষের বিকাশ হয়েছে, তা অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক জীব কোথা থেকে কেমন করে পাবে?

পরিবর্তন ব্যতীত বিবর্তন অসম্ভব। আদি-অন্তহীন সমুদ্রের বিরাটত্বের তুলনায় এর আভ্যন্তরীণ অবস্থার যদি কিছু পরিবর্তন হয়েও থাকে, তা হলেও সে পরিবর্তনকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারি। বলতে গেলে সামুদ্রিক জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবহমান কাল একই ভাবে আছে। তাই তাদের মধ্যে এই বিরাট বিবর্তনের অঙ্কুর নিহিত থাকবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

কবে, কোথা থেকে, কেন এবং কেমন করে উচ্চতর স্থল-জীবের—যার মধ্যে ভবিষ্যৎ মানব-বংশের সম্ভাবনা সংগুপ্ত ছিল, তার—আবির্ভাব হল তাই এবার বলছি।

পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থায় সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশি ব্যতীত স্বাদু বা মিষ্ট জল কোথাও ছিল না। পরে প্রবালদলের গঠনীশক্তির প্রভাবে পরবর্তী যুগে অনেক লাগুন বা উপহ্রদের সৃষ্টি হয়। এই প্রবালবলয়-বেষ্টিত অগভীর লবণাক্ত জলাশয়গুলি ইতস্ততঃ ভাবে কয়েকটি স্বল্পপরিসর প্রণালীর দ্বারা মূল সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। পরে প্রায় দশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে এই উপহ্রদগুলি এক-একটি বিরাট মিষ্টজল-বিশিষ্ট হ্রদে পরিণত হয়।

হ্রদ-তল এবং হ্রদ-পার্শ্বের মৃত্তিকার সঙ্গে সাগর-তলের মৃত্তিকার পার্থক্য অনেক। সাগর-তলের মৃত্তিকা যেখানে নীল চূণা-পাথর, হ্রদ-তলের মৃত্তিকা সেখানে লোহিত বালু-প্রস্তর।

সে যুগে ভূমিকম্প প্রায় লেগেই থাকত। ফলে জমি কোথাও বা জল থেকে উঁচুতে উঠে পড়ত, আবার কোথাও বা জলের নীচে অবলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর তখন নব-জাগরণ।

এ যুগটা হল time of elevation বা উত্থানের কাল। এইভাবে বিরাট হ্রদগুলি ক্রমে ক্রমে ছোট জলাশয়ে রূপান্তরিত হল।

পৃথিবীর নব-বিপর্য্যয়ের মুখে লবণাক্ত সাগরের যে সব প্রাণী স্বাদুজলবিশিষ্ট হ্রদ বা জলাশয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাদের অধিকাংশই নতুন পরিবেশ বা আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে না পেরে, মারা পড়ল অতি অল্পকালের মধ্যেই; আবার কিছু কিছু বা অনেক বাধা-বিপত্তি সহ্য করে ক্রমে ক্রমে মিষ্টজলে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। অধ্যাপক ওয়েষ্টলের মতে এই যুগের প্রথমভাগে এই মিষ্টজলের মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকেই উচ্চতর স্থলচর জীবের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

এ যুগে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা রূপান্তরিত হয়েছে বারে বারে। এক একবার প্রখর উত্তাপ ও অনাবৃষ্টির ফলে ছোট ছোট হ্রদ বা জলাশয়গুলি উপযুক্ত অক্সিজেন অভাবে দূষিত হয়ে গেছে বা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে; আবার কিছুকাল পরে সেগুলি অতিবৃষ্টির ফলে ভরে উঠেছে।

প্রত্যেক বার অনাবৃষ্টির নিদারুণ মারাত্মক রুক্ষতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে পৃথিবীর প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী মিষ্টজলের মাছের পক্ষে দুটি বিপরীত পথ উন্মুক্ত ছিল—হয় তারা তাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সমুদ্রে পুনরায় ফিরে যাক, না হয় জল ছেড়ে স্থলে উঠে বসবাস আরম্ভ করুক। অনেকেই প্রথম পথটি বেছে নিলে; আবার কোন কোন মাছ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে সেই জলাশয় আঁকড়েই পড়ে রইল; শুধু ডিপ্‌নোয়ান (ফুস্‌ফুসে মাছ) ও ক্রসোটেরিজিয়ান নামে দু' প্রকার মাছ সাহসে ভর করে দ্বিতীয় অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পথটি অবলম্বন করল।
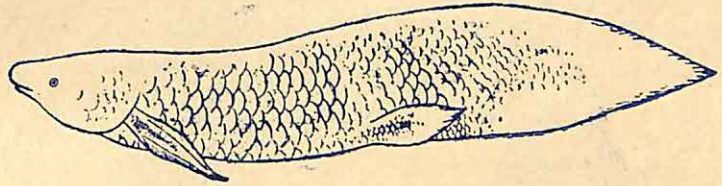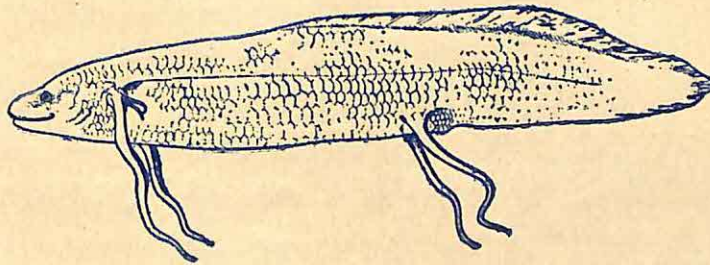
অষ্ট্রেলিয়ার ফুস্‌ফুসে মাছ—নিয়োসেরাটোডাস

জলের মাছের স্থলে এসে বাস করবার জন্যে দেহ-সংগঠনে কি কি প্রাথমিক পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক তা জানতে হবে।

আফ্রিকার ফুস্‌ফুসে মাছ—প্রোটোপ্টেরাস

জলে থাকবার সময় প্রশ্বাসের জন্যে অক্সিজেন সংগৃহীত হয় কান্‌কোর সাহায্যে জল থেকে। স্থলে বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হলে চাই ফুস্‌ফুস্। এইখানে বলে রাখি, মাছের air-bludder বা ফুল্‌কাকে কেউ যেন মাছের lung বা ফুস্‌ফুস্ বলে ভুল করো

না। ফুস্‌ফুস্ হল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে দেহাভ্যন্তরস্থিত বায়ুপূর্ণ থলি, আর ফুল্‌কা হল চাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র—যার জন্যে মাছ জলের বিভিন্ন গভীরতায় যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে।

জলের মাছ নির্দ্ধারিত দিকে নির্দ্দিষ্ট গতিপথে অগ্রসর হয় পাখনার সাহায্যে। স্থলে চলা-ফেরার জন্যে চাই হাত-পা। মেরুদণ্ডী স্থলচরের সর্ব্বনিম্ন পর্য্যায়ের প্রাথমিক প্রাণী হল এম্ফিবিয়ান বা ব্যাঙ্‌ জাতীয় উভচর জীব—যারা জল-স্থল উভয় ক্ষেত্রেই বিচরণক্ষম। ডিপ্‌নোয়ান অথবা ক্রসোটেরিজিয়ান কোন্ মাছ থেকে কেমন করে এই এম্ফিবিয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হল সেটাই এবার জানতে হবে।

ডিপ্‌নোয়ান মাছের যে তিনটি genus বা গণ আজও বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে ফুস্‌ফুসের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এরা বেশীর ভাগ সময় ময়লা জল-কাদার মধ্যে অবস্থান করে এবং কান্‌কোর সাহায্যে জল থেকে ও ফুস্‌ফুসের সাহায্যে বাতাস থেকে এই দু' প্রকারেই অক্সিজেন সংগ্রহ করে থাকে। ফুস্‌ফুস্ থাকলেও এদের পার্শ্ব-পাখনাগুলিতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি—এগুলি শুধু জলে অথবা সামান্যভাবে কাদায় চলবার উপযোগী। স্থলচর প্রাণীর হাত-পা যে ভাবে নিজ দেহের ভার বহন করে থাকে, ডিপ্‌নোয়ান মাছের পার্শ্ব-পাখনা সে ভাবে কোন কিছু করবার মত শক্তিশালী ও পরিবর্ত্তিত হয়নি।
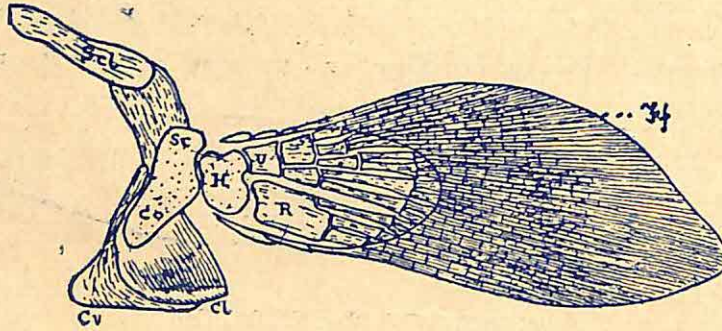
সাউরিপ্‌টেরাস মাছের দক্ষিণ বক্ষ-পাখনা: এম্ফিবিয়ানের বুক ও হাতের অস্থিগুলির সঙ্গে সাউরিপ টেরাসের অস্থিগুলির ভারী সুন্দর সামঞ্জস্য আছে।

তা হলে বোঝা যায়, স্থলাভিযানের মধ্যপথে এসেই ডিপ্‌নোয়ানের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং ক্রসোটেরিজিয়ান মাছেরই কোন প্রাচীন শাখা থেকে উভচর শ্রেণী তথা উচ্চতর স্থলচরের উদ্ভব হয়েছে।

উপরে অধুনালুপ্ত সাউরিপ্‌টেরাস নামে একপ্রকার ক্রসোটেরিজিয়ান মাছের দক্ষিণ বক্ষ-পাখনার অস্থির যে চিত্র প্রদত্ত হয়েছে, তাতে বোঝা যাবে, বিবর্ত্তনের পথে কেমন করে পাখনার ঝালরের ন্যায় অংশটি খসিয়ে ফেলে জলের ক্রসোটেরিজিয়ান স্থলের এম্ফিবিয়ানের ন্যায় তিন বা ততোধিক আঙুল-বিশিষ্ট হাতের রূপান্তর সম্ভাবিত ও সংঘটিত করেছে।

পেন্‌সিলভেনিয়ার শেল-প্রস্তরে (shales) থিনোপাস্ এন্টিকাস্ নামে এক জাতীয় তিন আঙুলবিশিষ্ট এম্ফিবিয়ানের পদ-চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। উভচর স্যালামেণ্ডারের ক্রমবিকাশকালেও এই তিন অঙুলিযুক্ত অঙ্গের আবির্ভাব ঘটে থাকে। এই পদচিহ্ন থেকে এইটেই প্রমাণিত হয় যে, কোন ক্রসোটেরিজিয়ান মাছের বক্ষ-পাখনা ও কোমর-পাখনা দুটি তাদের ঝালর পরিত্যাগ করে

স্থলচর জীবের হস্ত-পদে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রসোটেরিজিয়ানের মধ্যে আবার অষ্টিয়োলেপিড বংশের সঙ্গে আদিম এম্ফিবিয়ানের এত বেশী সামঞ্জস্য আছে যে, এই বংশেরই কোন শাখা বা উপশাখা থেকে মেরুদণ্ডী স্থলচরের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করতে পারি।

জলের জীব এই ভাবে যখন স্থলচরে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সংহতি রেখে চলবার জন্যে তার দেহে ও প্রকৃতিতে যে বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে, ক্রমানুসারে সেগুলির উল্লেখ করছি।

১। বাতাস থেকে অক্সিজেন পাবার জন্যে ফুস্‌ফুসের আবির্ভাব।

২। শ্বাস-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সঞ্চালন-প্রণালীতেও পরিবর্ত্তন সংঘটন।

৩। চলাফেরার বিরাট পরিবর্ত্তন—পাখনার পরিবর্ত্তে হস্তপদের আবির্ভাব।

৪। জলে যে প্রাণী বেশ হাল্কা, জল পরিত্যাগ করলে তাই যথেষ্ট ভারী ঠেকে, কারণ জলজীবের দেহ-ভারের অনেকটা জলই বহন করে থাকে। তাই স্থলে ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যে দৃঢ় অস্থি-পঞ্জরের সৃষ্টি।

ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে স্যালোমেণ্ডারের পিছনের পা

৫। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে 'হিমশয়ন'—প্রতিকূল অবস্থা কালে মাটির নীচে নিশ্চলভাবে অবস্থান।

৬। উত্তাপজনিত বিশোষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আর্দ্রতাকারী চর্ম্ম গ্রাণ্ডের আবির্ভাব।

৭। দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষলাভ।

৮। শুধু মাংসের পরিবর্ত্তে মাংস ও উদ্ভিদ্‌ অথবা কেবলমাত্র উদ্ভিদ্‌ ভোজনের দ্বারা প্রাণ ধারণ।

এইভাবে বহু প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দ্বারা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে অনেক বাধা-বিপত্তির পর মাছ থেকে ব্যাঙজাতীয় মেরুদণ্ডী স্থলচরের আবির্ভাব হয়েছে। পরে ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা কতকগুলি সরীসৃপ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। এই সরীসৃপ আবার ক্রমে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে—একটা শাখা থেকে ক্রমবিকাশ হয়েছে পাখীর এবং আর একটা থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর।

স্থলচর জীবের এই বিচিত্র অভ্যুত্থান জগতের ইতিহাসে এক নব-পর্য্যায়ের সূচনা করেছে।
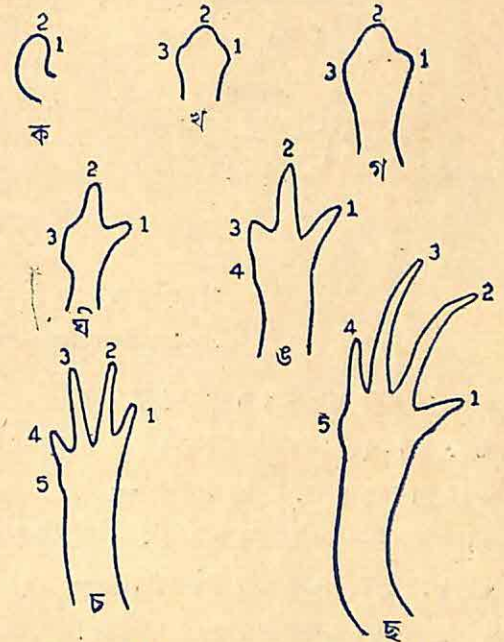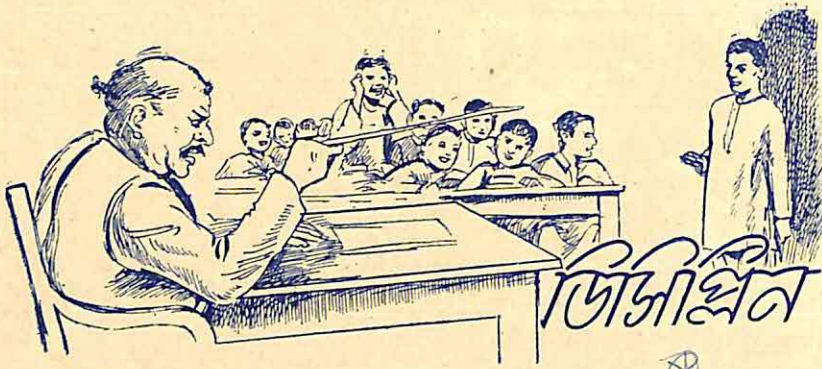
শ্রীআশা দেবী

"ইস্‌কুলে আসছে যে নয়া হেডমাষ্টার,
এক নয়—দুই নয়—গোটা চার পাশ তার।

চুপ চাপ থাক সব—গোলমাল নাস্তি,
শুনলেই ফিস্‌ফাস দেব কড়া শাস্তি!
একদম পিনড্রপ থাকে যেন চারদিক—
অ্যাই অ্যাই—ওখানে কে হাসছে রে ফিক্ ফিক্?
এই ভূতো, কান ধরে থাক্ তুই দাঁড়িয়ে—
দুই বেতে ভূত তোর দেব আমি ছাড়িয়ে।
পেছনের বেঞ্চিতে কারা করে জট্‌লা?
হেঁকে হেঁকে 'ভূ' ধাতুটা বল দেখি পট্‌লা!
থেমে গেলি? ওরে গাধা, হয়নি মুখস্থ?
চলে আয়—তিন চড়ে করে দি দুরস্ত!
পড়া ফাঁকি রোজ রোজ—হতভাগা নচ্ছার—
ঠিক করে দেব সব জুৎসই দিয়ে মার।
একে চোখে কম দেখি—আনিনি কো চশমাও—
তাই বলে দেখছ কি সর্পের পাঁচ পাও?
কান ঠিক আছে খাড়া—আমি হারু শর্ম্মা—
মোর নামে কেঁপে ওঠে গয়া থেকে বর্ম্মা!
কত গাধা ঘোড়া করে দিয়েছি যে পিটিয়ে—
মোর কাছে ফাঁকিজুকি? চলবে না সেটি হে!

এসে আজ যাক দেখে নয়া হেডমাষ্টার—
কতখানি ডিসিপ্লিন আমারি এ ক্লাসটার।

ওটা কে রে ধাড়ী ছেলে—খাড়া আছে দরজায়—
এই খ্যাঁদা, ওরে ভোলা—কান ধরে নিয়ে আয়।
ফের দ্যাখো—স্পর্দ্ধার নেই ওর অন্ত,
ফ্যাক্ ফ্যাক হাসে বুঝি বার করে দন্ত?
থিয়েটার নাকি এটা? দেখছিস্ দাঁড়িয়ে?
বেত মেরে আজ তোর বিষ দেব ঝাড়িয়ে।
চলে আয়—কান ধরে কর তুই উঠ বোস,—
বললি কী? করবি না? করছিস ফোঁস ফোঁস?
নয়া ছেলে? বুড়ো ধাড়ী—নেই তোর লজ্জা?
আজ তোর খাব আমি হাড়-মাস-মজ্জা।
সপাসপ সপাসপ—লাগছে তো মিষ্টি?
যত বেত খাবি তত ছেড়ে যাবে রিষ্টি!"

"ওরে বাবা—গেছি গেছি"—ঘরফাটা চীৎকার:
"ধাড়ী ছেলে নই আমি—নয়া হেডমাষ্টার!"

লাল-পাহাড়

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভারত সীমান্তের শেষ শহর পেশোয়ার। এই শহর থেকে চোখে পড়ে দূরে মালাকান্দ গিরিপথের তিনটি চূড়া। প্রথম পাহাড়ের চূড়াটি কিন্তু অপর দুটির মত নয়। রোদ যত বাড়ে প্রথম পাহাড়ের চূড়াটি তত রক্তাভ হয়ে ওঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কে যেন তার মাথায় একরাশ আবির ঢেলে দেয়। স্থানীয় লোকেরা এই পাহাড়টিকে বলে রাণীগিরি। এই নামকরণের পিছনে একটা ইতিহাস আছে, সেই কথাই বলি :

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এখানে পার্বত্য জাতির এক অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল, মশকাবতী ছিল তার রাজধানী। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন তাঁর বিজয়-বাহিনী নিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি মশকাবতীর রাজার কাছে দূত পাঠালেন। দূত এসে রাজসভায় বললো—দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট সেকেন্দার শাহ পারস্য বিজয় করে আপনার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আপনার সখ্য কামনা করেন, আপনি তাঁর যথাযোগ্য সম্বর্ধনার আয়োজন করুন মহারাজ!

মহারাজের মুখে চিন্তার রেখা পড়লো।

দূত বললো—প্রবল শক্তির সঙ্গে শত্রুতা করে রাজ্য ও জীবন বিপন্ন করা রাজধর্মে দূরদর্শিতার পরিচয় নয় মহারাজ! শক্তিমানের সঙ্গে বন্ধুতা করে রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষা করাই রাজধর্ম। পরাক্রান্ত গ্রীক সম্রাটের বিজয়-বাহিনীর সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি জলস্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত

ভেসে যাবে, সেই কথা চিন্তা করে আপনার মত রাজার পক্ষে দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতা করাই অধিক কাম্য!

—মিত্রতা মানে বশ্যতা?

—না মহারাজ! রাজনীতিতে বলে অবশ্য যে, শক্তিমানের সঙ্গে দুর্বলের সখ্য স্থায়ী হয় না, কিন্তু আমাদের সম্রাট বন্ধুকে বন্ধু বলেই গ্রহণ করেন।

—উত্তম! আজ তুমি অবস্থান কর, কাল তোমাকে আমি অভিমত জ্ঞাপন করবো।

দূতকে বিদায় করে মহারাজ মন্ত্রিমণ্ডলীর মুখের পানে তাকালেন।

বৃদ্ধ মহামাত্য বললেন—ম্লেচ্ছদের আমি বিশ্বাস করি না মহারাজ, সখা বলে সে রাজধানীর মধ্যে একবার প্রবেশ করতে পারলে, পরদিনই দেখবেন আপনাকে বন্দী করে রাজ্য দখল করে বসেছে। এ রাজনীতির একটা অপকৌশল মাত্র। ম্লেচ্ছদের কথায় আস্থা রাখা চলে না মহারাজ!

—তা হলে আপনি কি করতে বলেন মহামাত্য!

—শত্রুর শক্তিসামর্থ্য না জেনে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয় মহারাজ, আপনি গ্রীক সম্রাটের কাছে প্রথমে সখাভাবেই উপস্থিত হোন, কিন্তু নগর মধ্যে গ্রীকদের আহ্বান করবেন না।

শেষ পর্যন্ত মহামাত্যের উপদেশ অনুযায়ীই ইতিকর্তব্য স্থির হোল। পরদিন গ্রীক দূতের সঙ্গে মহামাত্য প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে আলেকজাণ্ডারের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন, বললেন—আমাদের মহারাজ আপনার পরাক্রম অবগত আছেন। আপনার সঙ্গে বিরোধের কোন হেতু আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি আপনার সখ্য কামনা করেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, আমাদের এই মিত্রতা বংশ-পরম্পরায় স্থায়ী হোক!

আলেকজাণ্ডার উপঢৌকনের দ্রব্যসম্ভার দেখে খুশি হলেন।

মহামাত্য বললেন—মহারাজের একান্ত অনুরোধ, আপনি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু আপনার এই বিরাট বাহিনীকে আমাদের ছোট নগরটির মধ্যে স্থান করে দেওয়া সম্ভব নয়; নগরীর উপকণ্ঠে সমতল ভূমিতে আপনি সৈন্য সন্নিবেশ করুন, মহারাজ আপনার সেবা করে ধন্য হবেন।

আলেকজাণ্ডার সৈন্যদের অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন।

মশকাবতীর নগর-প্রাকারের বাইরে সমতল উপত্যকার বুকে গ্রীক সেনার শিবির পড়লো। মহারাজ স্বয়ং এসে আলেকজাণ্ডারকে অভ্যর্থনা জানালেন, বললেন—আপনি পার্ষদদের নিয়ে চলুন, আমার প্রাসাদে আপনি অতিথি।

গ্রীক সম্রাট কিন্তু মহারাজকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সৈন্যদের বাইরে রেখে তিনি নগরে প্রবেশ করতে ভয় পেলেন, বললেন—মুক্ত আকাশতলে থাকলে আমার মনে হয়, ভগবানের প্রত্যক্ষ করুণা-দৃষ্টি আমার উপর আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ছে। হর্ম্যতলে বাস করলে আমি সে আনন্দ পাই না, চারপাশের দেওয়াল ও মাথার উপর ছাদ আমার নিঃশ্বাস যেন চেপে ধরে।

মহারাজ ফিরে গেলেন। মহামাত্য বললেন — দেখলেন মহারাজ, যবন সম্রাট আপনাকে বিশ্বাস করে না, তার এ সখ্য রাজ্যজয়ের একটা কৌশল মাত্র। ওদের নগর মধ্যে স্থান না দিয়ে আমর ভাল কাজই করেছি। তবে সংগ্রামের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করার জন্য যেটুকু হৃদ্যতা বাহিক দেখানো প্রয়োজন, আমরাও সেইটুকুই করবো।
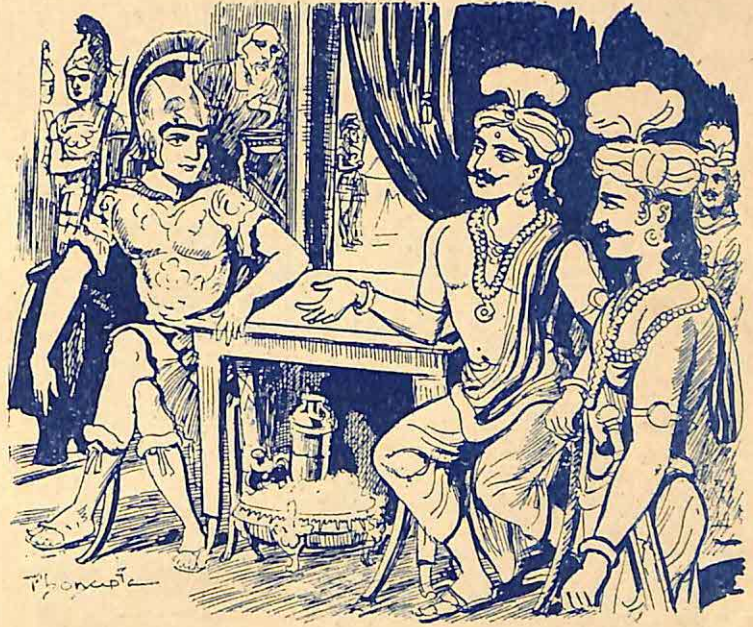
কিন্তু মহামাত্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারলেন না। যুদ্ধ ঘটলো, এবং সেই রাত্রেই একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

রাত্রে গ্রীক শিবিরে সহসা আগুন ধরে গেল। কয়েকজন গ্রীক একটি হরিণের মাংস দগ্ধ করে খাচ্ছিল। কোন এক সময় দমকা হাওয়ায় আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ উঠে বস্ত্রাবাসে আগুন ধরে গেল। পরপর শ্রেণীবদ্ধ তাঁবু। একটি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আশেপাশে আরো কয়েকটিতে আগুনের ছোঁয়াচ লাগলো। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। গ্রীকরা সুরা পানে অভ্যস্ত ছিল, আগুন দেখে কয়েকজন সুরামত্ত গ্রীক সেনা সাড়া তুললো—শত্রুরা আক্রমণ করেছে! এ শত্রু-পক্ষের কাজ!

তখনই সম্রাটের কাছে লোক ছুটে এলো, সংবাদ দিল—নগরীর মধ্য থেকে অগ্নিমুখী তীর বর্ষণ করে শত্রুরা আমাদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে!

আলেকজাণ্ডার সংবাদের সত্যতা নির্ণয় করলেন না, ক্রোধে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো, আদেশ দিলেন—নগর আক্রমণ কর! এই মুহূর্তেই!

গ্রীক বাহিনী মশকাবতী আক্রমণ করলো।

কিন্তু গভীর পরিখা আর উচ্চ প্রাকার পার হয়ে নগর আক্রমণ করা সহজ হোল না। গ্রীক সেনারা চারপাশ থেকে মাটি এনে ও গাছ কেটে পরিখা পূর্ণ করতে সুরু করলো। তারপর সেই পথে পাঁচীলের পাশে এসে বড় বড় মই লাগালো প্রাকারের উপর ওঠার জন্য।

মহারাজ এতো শীঘ্র এভাবে আক্রান্ত হবার আশা করেন নি। নগরে বিশ হাজার রক্ষী সেনা ছিল, তাই নিয়েই তিনি গ্রীকদের প্রতিরোধ করলেন। গ্রীক সেনা যতবার মই বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করে, ততবারই ব্যর্থ হয়। আলেকজাণ্ডার নিজে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন, শেষ অবধি তিনি আর সইতে পারলেন না, তিনি নিজেই একটা মই বেয়ে বরাবর উপরে উঠে গেলেন। কিন্তু তখনই একটি তীরের আঘাতে একেবারে ঘুরে পড়লেন সিঁড়ির উপরে। গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছিলেন, সৈন্যরা তাঁকে ধরলো। আঘাত তেমন

গুরুতর হয় নি, তীরটা বার করে ফেলে, আলেকজাণ্ডার আবার সৈন্য চালনায় মন দিলেন।

এবার নগর-পরিখার কয়েক জায়গায় মাটি পূর্ণ করা হোল। প্রাকারের কয়েক জায়গা একসঙ্গে গ্রীকেরা আক্রমণ করলো। মাত্র বিশ হাজার সেনা নিয়ে অতগুলো আক্রমণ একসঙ্গে আর কতক্ষণ প্রতিরোধ করা যায়! শেষ পর্যন্ত রাত্রির চতুর্থ প্রহরে মহারাজ দুর্গ-প্রাকারের উপর নিহত হলেন। গ্রীকরা কিন্তু তখনও প্রাকারের উপর উঠতে পারেনি।

মহারাজের মৃত্যু-সংবাদে সৈনিকেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। সহসা অশ্বপৃষ্ঠে রাণী কৃপাদেবী আবির্ভূত হলেন, বললেন—যবনেরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওদের ন্যায়-নীতি বলে কিছু নেই। ওদের দাসত্ব করার চেয়ে মৃত্যুও বরণীয়। আমরা মরবো তবু পরাজয় মানবো না!

রাণী কৃপাদেবীর নেতৃত্বে ন'দিন ধরে তুমুল সংগ্রাম চললো। সৈন্যসংখ্যা কম ছিল, সেইজন্য নগরের যুবক ও যুবতীরা প্রত্যেকে সংগ্রামে যোগ দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন তরুণ কি তরুণী জীবিত রইল, ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চললো। আলেকজাণ্ডার অনেক যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। গ্রীক বাহিনী যখন নগরে প্রবেশ করলো তখন রাণী কৃপাদেবী নিহত হয়েছেন, নগরের একজনও যুবক বা যুবতী বেঁচে নেই। গ্রীকরা প্রতি গৃহ লুঠ করলো, সমস্ত বৃদ্ধ ও বালক-বালিকাকে বন্দী করলো।

রাজপুত্রের বয়স তখন চৌদ্দ বছর। তিনি সংগ্রামে যোগ দেননি, বন্দী হবার ভয়ে প্রাকারের পাশে একটি গাছের উপর উঠে আত্মগোপন করলেন। রাজপুত্র সারাটি দিন গাছের উপরেই কাটালেন। রাত্রিতে যখন বিজয়ী গ্রীকদল মদ্যপান করে জয়ের উল্লাসে মত্ত, তখন কোন এক সময় শেষরাত্রের দিকে গাছের ডাল ধরে প্রাকারের উপর লাফিয়ে পড়লেন, তারপর প্রাকারের অপর দিকে পরিখা সাঁতরে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে পিতা ও মাতাকে হারিয়ে রাজকুমার কিশোরদেব অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রাণ রক্ষা পেল বটে, কিন্তু মনে তাঁর শান্তি ছিল না। বনের মাঝে উদ্‌ভ্রান্তের মত কয়েকটি দিন কিশোরদেব ঘুরে বেড়ালেন। ঘুরতে ঘুরতে বনমধ্যে একদিন শাম্ব সর্দারের সঙ্গে দেখা। শাম্ব ছিলেন আরণ্যক দলের সর্দার, তাঁর পিতার সামন্ত। সর্দার কুমারকে দেখেই চিনলেন; বললেন—কুমার, আমার কুটীরে চলুন।

কিশোরদেব আশ্রয় পেলেন বটে, কিন্তু শান্তি পেলেন না।

এদিকে আলেকজাণ্ডারের বিজয়-বাহিনী তাদের অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে শাম্ব সর্দারের কাছে উড়ো খবর আসতে লাগলো, গ্রীকদের নৃশংস অনাচারের কথা, পুরুর পরাজয়ের কথা, হস্তীরাজের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। কিশোরদেব শোনেন আর ভাবেন, এর শেষ কোথায়?

সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল—দেখতে দেখতে দুটি বছর কেটে গেল। আলেকজাণ্ডার আবার একদিন ফিরলেন সেই পথে। পিতৃহত্যার মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কিশোরদেব উন্মুখ হয়ে উঠলেন, কিন্তু করার মত কিছু নেই, অসহায় হয়ে মন অশান্ত হয়ে উঠলো আরো বেশী। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এলেন শাম্ব সর্দারের গৃহে, কথায় কথায় বললেন—কুমার, তোমাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। যে শত্রু তোমার দেশের বুকে এতো অত্যাচার করেছে, তাকে যে সহায়তা করেছে, তার রক্তে তোমার পিতামাতার তর্পণ করতে হবে!

—কে সে ?

—মহারাজ হস্তী। যবনরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করে সমগ্র পঞ্চনদকে সে বিদেশী ম্লেচ্ছের হাতে তুলে দিয়েছে ; সেই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ সিন্ধুর পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত রাজ্যের শাসন-অধিকার সে লাভ করেছে, মশক রাজ্যও তার মধ্যে একটি। বিশ্বাসঘাতককে শেষ করে তোমার পিতৃরাজ্য তুমি উদ্ধার কর।

ষোল বছরের বালক উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রশ্ন করলো—আমার সৈন্য নেই, অস্ত্র নেই, টাকা-পয়সা নেই…

—কিছুরই প্রয়োজন নেই। একজন দেশদ্রোহীকে শেষ করার পক্ষে তুমি একাই যথেষ্ট। অবশ্য তুমি যদি ভয় পাও, তা হলে অন্য কথা। তবে হস্তীকে নিহত করার অধিকার তোমারই সর্বাগ্রে, সেইজন্য তোমার কাছেই আমি এসেছি সবার আগে। তুমি যদি মনে করে থাক তুমি একা, তা হলে ভুল করবে। তুমি একা নও, তোমার পিছনে সমস্ত পঞ্চনদের প্রজাবৃন্দের সমর্থন আছে। তারা অত্যাচার সয়েছে, তারা অত্যাচারের প্রতিশোধ চায়।

কিশোরদেবের চোখ দুটি এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন—আমায় আপনি কি করতে বলেন ?

ব্রাহ্মণ বললেন—ওই মশকাবতী তোমাকে আবার গড়ে তুলতে হবে। যে সিংহাসনে তোমার পিতা বসতেন, সেখানে একজন দেশদ্রোহীর স্থান হবে না। সেই দেশদ্রোহীকে শেষ করতে হবে।

সেই দিনই ব্রাহ্মণের হাত ধরে কিশোরদেব বেরিয়ে পড়লেন মশকাবতীর উদ্দেশ্যে।

আলেকজাণ্ডার চলে গেছেন। যাবার সময় মশকরাজ্যের শাসনভার দিয়ে গেছেন মহারাজ হস্তীর উপর। মশকাবতীর রাজপ্রাসাদে মহারাজ হস্তী অবস্থান করছেন। প্রতিদিন তিনি সাড়ম্বরে বার হচ্ছেন নগরীর পরিত্যক্ত গৃহগুলোর সংস্কার স্বচক্ষে দেখতে, নগর-প্রাকারের সংস্কার দেখতে, নগরীর পূর্ব গরিমা ফিরিয়ে আনতে।

সেদিন অপরাহ্ণে মহারাজ হাতীর পিঠে চড়ে ঘুরছেন, পার্ষদরা সঙ্গে আছে। সহসা কোথা থেকে একটি তীক্ষ্ণধার তীর এসে তাঁর বুকে বিঁধলো, মহারাজ হাতীর পিঠেই শুয়ে পড়লেন। রক্ষীরা পথের পার্শ্ববর্তী গৃহগুলো তন্নতন্ন করে সন্ধান করলো, কিন্তু পরিত্যক্ত গৃহে কোন মানুষের সন্ধান পেল না। কিশোরদেব শরনিক্ষেপ করেই সরে পড়েছিলেন।

বিষাক্ত শর, মহারাজ হস্তী অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহত্যাগ করলেন। নগরীর বাইরে বনমধ্যে শাম্ব সর্দারের আরণ্যক বাহিনী অপেক্ষা করছিল, এবার তারা নগর মধ্যে প্রবেশ করলো। হস্তীরাজের পার্ষদদের বন্দী করতে তাদের এতটুকু দেরী হোল না।

ব্রাহ্মণ কিশোরদেবকে বললেন—দেশদ্রোহীর শোণিতে এবার পিতৃতর্পণ কর রাজকুমার, পিতামাতার আত্মাকে আগে শান্ত কর, তারপর সিংহাসন!

নগরের বাইরে একটি পার্বত্য গুহায় গ্রীকরা রাজা ও রাণীকে কবর দিয়েছিল। রাজকুমার সেই গুহা থেকে দেহ দুটি বার করে সৎকার করলেন। মহারাজ হস্তীর শোণিতে তাঁদের চিতায় আহুতি দিলেন।

ব্রাহ্মণ এবার হাসলেন, বললেন—আমি তক্ষশিলার পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ চণকের পুত্র চাণক্য, আমি অনাচার-অত্যাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার জন্য অঙ্গীকার করেছি। কিশোরদেব, তুমিই হলে আমার সেই অঙ্গীকারের প্রথম সাফল্য। হিন্দুস্থানের বুক থেকে অত্যাচারীকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দেব, দেশবাসীকে দেখিয়ে দেব যে কলির ব্রাহ্মণের সেই পূর্ব তেজ এখনও কিছু আছে!

কিশোরদেব মগকাবতীর সিংহাসনে বসলেন।

জনশ্রুতি আছে, ওই পাহাড়ের উপরেই একটি গুহার সামনে কিশোরদেব পিতামাতার সৎকার করেছিলেন, তাঁদের চিতায় হস্তীরাজের শোণিত আহুতি দেবার দিন থেকেই ওই পাহাড়টির রং দিনের আলোয় অমনি লাল দেখায়। আগে নাকি ওটি অমন ছিল না। আড়াই হাজার বছরের পুরানো জনশ্রুতি মিশে আছে ওই লাল রংটির সঙ্গে।

অর্ঘ্য

—শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

মাটির বুকে উঠলো ফুটি
শরৎ-আলোর কনক কমল,
কাশের সারে ভিড় জমাল
আকাশ-পারের শ্বেত শতদল;
কে এলো রে এই বনে
ফুলের মেলায় সংগোপনে—
আলতো-ছুঁয়ে যায় চরণ ফেলে,
শীতল নিঠোল সুবাস ঢেলে!

স্বর্গলোকের ভ্রমস্থুর
সপ্ত রঙের ঝারি
ছড়ানো তার উদয়-পথের
দিগন্ত বিথারি;
নয়নে তার শরৎ সাঁঝের মায়া,
বক্ষে তাহার বজ্র দহন বহ্নি,
অনুপম রূপে মোহন মধুর কায়া—
জগজন তারে বিস্ময়ে মানে ধন্যি!

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

রুগ্ন মানুষ কিংবা রুগ্ন পশুপাখীর দেহ থেকে রোগ অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ে, এটাই সকলে জানে। কিন্তু সুস্থ মানুষ রোগভোগের পর কিংবা রোগে না ভুগেও অন্য মানুষের দেহে রোগের বীজ ছড়িয়ে দেবার কারণ হতে পারে, এটা হলো খুবই আশ্চর্য্যের কথা। এই মানুষদের বলা হয় রোগবীজাণুবাহী।

কলেরা, টাইফয়েড্, ডিপ্থেরিয়া ইত্যাদি রোগের ব্যাপক আক্রমণের জন্যে দায়ী এই রোগবীজাণুবাহী মানুষের দল। এই রোগের বীজাণুরা এই রকমের মানুষের দেহে কোনও অনিষ্ট না করে বেশ নিরীহভাবে বেঁচে থাকে; কিন্তু রোগ বিস্তারের উপযুক্ত স্থান, কাল, পাত্র পেলে বীজাণুবাহীদের শরীর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়াবহ মহামারী সৃষ্টি করে।

আমেরিকায় একটি মেয়ে এরকম ভাবে টাইফয়েড্ রোগ ছড়িয়ে মহা অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। তার নাম মেরী, কিন্তু টাইফয়েড্ রোগের সঙ্গে তার সম্বন্ধের জন্যে তার নামকরণ হয়েছিল টাইফয়েড্ মেরী। আজও এই রোগের ইতিহাসে মেরীর নাম অমর হয়ে রয়েছে।

মেরীর কাজ ছিল লোকের বাড়ী রান্না করা। সে কোনও দিন টাইফয়েডে ভুগেছিল কি না তা সে স্বীকার করেনি; তবে যেখানেই সে রান্না করতো, সেখানেই তার রান্না খেয়ে বহু লোক টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

যখন মেরীর সঙ্গে এই রোগের সম্বন্ধ ধরা পড়লো, তখন মেরীর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর—

অতি সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মহিলা, বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশ প্রখর; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ সংসারে তার আপনার জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই নির্ব্বান্ধব মহিলা নিজের অজ্ঞাতে যাবজ্জীবন এই সাংঘাতিক রোগ ছড়িয়ে বেড়িয়েছে।

বহু জায়গায় মেরীর রান্না খেয়ে টাইফয়েড্ রোগের আবির্ভাবের পর, পুলিসের সাহায্যে মেরীকে ধরে এনে হাসপাতালে তার পরীক্ষা চললো। দেখা গেল, তার মলের সঙ্গে অসংখ্য টাইফয়েড্ রোগের বীজাণু প্রতিদিন বেরিয়ে আসছে।

হাসপাতালে নানা প্রকার চিকিৎসা করে ডাক্তারেরা হার মানলেন, কিছুতেই মেরীর শরীর থেকে তারা এই রোগবীজাণু তাড়াতে পারলেন না। টাইফয়েড্ বীজাণুরা মেরীর কোনও অনিষ্ট করে না, কিন্তু তাকে উপলক্ষ্য করে অন্য লোককে আক্রমণ করে,—এ যেন এক মজার ব্যাপার!

অন্য কোনও উপায় না পেয়ে ডাক্তারেরা ঠিক করলেন, মেরীর পেট কেটে তার পিত্তের থলিটি বাদ দিয়ে দেবেন; কারণ, তাদের ধারণা মেরীর পিত্তের থলিতেই টাইফয়েড্ বীজাণু বাসা বেঁধে তাদের বংশ বৃদ্ধি করছে। আর এই সব যমদূতের বাচ্চারা মলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে মহামারীর সৃষ্টি করছে।

এই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থায় মেরীকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তার চমৎকার স্বাস্থ্য, তার জ্ঞান হবার পর থেকে সে কোনও রোগে ভোগেনি, সে কেন মিছামিছি এই সাংঘাতিক চিকিৎসায় রাজী হবে?

একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে তিন বছর বাদে ডাক্তারেরা মেরীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলেন। তবে তাকে সাবধান করে দেওয়া হলো, সে যেন আর রান্নার কাজ না করে।

মেরী ওস্তাদ রাঁধুনী, সে রান্না ছেড়ে অন্য কাজ করবে কেন? সে অন্য সহরে গিয়ে নাম ভাড়িয়ে আবার রান্নার কাজে লেগে গেল, তার চিরসাথী রোগও সঙ্গে সঙ্গে তার নূতন মনিবের বাড়ীতে দেখা দিল।

এরকম ভাবে কয়েক বাড়ীতে পালিয়ে বেড়াবার পর মেরী আবার ধরা পড়লো। এখন তাকে নিয়ে কি করা হবে, সেটা একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। বিনাদোষে কারুকে আটকে রাখা যায় না, এরকম আইন কোনও দেশে থাকতে পারে না। অনেক করে বুঝিয়ে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে মেরীকে আদর-যত্ন করে এক দ্বীপে নিয়ে রাখা হলো।

সেই দ্বীপে তেইশ বছর এই অদ্ভুত বন্দী জীবন কাটিয়ে অতি বৃদ্ধ বয়সে নিমোনিয়া রোগে মেরীর মৃত্যু হলো।

মেরীর মত এরকম আরও কত বীজাণুবাহী নর-নারী হয়তো আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে রোগের বীজ ছড়াচ্ছে, তাদের খবর কে জানে?

শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা

শ্রীইন্দিরা দেবী

এক ছিল ভুঁড়ো শেয়াল।

শেয়াল যেমন ধূর্ত্ত হয়—তেমনি চালাকও হয় জান তো ? এই যে ভুঁড়ো শেয়াল—এ প্রায় বুড়ো হয়ে এসেছে, ছেলেমেয়ে আর গিন্নী নিয়ে গ্রামের এক কিনারায় বাস করতো। সন্ধ্যাবেলা হলেই তার বাসার দিক থেকে 'হুক্কাহুয়া' 'হুক্কাহুয়া' এই শব্দ—ছোট বড় সব কণ্ঠ মিলিয়ে একেবারে তোমাদের ভাষায় যাকে বলে 'সমবেত কণ্ঠে' তাই—শোনা যেতো।

ভুঁড়ো শেয়াল এখনই না হয় বুড়া হয়ে এসেছে—কিন্তু এককালে তো জোয়ান ছিল। সেদিনের কথা ভাবলে এখন শিয়ালের চোখে জল আসে। সে সব কি সুখের দিনই না গেছে। দল বেঁধে খাবার সংগ্রহে যাওয়া—কত মাঠ বন পর্ব্বত পার হয়ে নদী ডিঙ্গিয়ে যেতে হতো—তারপর গায়ে কি শক্তিই না ছিল—মনে হতো পাহাড় পর্ব্বতও গুঁড়ো করে ফেলতে পারবে। সন্ধ্যা হলে বাড়ী ফিরতে দেরী হলে শেয়ালের মা ঘর-বার করতো,—কি হলো, এখনও কেন আসছে না ? শেয়াল এলে মা তখন বলতো, বাঁচালি বাবা, যা ভাবছিলাম—

—কেন যে ভাবো মা ?...শেয়াল বলতো।

—ভাবি কি সাধে বাবা ! এই শেয়ালপাড়ার উপর কেমন যেন সকলের চোখ, কি করে অনিষ্ট করবে মানুষগুলো কেবল তাই ভাবে।

—তোমার ছেলেকে মারবে এমন শক্তি কারো নেই—দেখে নিও, বলে দিলাম।

এখন শেয়াল ভাবে সে সব কথা। মা মারা গেছে, বাবাও গেছে, এখন সব অন্য রকম হয়ে গেছে। রাতে বাড়ী ফিরতে দেরী হলে কেউ ভাবে না। কেবল শেয়াল-গিন্নী খ্যাঁ-খ্যাঁ করে ওঠে—বলি বুড়ো বয়সে এত ঘোরাঘুরি—বিপদ-আপদ হলে দেখবে কে—বুঝবে কে শুনি একবার ?

শেয়াল বলে—বাড়ীতে থেকেই বা কি করবো ? তোমার বড় বড় ছেলেদের লম্বা লম্বা কথা

আমার শুনতে ভালো লাগে না—আর ছোটগুলো তো অনবরত চ্যাঁ-ভ্যাঁ করেই আছে। যেমন সব শিক্ষা দিচ্ছ, ভালো হবে কোথা থেকে! আমরা অমন বয়স কালে ঐ সব সিনেমার গল্প না শুনে—কত দূরের রাস্তা চলে যেতাম—কী ফুর্তি ছিল আমাদের, কত জিনিস এনেছি, আর এঁরা? এক কানাকড়ি ক্ষমতা নেই, কেবল আড্ডা আর ইয়ারকী! এসব দেখার চেয়ে বাপু—দেরী করে বাসায় ফেরা ভালো—তা যদি মানুষে মারে—বিপদ হয় হোক!

শেয়াল-গিন্নী আরো জোরে গলা ছেড়ে বললে—কী, আমার ছেলেদের নিন্দে? বুড়ো হয়েছ বলে এত বড় কথা! খবরদার বলছি, কোন দিন আর এমন বলবে না।

গিন্নীর চেঁচামেচি শুনে ছোট বড় সব ছেলেমেয়ের দল এসে ঘিরে দাঁড়ালো—কি মা, কি হয়েছে মা?

আবার সেই উচ্চকণ্ঠ—হবে কি? বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে। তোরা নাকি সিনেমার গল্প করিস, আর ছোটগুলো নাকি রাত-দিন চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে—তাই তোদের বাবা বাড়ী আসতে চায় না।

ছেলেমেয়ের দল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, কেউ কেউ মুখ টিপে একটু হাসলোও। তারপর যে যার জায়গায় ছিটকে পড়লো। খানিক পরে দূরের একটা বনের ঝোপ থেকে বড় আর মেজ ছেলের দ্বৈত কণ্ঠ শোনা গেল—'আমি বনফুল গো'—

আর রান্নাঘরে তখন ছোট খুকীর তারস্বর—ক্ষিদে পেয়েছে খেতে দাও!...আর শোবার ঘরে বড় মেয়ে সেজ মেয়েকে বলছে—দেখ সেজো, এইভাবে পা ফেল—এক, দুই, তিন—

বুড়ো শেয়ালের কানে সবই গেল—সে তখন আস্তে আস্তে বাসার বাইরে এসে বসলো।

চাঁদের আলো ফিনকি দিচ্ছে—সারা বন রাস্তা আলোতে ভরে গেছে। শেয়াল ভাবছে, আচ্ছা কি করা যায়? ছেলেমেয়েগুলোর তো কিচ্ছু হলো না—সংসারের কাজে এলো না, শিকার আনতে পারে না, খাবার-দাবার ভালো জোটে না—সংসার তো অচল! আমার এই বুড়ো বয়স—শক্তি তো বেশী থাকে না কাজ করবার, কিন্তু ভালো ভালো খেতে ইচ্ছা যায়! এসব যা ছেলেমেয়ে এমন কি গিন্নী পর্য্যন্ত—এদের কাছে কিছু আশা করা যাবে না। এখন কি করা যায়?

রাত বাড়ছে, ভুঁড়ো শেয়াল বসে বসে ভাবছে……

হঠাৎ মনে হলো, যদি একটা পাঠশালা খোলা যায়?…শেয়াল ভাবছে…আচ্ছা আমি পড়াবো আর ছেলেগুলো যদি গানের ইস্কুল করে—মেয়েগুলো নাচ শেখায়, মন্দ কি? এমনি করে পাঠশালা, গান আর নাচের স্কুল খুলে বসলে, কত নধর নধর জীব-জন্তু আসবে…আঃ কতদিন—বলে শেয়াল জিব দিয়ে মুখটা একবার চেটে নিলে।

সারা রাত ধরে শেয়াল সব বুদ্ধি করে করে ফন্দী এঁটে বসলো।

সকালবেলা প্রাতরাশের আসরে যখন সব্বাই বসে আছে, গিন্নী পরিবেশন করছে, তখন ছোট খুকীটাকে আদর করতে করতে শেয়াল কথাটা পাড়লে।

গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে বললে—যা পেটুক তোমরা, কে ভরসা করে বা ছেলেমেয়েদের পাঠাবে?

—আহা গিন্নি, গোড়া থেকেই ওসব বলো কেন?…কিরে বড় মেজ, গান শেখাতে পারবি না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খু-উ-ব—খু-উ-ব।

—আর তোরা নাচ শেখাতে পারবি না?

মেয়েরা তো লাফিয়ে উঠলো—নিশ্চয় পারবো বাবা! হ্যাঁ বাবা, খুউব ভালো হবে বাবা!

গিন্নী তখন একবার মুখ তুলে দেখলো, আর বললে—ওরই তো সব ছেলেমেয়ে।

যাক্—পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। গানের নাচের স্কুল খোলা হলো—আর পড়ার পাঠশালাও। ছেলেমেয়েরা প্রতিবেশীদের সব বাড়ী খবর দিয়ে এলো। সব জীব-জন্তুর পরিবার সচেতন হয়ে উঠেছে—কর্ত্তা-গিন্নীরা বলছে, এই সব করে ভালোই হলো—ছেলেমেয়েগুলো কিছু শিখবে, না হলে কেবল ঝগড়া আর মারামারি আর চুরি করে খাওয়া। সবগুলো গিয়ে ওখানে ভর্ত্তি হোক।

কাজেই বুঝতে পারছো, শুধু পাঠশালা নয়—নাচ-গানের স্কুলও খুব জম-জমাট হয়ে উঠলো। নাচের ইস্কুলে গেলে দেখবে মেজ আর সেজ মেয়ে ছাত্রীদের নিয়ে বলছে—দেখ, এমনি করে পা ফেল—এক, দুই, তিন…

আবার গানের ক্লাসে গেলে দেখবে বড় আর মেজ ছেলে কি রকম করে গানের সুর তাল লয় বোঝাচ্ছে।

কিন্তু সব চেয়ে মজার হচ্ছে পণ্ডিতের পাঠশালা।

পণ্ডিত যখন থাকেন, তখন পড়ুয়াগুলো 'আম্প-আম্ফ' করে করে খুব চেঁচায়—আসলে কিন্তু তারা গোলমালই বেশী করে। খরগোস-বাচ্চা ছট্টু প্রাণপণে চীৎকার করে বানান মুখস্থ করে—নয়ন নয়ন—য় আর দু' পাশে দন্ত্যে ন—নয়ন।…তারপরেই আবার পাশের পড়ুয়াকে বলে—এই তোর অঙ্ক হয়েছে? এখন তো পণ্ডিত মশায় নেই, আয় একটু কথা বলে নিই। দেখ, দেখ, ওরা স্লেটে পণ্ডিতের ছবি আঁকছে। ভুলো কাকার ছোট মেয়েটা কি যেন এনেছে—চাটছে বসে বসে।

মোটা সোটা বেড়ালছানা তার পেনসিলটা কামড়ে বলে—তুই যাই বলিস ভাই, পণ্ডিত যখন

কাছে ডেকে পড়া জিজ্ঞাসা করে—তখন কেমন করে চেয়ে থাকে দেখেছিস? মনে হয় যেন এক্ষুনি ধরে চট্ করে মুখে ভরে দেবে। বাব্বাঃ! ভীষণ ভয় করে।

ছোট্ট লাফ দিয়ে নিলো একটা তিড়িং করে, বললে—আমারও ভাই ভয় করে! সেদিন কুমীর জ্যাঠার ছোট্ট বাচ্চাটাকে রেখে গেছে, আরো নাকি ক'টা বাচ্চা আছে, রেখে যাবে—লেখা, পড়া, গান, বাজনা শেখাবে! পণ্ডিত পড়ুয়াদের দেখলে কেমন জিব চাটে। আমাদের কোনদিন ক্যাঁক করে ধরে মানুষদের রসগোল্লার মত না মুখে ভরে দেয়!

মোটা ল্যাজটা উঁচু করে চোখ দুটো ঘুরিয়ে বেড়ালছানা বললে—সে রকম দেখলে আমরা চোঁ-চাঁ দৌড় দেবো! বুড়ো পণ্ডিত কি আমাদের সঙ্গে পারবে? নে নে পড় —এখুনি ভুঁড়ি দুলিয়ে নাকের নীচে চশমা ঝুলিয়ে পণ্ডিত আসবে।

দূরে পণ্ডিতের চেহারা দেখা যায়—আর সঙ্গে সঙ্গে সব গোলমাল যায় থেমে।

এই ভাবে স্কুল চলতে লাগলো। কিন্তু নাচ-গানের স্কুল আস্তে আস্তে উন্নতি করতে লাগলো; এমন কি—সন্ধ্যা বেলা যার যার বাসাতে হুক্কাহুয়া ডাক আর বিশেষ শোনা যায় না—তার বদলে গান ও নাচের রেওয়াজের শব্দই ভেসে আসে। মাঝে মাঝে পড়াশুনোর আওয়াজও আসে বৈ কি!

কিন্তু পাঠশালার অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ।

ভুঁড়ো শেয়ালের লোভ তো খুব বেশী, তাই একদিন বাঘা কুকুরের ছোট ছানাটা নিরুদ্দেশ হলো—হাঁসগিন্নীর কোলের মেয়ের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না! হাঁসগিন্নী কেঁদে কেঁদে অস্থির—কে নাকি বলেছে দীঘির পাড়ে ঝোপের ধারে কতকগুলো হাড়গোড় দেখা গেছে।

কুমীর জ্যাঠার সব ছেলেপিলে এখানে আছে—বোর্ডিংএ থাকার মত। কুমীর জ্যেঠা মাঝে মাঝে দেখতে আসে; কিন্তু শেয়াল বলেছে—কাছে গিয়ে রোজ রোজ দেখলে ওদের বাড়ী যাবার জন্ম মন খারাপ হয়। তাই দূর থেকে দেখাবে। তাই যখনই কুমীর জ্যাঠা আসে—জানলা দিয়ে তুলে চট্ করে দেখিয়েই পণ্ডিত কুমীরছানাকে নামিয়ে রেখে দেয়। আসলে শেয়াল পণ্ডিত একটা ছাড়া অপর ছানাগুলোকে সাবাড় করেছিল একটা একটা করে। তাই উল্টেপাল্টে ঐ একটা ছানাকেই
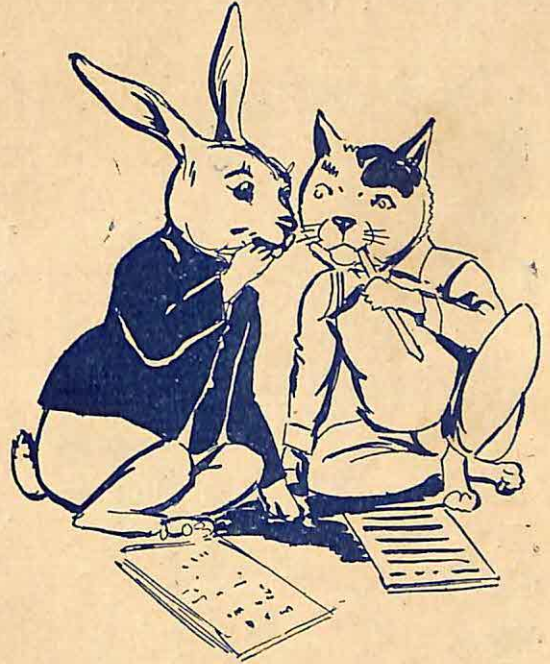
দেখ য়।...কিন্তু একদিন তো সেটাও শেষ হলো, তখন কুমীর জ্যেঠা এলে—ধূর্ত্ত শেয়াল করলো কি—জ্বর হয়েছে বলে কুমীরের সঙ্গে দেখা করলো না। কুমীর ছানাগুলোকে দেখাতে বললে—কিন্তু শেয়ালের ছেলেমেয়েরা দরজা বন্ধ করে সরে পড়লো।

কুমীর জ্যাঠার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল—গিন্নী আবার ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে বলেছিল ; কিন্তু দেখতেই পেলো না! ছেলেপিলেগুলো কতদিন কাছছাড়া হয়ে আছে!

যেতে যেতে কুমীর ভাবছিল—আর বাপু ওসব শিক্ষা করে দরকার নেই। গিন্নী বলছিল বাড়ী নিয়ে যেতে—তাই করবো—পণ্ডিতের জ্বর ভালো হলে সবাইকে নিয়ে যাবো। ভাবতে ভাবতে যখন জলার কাছে পৌঁছেছে তখন একটা বড় গর্ত্তের মুখে বসে কাঁকড়া কর্ত্তা-গিন্নী রোদ পোয়াচ্ছে আর গল্প করছে।

—কিগো জ্যেঠা, চলেছ কোথায়?

কুমীর বললে—এই যে নমস্কার! আর ভাই, মনটা খারাপ হয়ে গেছে, গিন্নী বলেছিল কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে, কিন্তু পণ্ডিত দেখাই করলো না!—বলে বিষণ্ণমুখে কুমীর আরো অনেক কথা বললো।

কাঁকড়া কর্ত্তা দাঁড়া ছড়িয়ে ছিটকে উঠলো—বল কি? তবেই হয়েছে—নিশ্চয়ই তারা আর নেই। আমি অনেক দিন থেকে এমনি সব শুনছি।

কুমীর জ্যেঠা তো মাথায় হাত দিয়ে কেঁদে কেটে অস্থির! কাঁকড়া পরিবার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কি করবে বল ভাই, আগে তো জানি না, তা হলে সাবধান করে দিতাম। যা হবার হয়েছে, কিন্তু ওকে কিছু জব্দ করা দরকার! অ চ্ছা তুমি যাও, আমি ব্যবস্থা করছি।

চোখের জল মুছতে মুছতে কুমীর জ্যেঠা চলে গেল। আহা অতগুলো ছেলেমেয়ে—কাঁদবে না!

এদিকে শেয়াল পণ্ডিতের বড় মেয়ে বললে—বাবা, এমন করে স্কুল চলে না, আজকাল কেউ আসে না—বলে ও প ঠশালে গেলে আর কেউ ফিরবে না।

পণ্ডিত বললে—হু তাই তো ভাবছি, কি করা যায়।

এমন সময় ছোটখুকী গিন্নীর সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে—বাবা, তোমার নেমন্তন আছে। কাঁকড়া মেসো নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে।

শেয়াল বললে—হঠাৎ নেমন্তন—ভালো নয় তো ব্যাপার!

গিন্না বললে—হঠাৎ আবার কি—নেমন্তন, নেমন্তন—তা আবার হঠাৎ কি?

কাঁকড়া পরিবার অভ্যর্থনা জানালে—আরে এসো ভাই এসো—কতকাল আসনি—কি ছাই স্কুল করেছ, সবাই বলে সময় নেই।

ভুঁড়ো শেয়াল বললে—আর ভাই, বলো কেন—একবিন্দুও সময় নেই—নইলে আগে তো আসতাম, কত গল্পসল্প হতো। তা হঠাৎ নেমন্তন কেন?

গিন্নী বললে—কতদিন আসনি, আজ একটু ভালো খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছি তাই।

শেয়াল বড় চালাক; বললে—বাইরেই সব বসি, আর গর্ত্তের ভিতর কেন?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভুলিয়ে ভালিয়ে—শেয়াল পণ্ডিতকে গর্ত্তের ভিতরই নিয়ে গেল।—ওরে বাবা! সেখানে একশো বড় বড় মোটা মোটা দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়—সবাই ঘিরে দাঁড়ালে—কার রক্ষে আছে! এক মুহূর্ত্তেই শেয়াল সব বুঝতে পারলে।

চারদিক থেকে অক্টোপাশের মত কাঁকড়ারা জড়িয়ে ধরলো—পণ্ডিতকে!

কাঁকড়া কর্ত্তা হা হা শব্দে হেসে উঠলো—বুঝলে ধূর্ত্ত শেয়াল! অনেক পার করেছ—অনেকের বাচ্চা ভুলিয়ে এনেছ, এবার আর রক্ষে নেই! মন্দ কাজ করলে তার ফল মন্দই হয়।
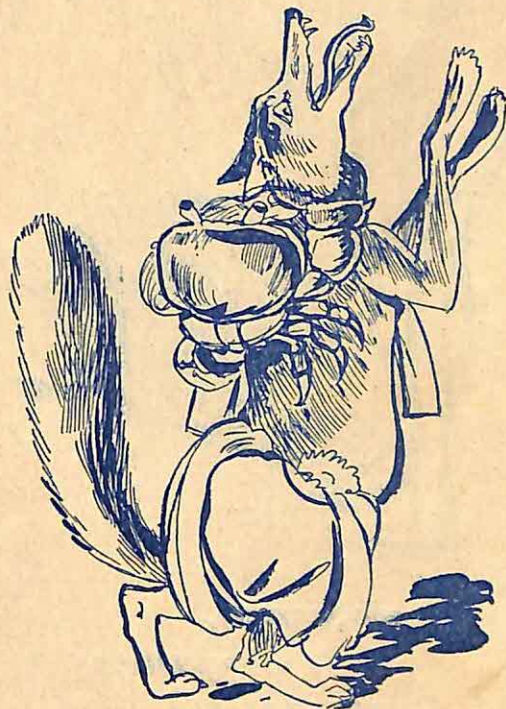
সদানন্দ রাজা

কাদের নওয়াজ

আনন্দ সদা তার তাই সদানন্দ,
তারে স্মরি নাচে মোর কবিতার ছন্দ।
ভক্ত সে, সাধুতায় বড় অনুরক্ত,
শালতরু সম শির উন্নত শক্ত।
'কোগ্রামে' মেলা হবে, খেলা হবে ভালুকের,
ছেলে-মেয়ে নাচে—গলে মালা পরি শালুকের।
জমে গেছে শত লোক সহসা কি হ'ল আজ,
ভালুক ক্ষেপিয়া ছোটে, হাঁকে যেন পশুরাজ।
ধরিতে পারে না কেউ পলাইছে লোকজন,
ভালুকের সাথে কেউ চাহে না যে দিতে রণ।

হরেন, প্রমদা শেঠ,
ভূতনাথ সভয়ে
দেখেন—ভ'লুক ছোটে
পার হয়ে অজয়ে।
সদানন্দের বাড়ী
আজিকে মহোৎসব,
সঙ্কীর্ত্তন গাহে
শত শত বৈষ্ণব।
ভালুক ছুটিয়া গিয়া
পায়ে সদানন্দের
লুটায়ে পড়িল—এ কি!
বিস্ময় সকলের।

ছুটিয়া পলায় লোক
চৌদিকে সন্ত্রাস,
সদানন্দের মুখে শুধু
মৃদু মৃদু হাস।
ক্ষণিক পরেতে এ কি!
অদ্ভুত দৃশ্য!
ভালুক সেজেছে সদা-
নন্দেরি শিষ্য।
তুলসীতলায় গিয়ে
শুয়ে পড়ে সেখানে,
থাবা দিয়ে মাটি খোঁড়ে
কি কারণ কে জানে?

ব্যাপার দেখিয়া সবে
একেবারে বেয়াকুল,
বৈষ্ণব সাধুজনে
পায় না যে ভাবি কূল।
তন্ময় হয়ে গিয়ে
হঠাৎ জাগিয়া কয়
সাধু এক—"ছুটে এস,
আর কিছু নাহি ভয়।"
তুলসীতলায় মাটি
খুঁড়ি দেখে সাধুজন,
পদ্ম গোখুরা এক
করে ভীম গরজন।
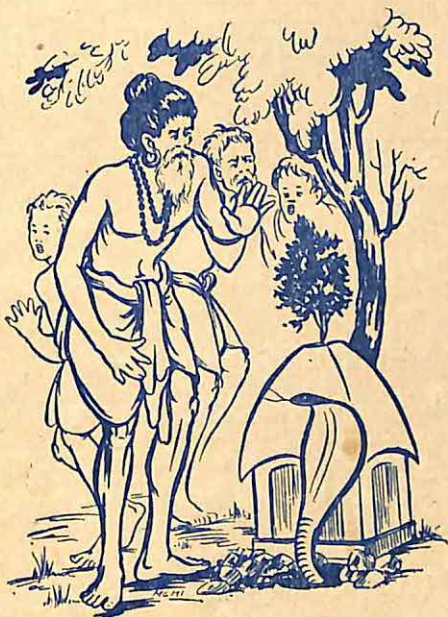
কাছে যেতে নারে কেউ
অবশেষে সাধু কয়—
"সদানন্দেরে ডাকো,
নাই কোন নাই ভয়।"

সদানন্দের সাড়া
পাওয়া গেছে যখনি,
সর্প সরিয়া গেল—
দেখে লোকে তখনি,
চন্দন-মাখানো এক
রয় সেথা 'শালগ্রাম',
এ শিলারে তুলি সাধু
বলে—"তোরা থাম্ থাম্।"
সদানন্দেরি গৃহ
আজি হতে তীর্থ!
শুনা যায় রাতে হেথা
বাঘিনীরা ফিরত
সঙ্কীর্ত্তন গাহি কহে
যত সাধু আজ—
"দাও পদরজ সদা-
নন্দ গো মহারাজ!
তুমি সাধু নিশ্চয়
তপোধন নহে ভুল,
তব গেহে ভারতীর
বিরাজে মরালকুল।
কমলা অচঞ্চলা
চঞ্চলা হেথা নয়,
সে যে তব বধূদের
অঞ্চলে বাঁধা রয়।
তব জয়-গানে হের
মুখরিত দিগ্‌দশ,
পেয়েছ হীরার খনি
নহে নহে হীরাকষ।"

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চীন ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের মধ্যে অবিরত সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদান-প্রদান চলেছিল। কালক্রমে উভয় দেশের এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বসংস্কৃতির মিলনকল্পে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপন করেন, তখন হতে পুনরায় এই দুই দেশের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদানের সূচনা হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীতে চীন-সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য চীন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। স্বর্গীয় অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি (Sylvain Levi) মহোদয়ের উদ্যমে এই কঠিন্ কার্য সম্ভব হয়।

এর পর ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ঙো চঙ-লিম্ (Ngo Chang-Lim), ১৯২৫-২৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক জি. টুচি (G. Tucci) এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক তান য়ুন-সেন (Tun Yun-Shan) এই মহৎ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

অবশেষে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক তান য়ুন-সেনের উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে এক স্বতন্ত্র বিভাগ রূপে ‘চীন ভবন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক তানের অক্লান্ত চেষ্টায় চীন ও সিঙ্গাপুরের চীনেগণের নিকট সংগৃহীত অর্থ সাহায্যে এই বিদ্যায়তন বর্ধিত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাট আকার

ধারণ করে। শান্তিনিকেতনের মধ্যস্থলে বিশ্বভারতীর কণ্ঠহারের মধ্যমণির ন্যায় সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয় বিভাগ হ'ল এই চীন ভবন।

এই চীন ভবনে চীন ভাষার অমূল্য সম্পদ অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত হয়েছে। মৌলিক চীন সাহিত্যের গ্রন্থ গার হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এ অতুলনীয়। চীনদেশেও এরূপ গ্রন্থাগার বর্তমানে দুর্লভ।

চীন ভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চীনদেশ হতে বহু বিশিষ্ট বিদ্বান এই বিদ্যায়তনে এবং এই বিদ্যায়তনের কর্মিগণও চীনদেশে গমনাগমন করছেন। চীনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্মাচার্য মহাত্মা তাই শু (Tai Shu) মহোদয়ের শান্তিনিকেতনে আগমন এবং এখানকার অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের চীন গমন—উভয় দেশের সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টার নিদর্শনরূপে গণ্য হবে।

বর্তমানে অধ্যাপক, গবেষক ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী মিলে দশজন চীনে কর্মী চীন ভবনে কাজ করছেন। এ ছাড়া বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কর্মী এবং ব্রহ্মদেশবাসী বিদ্যার্থীও এখানে বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত আছেন।

চীনেগণ ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয়গণ চীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন। উভয় সংস্কৃতির মিলনসূত্ররূপে বৌদ্ধধর্মই এখানে গবেষণার মুখ্য বিষয়। ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম চীন ও তিব্বতে গিয়ে এক নূতন রূপ গ্রহণ করে। মূলত এক হলেও বিভিন্ন দেশীয় বৌদ্ধধর্মের বৈচিত্র্য চিত্তাকর্ষক। এদের তুলনামূলক গবেষণা আবশ্যক। তা ছাড়া, মহাযান বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ গ্রন্থেরই মূল এখন অপ্রাপ্য। চীন ও তিব্বতী ভাষায় তাদের অনুবাদ আছে। সেই সমস্ত অনূদিত গ্রন্থের অধ্যয়ন এবং কতকগুলির পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। এই সব কাজ চীন ভবনে শুরু হয়েছে। এর জন্য ভারতীয়গণ যেমন চীন ভাষা শিক্ষা করেন, চীনেরাও সেইরূপ সংস্কৃত ও পালি ভাষা অধ্যয়ন করেন; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দি ও বাংলা ভাষাও শিক্ষা করে থাকেন।

কিছুদিন পূর্বে একটি চীনে মহিলা এখান থেকে বাংলা ভাষা শিখে চীনে ফিরে গিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

বর্তমানে এখানকার এক চীনে অধ্যাপকের স্ত্রী শ্রীমতী লো হেং ইয়াং 'রবীন্দ্রবৃত্তি' লাভ করে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি এই ভাষা কতকটা আয়ত্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট', 'শিশু', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', গল্পগুচ্ছের কয়েকটি গল্প এবং শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' তিনি পড়েছেন।

সম্প্রতি তিনি দু-একটি চীনে গল্প বাংলা ভাষায় অনুবাদ করছেন, তার একটি এখানে প্রকাশিত হ'ল। গল্পটি সরস ও কৌতুকপূর্ণ। শ্রীমতীর ভাষাও বেশ সরল ও ঝরঝরে।

ভূত বিক্রি

অনুবাদিকা—শ্রীমতী লো হেং ইয়াং

একটা লোক রাত্রে বেড়াতে গিয়েছিল। তখন পথে লোক খুব কম। হঠাৎ একটা ভূত চোখে পড়লো। ওর কিন্তু কিছু ভয় লাগছিল না। ভূতকে জিজ্ঞেস করলে—"তুমি কে?"

ভূত জবাব দিল—"আমি ভূত। তুমি কে?"

"আমিও ভূত"—ও মিছে কথা বল্লে।

"কোথা যাচ্ছ?"

"শহর যাচ্ছি।"

"আমিও শহর যাচ্ছি।"

তারা একসঙ্গে যেতে লাগলো। যেতে যেতে এক মাইল দূরে এসে ভূত বল্লে—"আমরা কত বোকা! যদি পালা করে একজন আর একজনকে পিঠে করে নিয়ে যাই—তবে খুব ভাল হয়।"

"বেশ! বেশ! তবে তাই হোক"—ও বল্লে।

আগে ভূত ওকে পিঠে নিল। ভূতের সন্দেহ হয়। সে বলে—"কত ভারী তুমি! তুমি কি সত্যি ভূত?"

ও বুঝিয়ে দিলে—"আমি নূতন ভূত, সেইজন্যে ভারী!"

তারপর ও ভূতকে পিঠে নিয়ে দেখে—খুব হালকা। ও ভূতের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারে—ভূতের থুতুকে বড় ভয় লাগে।

একটু পরে তারা একটা জলের স্রোতের নিকট এলো। ভূত আগে পার হলো। কিছু শব্দ হলো না। ও যখন পার হলো, তখন শব্দ শুনে ভূত খুব আশ্চর্য হলো।

ও বল্লে—"তুমি আশ্চর্য হলে কেন? আমি তো বলেছি—আমি নূতন ভূত। জল পার হতে এখনো শিখি নি।"

তারপর দুইজনে আবার চলতে লাগলো। যখন শহরে উপস্থিত হলো—ও ভূতকে তাড়াতাড়ি পিঠে চাপিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। ভূত উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু পালাতে পারলো না। ও রাজপথে এসে ভূতকে নামিয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ ভূত রূপ পরিবর্তন করে ছাগল হলো। ও ভূতের গায়ে থুতু ফেলে দিলে। ভূত আর রূপ পরিবর্তন করতে পারলো না। *

ঐ ছাগল বিক্রি করে, ও কুড়ি টাকা পেয়ে বাড়ী চলে গেল।

* চীনদেশে প্রবাদ আছে—গায়ে থুতু দিলে, ভূত আর রূপ পরিবর্তন করতে পারে না।

ইমনকল্যাণ

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আমার এই কাহিনীকে যাঁরা ভৌতিক বা অলৌকিক বলে ব্যাখ্যা করতে চাইবেন, তাঁদের সঙ্গে আমি কিছুতেই একমত হতে পারব না। সংসারে যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে তাকেই আমাদের অলীক বা অলৌকিক বলে বর্ণনা করতে বাধে না। অবশ্য অনেক জিনিসেরই সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকলেও অনেকে তাদের অলৌকিক বলে ভাবতে ভালবাসেন। তাই যদিও আমার এই বর্তমান কাহিনীর একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে বলেই আমার দৃঢ় ধারণা, তবু অনেকেই হয়ত সে বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন না।

ঘটনাটি গোড়া থেকেই তা'হলে বলি। দামোদর ভ্যালীতে ওভারসিয়ারের কাজ করি। বনে-জঙ্গলে কুলি ও আমীনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জরিপ করাই আমার কাজ। সেবার ঘুরতে ঘুরতে তুম্‌কা অঞ্চলে গিয়ে পড়েছিলাম। বিহারের এদিকটা ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মত নয়। কোথাও কোথাও মাইলের পর মাইল জুড়ে রুক্ষ অনুর্বর জমি, ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না। মাঝে মাঝে বড় বড় খাদ, বর্ষার সময় তারা খরস্রোতা নদীর আকার ধারণ করে।

আবার কোথাও বা বহুদুর-বিস্তৃত শাল-মহুয়ার বন। এ অঞ্চলে বসতিও খুব দুরে দূরে। আমরা যে জায়গাটায় এসে পড়েছিলাম, তার চারদিকে অন্ততঃ পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে কোন জন-বসতির চিহ্ন ছিল না। মাঝে মাঝে বড় বড় শালগাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, তার খানিকটা দূরেই কিন্তু একটি মাত্র ছোট বাড়ী ছিল। এদেশে সাধারণত গ্রাম অঞ্চলের বাড়ী যে রকম হয় সেই রকমই,—মাটির দেওয়াল, উপরে খোলার চালা।

কৌতূহল হ'ল, এমন ভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে কে বাস করছে। আমীন থিয়োডোলাইট আর জরিপের ফিতে নিয়ে কাজে লেগে গেছে। আমি সেই বাড়ীটার দিকে চললাম।

আমার সাড়া পেয়ে একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। বয়স ষাট-সত্তরের কম হবে না। বাড়ীটার চেহারা দেখেও মনে হয় লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। আমাকে একটা মোড়া পেতে দিলে বসবার জন্য। আমার এ অঞ্চলে উপস্থিতির কারণ জানিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন সে একা লোকালয় থেকে এত দূরে পড়ে আছে।
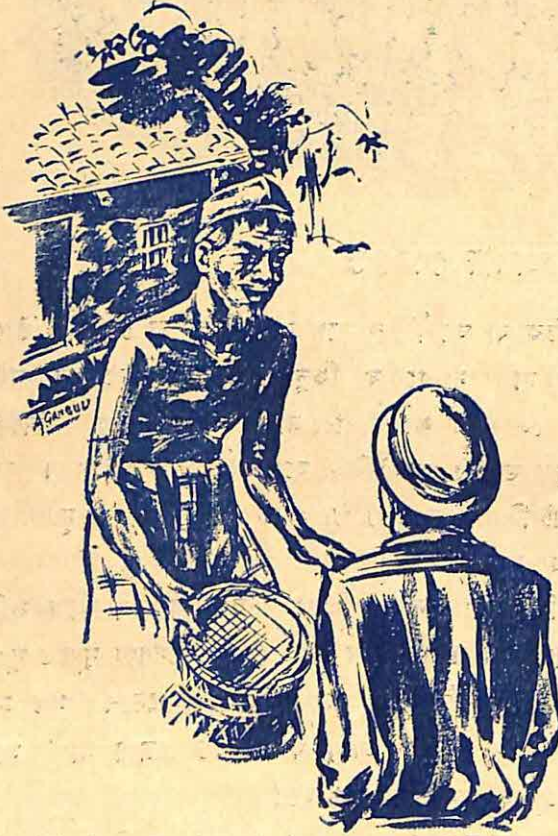
আমার প্রশ্ন শুনে সে একটু হাসল। তারপর আস্তে আস্তেই বলল, 'আমি বুড়ো ফকির, আমার পক্ষে সব জায়গাই তো সমান।'

অনেকক্ষণ নানা রকম আলাপ হ'ল। হঠাৎ বৃদ্ধ আমাকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল। সে বলল, 'বাবুজী, আপনি গান জানেন?'

ছোটবেলা কিছু কিছু গানের চর্চা করেছিলাম। কিন্তু তারপরে সংসারের চাপে পড়ে সে সব শিকেয় তুলে কাজের ধান্দায় বেরুতে হয়েছে। অবশ্য গানের নেশা এখনও আছে। এখনও কোথাও গানের আসর বসলে সুযোগ পেলেই সেখানে গিয়ে বসি। তাই বললাম, 'এককালে চর্চা ছিল, এখন আর ওসব সুযোগ নেই।'

বৃদ্ধ একটুকাল কি যেন ভেবে, আবার বলল, 'বাবুজী, আপনি যখন গান ভালবাসেন, তখন নিশ্চয়ই তানসেনের নাম শুনেছেন?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানালাম।

সে আবার বলল, 'তানসেন ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, সবরকম রাগ-রাগিণীকেই আয়ত্ত করেছিলেন। আকবর শা' একবার তাঁর নাম শুনে তাঁকে সভায় আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। তানসেন এদিকে খুব তেজী ছিলেন, আকবরের লোকদের বলে দিলেন, তিনি যাবেন না। সম্রাটের দরকার থাকে তো তিনি নিজে তাঁর কাছে আসতে পারেন।

'আকবর শা' সব শুনে মনে মনে খুব চটলেন। তানসেনকে শায়েস্তা করবার জন্য নিজেই লোকজন নিয়ে এলেন। তানসেন তখন গান গাইছিলেন। আকবর বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, তিনি তানসেনের কাছে নিজের ব্যবহারের জন্য মাপ চেয়ে বিদায় নিলেন।

'এর কিছুদিন পরে শাহানশা আকবর তাঁকে একটি তানপুরা উপহার দেন। তানপুরাটি খাঁটি অম্বরী কাঠের তৈরী। তানসেন যন্ত্রটি পেয়ে খুব খুশি হলেন।'

হঠাৎ একটা কাশির বেগ আসায় বৃদ্ধ থেমে গেল। কাশির দমকে দমকে তার গলার দু'পাশের শিরা দুটি দড়ির মত ফুলে ফুলে উঠছিল। মিনিট দুই-তিন পরে সে সামলে নিয়ে ফের বলল, 'বাবুজী, সেই তানপুরাটি অনেক হাত ঘুরে ফিরে শেষে আমার হাতে এসে পড়েছে।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। তানসেনের তানপুরা থাকাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু সেটি এখনও আছে এবং দুমকা অঞ্চলের এক নির্জন অরণ্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ ফকির তার বর্তমান অধিকারী, একথা বিশ্বাস করা একটু শক্ত।

বৃদ্ধ বোধ হয় আমার মনের ভাব কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। সে কিছু না বলে উঠে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ঢাকনা দেওয়া একটি জিনিস নিয়ে এল। তারপর ঢাকাটি খুলে তানপুরাটি আমার হাতে দিলে।

সত্যই অপূর্ব জিনিস! ঘন কালো রংএর কাঠের খোল, উপরের দিকটায় হাতীর দাঁতের কাজ করা, তবে আধুনিক তানপুরার চাইতে আকারে কিছু ছোট। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ ধরে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। এবারে একটু মৃদু হেসে বলল, 'বাবুজী, এটি সামান্য জিনিস নয়।'

একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি যখন এককালে গানের চর্চা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই ইমন কল্যাণের কথা শুনেছেন। এটি গভীর রাত্রির সুর। অনেক রাত্রিতে সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন গাছপালারা শুধু জেগে থাকে। তারা নিঃশব্দে নিজেরা নিজেরা কথা বলে। তখন আত্মাদের আহ্বান করতে হয় ইমন কল্যাণের সুরে।

'এই তানপুরাটি মন্ত্রপূত। কেউ যদি গভীর রাত্রিতে বিশুদ্ধ লয়ে ইমন কল্যাণে আলাপ করতে পারে, তা'হলে তানসেনের আত্মা এই তানপুরার মধ্যে জেগে ওঠে এবং এটি তখন ঝম্-ঝম্ করে বাজতে থাকে।

'বাবুজী, আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না। আমি যার কাছ থেকে এটি পেয়েছি তার গানে এটি বেজে উঠেছিল। কিন্তু—' বলে সে হঠাৎ থেমে গেল। কি বলবে তা যেন খানিকক্ষণ স্থির করতে পারছিল না। শেষে অনেকটা জোর করেই যেন দ্বিধাকে দূর করে দিয়ে বলল,

'কিন্তু—এর উপর একটা অভিশাপও আছে। যার স্বরে এই তানপুরা বেজে উঠবে তার অপঘাত মৃত্যু ঘটবে।'

ফকিরের শেষের কথাটি শুনে হাসি পেল। লোকটা হয়ত খুবই গুণী। হয়ত এককালে যথেষ্ট সঙ্গীত-সাধনাও করেছে, কিন্তু কুসংস্কারের হাত এড়াতে পারেনি।

লোকটি আমার হাসি দেখতে পেয়েছিল কিনা জানিনে, কিন্তু হঠাৎ যেন অনেকটা গম্ভীর হয়ে গেল। আমারও বলবার কিছু ছিল না। তার যদি কোন বদ্ধমূল সংস্কার থাকে তো আমার কি বলবার আছে!

বৃদ্ধের মুখের উপর একটি সূক্ষ্ম বিষাদের ছায়া পড়ল, হয়ত আমার হাসিকে উপহাস মনে করে ক্ষুব্ধ হয়েছে। আবার একটা কাশির বেগ এল, কিন্তু এবারে অল্প আয়াসেই সে সামলে নিয়ে বলল, 'বাবুজী, আমার দিন তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তা'ছাড়া এদেশের লোকেরা লেখাপড়া জানে না, গান-বাজনারও বিশেষ ধার ধারে না।'

একটু থেমে অনেকটা অনুনয়ের স্বরে বলল, 'আমার এই অমূল্য জিনিসটি আপনি নেবেন, বাবুজী?'

পরক্ষণেই বৃদ্ধের চোখ দুটি সজল হয়ে এল। সে ধরা গলায় ফের বলল, 'বাবুজী, আপনি ভাববেন না, আমি ভয় পেয়ে আপনাকে দিতে চাইছি, এটি আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয়। কিন্তু আমার কাছে থাকলে এটি নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এর বিপদের কথাও আপনাকে বললাম। এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন।'

সম্ভাব্য বিপদের কথাটা তেমন বড় বলে মনে হ'ল না। এমন একটা অপূর্ব জিনিস হাত-ছাড়া করতে ইচ্ছে হ'ল না। রাজী হয়ে গেলাম।

বৃদ্ধ আর একবার সাবধান করে দিয়ে তার অমূল্য সম্পদটি আমার হাতে তুলে দিল। আমি তানপুরাটি আমার আস্তানায় নিয়ে এলাম।

প্রথম প্রথম কিছুদিন খুব উৎসাহ বোধ করেছিলাম। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রিতে তানপুরাটি সামনে নিয়ে ইমন কল্যাণে আলাপ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটি মৃত্যুর মতই নীরব হয়ে রইল। যত সব গাঁজাখুরি গল্প ভেবে শেষটায় হাল ছেড়ে দিলাম।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে তানপুরাটির কথা প্রায় ভুলেই গেলাম।

এর পরে অনেকদিন কেটে গেছে, অন্তত মাস ছ-সাত তো হবেই। এদিক্‌কার জরিপের কাজ শেষ করে আমাদের সদর ক্যাম্প বরাকরে ফিরে এলাম।

এর কয়েকদিন পরে ওস্তাদ হায়াৎ খাঁ হঠাৎ বরাকরে এলেন, কি একটা জলসা উপলক্ষে। আপনারা জানেন, হায়াৎ খাঁর মত গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ভারতবর্ষে তখন খুব বেশি ছিল না। কখনও গানের রেকর্ড করাননি বলে সাধারণের কাছে তাঁর হয়ত ততটা নাম ছিল না, কিন্তু ওস্তাদ

মহলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করতেন। মেহেরা খাঁ, ওয়ালীউল্লা খাঁ প্রভৃতি নামকরা ওস্তাদেরা তাঁকে যে রকম সম্মান দিতেন, তাতে তাঁকে আমাদের দেশের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ গায়ক বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

সে যাই হোক্, আমাদের ক্যাম্পের কয়েকজন লোক মিলে স্থির করলাম, হায়াৎ খাঁকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তিনিও কি জানি কেন অতি সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

আমাদের ক্যাম্পটা বরাকর শহর থেকে খানিকটা দূরে। এদিকটায় মাঝে মাঝেই ছোট ছোট টিলার মত পাহাড়। কোথাও কোথাও গভীর খাদ। জায়গায় জায়গায় শাল আর শিরীষের গাছ যেন জড়াজড়ি করে আছে।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের গোড়ার দিকের কোন একটা তিথি হবে। চারদিক অন্ধকার। বেশ একটু বেশি রাত্রেই ওস্তাদ তাঁর জনকয়েক সঙ্গী নিয়ে এসে হাজির হলেন। আসর গুছিয়ে গান-বাজনা শুরু করতে রাত প্রায় বারোটা বেজে গেল। ওস্তাদ দরবারী কানাড়ায় সুর ধরলেন, সঙ্গে শুধু তবলা সঙ্গত করতে লাগলেন তাঁরই একজন শাগরেদ।

প্রায় ঘণ্টা দুই একটানা বিশুদ্ধ রাগে আলাপ করে তিনি থামলেন। তিনি থামলেও সুরটা যেন অনেকক্ষণ ধরে তাঁবুর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আপনারা হয়ত জানেন না, যাঁরা প্রকৃত ওস্তাদ, তাঁরা একাদিক্রমে আট-দশ ঘণ্টাও গান গাইতে ক্লান্তি বোধ করেন না।

আর একটা গানের জন্য অনুরোধ করব কি করব না ভাবছিলাম, এমন সময় হায়াৎ খাঁ নিজেই ফের শুরু করলেন—ইমন কল্যাণের আলাপ।

কয়েক মিনিট গান চলবার পরেই মনে হ'ল কোথা থেকে যেন টুংটাং করে মৃদু শব্দ আসছে। আমরা চমকে উঠলাম। ওস্তাদ চোখ বুজে গান গাইছিলেন। মনে হ'ল তিনিও লক্ষ্য করেছেন। ক্রমেই শব্দটা বাড়তে বাড়তে গভীর ঝঙ্কারে পরিণত হ'ল। খাঁ সাহেব হঠাৎ থেমে গিয়ে

একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তানপুরায় সঙ্গত করছে কে ?'

আমার মনটায় হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের ধাক্কা লাগল। সেই তানপুরাটি নয় ত! কিছু না বলে পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। আবার ফিরে এলাম। আবার সেই মৃদু টুংটাং থেকে তারের ঝঙ্কার! এবারে গান চলতে চলতেই উঠে গেলাম।

তানপুরা সত্যই প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে!

খাঁ সাহেব হঠাৎ আবার থেমে গেলেন, তারের স্পন্দনও বন্ধ হয়ে গেল। এঘরে ফিরে এসে ওস্তাদকে সব বললাম। কেমন করে তানপুরাটি আমার হাতে এল, তাও বাদ দিলাম না। তিনি শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'যন্ত্রটা আমাকে একবার দেখাতে পারেন ?'

পাশের ঘর থেকে তানপুরাটি নিয়ে এলাম। খাঁ সাহেব সেটিকে ফরাসের উপর সামনে রেখে সসম্ভ্রমে সেলাম করলেন।

আবার গান শুরু হ'ল। কিন্তু এবারে মাঝে মাঝেই তাল কেটে যেতে লাগল। তানপুরাও দু-একবার টুংটাং করে আবার নীরব হয়ে যায়। গান আর জমল না। বুঝলাম ওস্তাদের মনে একটা অস্থিরতা এসেছে। হঠাৎ তিনি উঠে এসে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবু-সাহেব, আমাকে একটি ভিক্ষা দেবেন ?'

আমি লজ্জিত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি আপনাকে কি দিতে পারি বলুন!'

'পারেন; দুনিয়ার সেরা জিনিস আমাকে দিতে পারেন। এই তানপুরাটি আমাকে দিন্।'

এই বিস্ময়কর তার-যন্ত্রটির উপর আমার নিজেরও হঠাৎ যেন অনেকখানি মমতা এসে গেল। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমার চাইতে এর কাছেই তানপুরাটি অনেক বেশি যত্নে থাকবে। খানিকক্ষণ দোটানায় পড়ে কিছুই যেন স্থির করতে পারছিলাম না। কিন্তু শেষে কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম, স্থির করলাম, যোগ্যপাত্রেই এই মহার্ঘ জিনিসটি অর্পণ করা ভাল। কিন্তু ফকিরের সেই সাবধান বাণী মনে হ'ল। বললাম, 'কিন্তু এর বিপদের কথা ভেবে দেখেছেন ?'

খাঁ সাহেব ক্ষীণ হাসি হাসলেন, 'বিপদ ? বিপদ তো কত রকমেই আসতে পারে!'

এর পরে আর কিছু বলতে পারলাম না, নীরবে তাঁর হাতে তানপুরাটি তুলে দিলাম। তিনি এমন ভাবে সেটিকে আঁকড়ে ধরলেন যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হাতে পেয়েছেন। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'আজ আর এখানে গান জমবে না। আমি একটু বাইরে যেতে চাই। আপনারা শুয়ে পড়ুন গে।'

আমরা আপত্তি করলাম। তাঁর শাগরেদেরাও মৃদু প্রতিবাদ করল। কিন্তু তিনি কারুর

কথা শুনলেন না। বললেন, 'বাইরে নির্জনে বসে আমি কিছুক্ষণ গান গাইব। বাবুসাহেব, আপনি আমার মনের কথাটি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।'

তানপুরাটি হাতে করে তিনি একাকী বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শেষরাত্রে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইমন কল্যাণ রাগে মৃদু গান শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তানপুরার ক্ষীণ হৃৎস্পন্দনও ভেসে আসছিল।

তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা কুলিরা ডেকে তুলে বললে, 'কাল রাত্রে যে ওস্তাদজী গান গাইতে এসেছিলেন, তিনি খাদে পড়ে মারা গেছেন।'

তাড়াতাড়ি ছুটলাম। পঁচিশ ফুট নীচু খাদ। খাঁ সাহেবের মৃতদেহটি নীচে দুটো পাথরের ফাঁকে আটকে আছে। তানপুরাটি তখনও বুকের কাছে আঁকড়ে আছেন, মৃত্যুর সময়ও ছাড়েননি।

আপনাদের কেউ কেউ হয়ত খবরের কাগজে খাঁ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ দেখে থাকবেন।

এর মাসখানেক পরেই আমাকে একবার কলকাতা যেতে হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নামকরা অধ্যাপকের কাছে আমার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটির বিষয় উল্লেখ করেছিলাম। ধ্বনিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার খাসনবীশ সব শুনে বললেন, 'এটা তো সাধারণ শব্দ-তত্ত্বের ব্যাপার। এই জাতীয় অন্যান্য তার-যন্ত্রের মতই তানপুরাটিরও প্রধান অংশ দুটি। একটি তার-সমষ্টি, দ্বিতীয়টি কাঠের খোল। সংসারের প্রত্যেকটি বস্তুই একটা না একটা বিশেষ ধ্বনির সঙ্গে সুর বাঁধা থাকে। সেই সুরটি কাছাকাছি কোথাও বাজলেই তার সঙ্গে সুর-বাঁধা বস্তুটিও স্পন্দিত হতে থাকে। আপনার তানপুরাটির তার এবং খোলটিও ইমন কল্যাণের ধ্বনির সঙ্গে সুর বাঁধা ছিল। তাই ওই সুরে কেউ যদি বিশুদ্ধভাবে আলাপ করতে পারে, তা'হলে তানপুরাটিও বেজে উঠবে। তাই তানপুরাও বেজে উঠেছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু অপঘাত মৃত্যুর ব্যাখ্যা কি হতে পারে?'

'সেটা নেহাৎ কাকতালীয় ব্যাপার। সেদিন রাত্রিটা ছিল অন্ধকার। সম্ভবত খাদের পাশে বসেই গান গাইছিলেন। হয়ত উঠবার সময় কোন রকমে পড়ে গেছেন। হয়ত বা কোন রকম ভয়টয়ও পেয়ে থাকবেন। অনেক কিছুই কারণ হতে পারে।'

আপনারা অনেকেই হয়ত এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু আমি একে সত্য বলেই মেনে নিয়েছি।
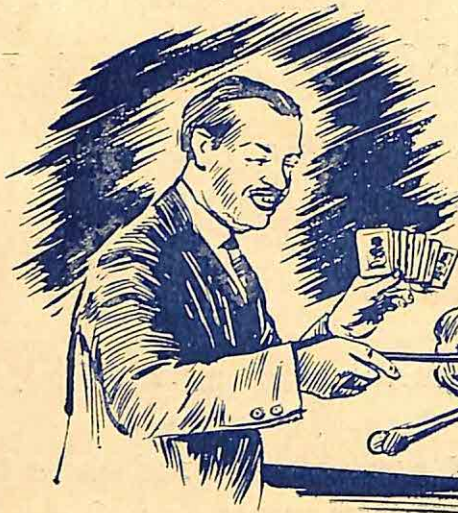
যাদুকর পি. সি. সরকার

দেখিতে দেখিতে আবার একটি বৎসর কাটিয়া গেল। মহাপূজা সমাগত প্রায়। 'বার্ষিক শিশুসাথী'র নূতনতম সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক, চিত্রশিল্পী, প্রকাশক, মুদ্রণবিভাগ প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত। আমারও কর্ত্তব্যের ডাক পড়িয়াছে। শিশুসাথীর পাঠকপাঠিকাদিগকে আমার ম্যাজিকের খেলা উপহার দিতে হইবে। এমন খেলা শিখাইতে হইবে যাহা তাহারা অল্প আয়াসেই শিখিতে পারিবে এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইয়া অবাক করিয়া দিতে পারিবে। কোন প্রকার কঠিন রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা এবং বিরাট যন্ত্রপাতির হুলস্থূল থাকিবে না—সহজ, সরল ও সুন্দর খেলা যাহা অল্পকাল মধ্যেই আয়ত্ত করা যাইবে।

দর্শকদের মনোনীত তাস বাহির করা

দর্শকদের মনোনীত তাস বাহির করার খেলাটি প্রত্যেক যাদুকরই দেখাইয়া থাকেন। তবে যাদুকরের ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি এইটিকে সহজ অথবা কঠিন উপায়ে দেখাইয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইল একমুখী তাস (one way deck) দ্বারা। তাসের প্যাকেটের পিছনে যে ছবি থাকে উহা নানা প্রকার। কোনটি ফুল, কোনটি মানুষের ছবি, বড় বড় নেতার ছবি, কোনটিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি। এইগুলি প্রায়ই one way deck হয়। কিন্তু তাসের পিছনে যদি কেবল মাত্র বর্ডার বা কোন ডিজাইন প্রভৃতি থাকে, উহা two-way deck. প্রদত্ত চিত্র দেখিলে উহা ভালরূপে বুঝা যাইবে। পরপৃষ্ঠায় চারি প্রকার তাসের ছবি দেওয়া হইল। প্রথম চিত্রে তাস চারিটি একদিকে মুখ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম তাসটির পেছনে বরফী কাটা ডিজাইন। দ্বিতীয়টিতে

গোলাপ ফুল, তৃতীয়টিতে একটি সাধারণ তাসের ডিজাইন, চতুর্থটিতে একটি মেম সাহেবের মুখ। এইবার তাসগুলি ঘুরাইয়া দিলে দ্বিতীয় চিত্রের মত হইবে, অর্থাৎ প্রথম তাসটি যেমন ছিল তেমনই ছবি রহিয়াছে, দ্বিতীয় তাসটির গোলাপফুল উল্টা হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ফুলের মুখ নীচের দিকে এবং বোঁটা উপরের দিকে, তৃতীয়টির কোন পরিবর্ত্তন নাই, চতুর্থটির ছবি উল্টাইয়া গিয়াছে
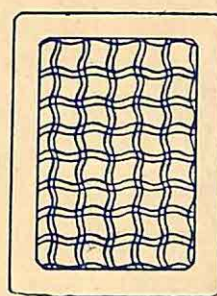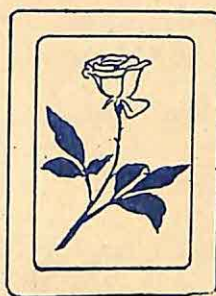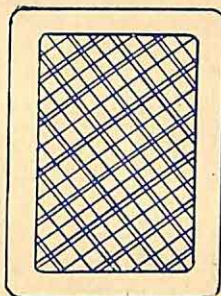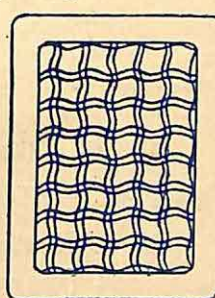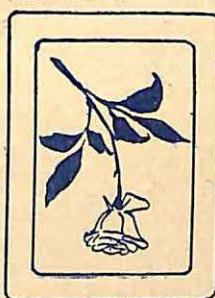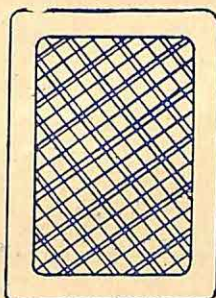
অর্থাৎ মেম সাহেবের মাথা নীচের দিকে হইয়া গিয়াছে। এস্থলে প্রথম ও তৃতীয় তাস দুইমুখো বা two way এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ তাস one way একমুখো। বর্ত্তমান খেলার জন্য ঐ দ্বিতীয় ও চতুর্থ তাস প্রয়োজন, প্রথম ও তৃতীয় প্রকার তাস সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বাজারে Great Moghul, Caravan প্রভৃতি যে সমস্ত তাস প্রচলিত আছে, সেগুলি প্রায় সবই two way, কাজেই অনুপযোগী। কিন্তু আরও বেশী দামের তাসের মধ্যে দেখা যাইবে যে সেগুলি প্রায়ই একমুখো।

ঐরূপ এক প্যাকেট একমুখো তাস লইয়া উহার সবগুলি তাস একদিকে মুখ করিয়া সাজাইয়া লইতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত তাসেরই গোলাপ ফুলের বোঁটার দিক নীচে রাখিয়া এবং ফুলের মাথা উপরের দিক করিয়া সাজাইয়া লইতে হইবে এবং ঐভাবে খুব করিয়া সাফল করিতে হইবে।

তারপর দর্শকদিগকে সেই প্যাকেট হইতে যে কোন একটি তাস টানিয়া লইতে বলা হইল। দর্শকগণ নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন একটি তাস টানিয়া লইলেন। তাঁহারা যখন তাসটি দেখিতে ব্যস্ত, যাদুকর সেই মুহূর্ত্তে নিজের হস্তধৃত প্যাকেটটির মাথা ঘুরাইয়া ধরিলেন এবং দর্শকদিগকে তাঁহাদের মনোনীত তাস ফেরৎ দিতে বলিলেন। এবার মজা এই যে, দর্শকদের তাসটি উল্টা-মুখী হইয়া প্যাকেট মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চলিল। নিম্নে প্রদত্ত চিত্র দুইটি হইতে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

তৃতীয় চিত্র চতুর্থ চিত্র

তৃতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে যে, সবগুলির ফুল একদিকে মুখ করিয়া সাজান আছে এবং দর্শকগণ উহার মধ্য হইতে একটি তাস বাছিয়া লইতেছেন। পরবর্ত্তী (চতুর্থ) চিত্রে দেখান হইয়াছে, যাদুকর ইতিমধ্যে তাঁহার হস্তধৃত তাসগুলি উল্টাইয়া দিয়াছেন এবং ফুলগুলির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তখন দর্শকগণ নিজেদের মনোনীত তাস পুনঃ প্রবিষ্ট করিবার সময় দেখা যাইতেছে যে, সেই তাসের ফুলটির মাথা উপরের দিকে। কাজেই যাদুকরের হাতের তাসে যতবারই এবং যত ভাল করিয়াই মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাক না কেন, উহা কিছুতেই মিশ্রিত হইবে না। যাদুকর এইবার তাসের প্যাকেটের পেছন দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারিবেন, কোন্ তাসটি মনোনীত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, একমাত্র একমুখো তাস দিয়াই এই খেলা করা সম্ভবপর; কিন্তু বাজারে প্রচলিত Great Moghul, Caravan প্রভৃতি জাতীয় দুইমুখো তাস দিয়া খেলা করিতে হইলে, তখন কি করা হইবে। বর্ত্তমান কালের যাদুকর সমাজ এইদিকে চিন্তা করিয়া সেই প্রশ্নেরও সমাধান করিয়াছেন। তাসের প্যাকেট গুছাইয়া লইয়া একধারে পেন্সিল দিয়া একটি সোজা দাগ কাটিয়া লইলেই হইল—প্রত্যেকটি তাসের একদিকে দাগ পড়িল, কাজেই একমুখো তাস হইল। কেহ কেহ কালিকলম লইয়া বসিয়া তাসের ডিজাইনের এক কোণে ছোট

একটি ফোঁটা (dot) দিয়াও মার্কা করিয়া লইয়া থাকেন। তাসের ডিজাইন যদি লাল রংয়ের হয়, তখন লালকালি দিয়া ফোঁটা দিয়া দিলে উহা সহজে সকলের নজরে পড়ে না, অথচ খেলা ঠিক ঠিক মতই হইয়া থাকে।

মায়াবী দিয়াশলাই ও জাতীয় পতাকার খেলা

মায়াবী দিয়াশলাই ও রুমালের খেলাটি খুবই আশ্চর্য্যজনক এবং আমি নিজে প্রায়ই এই খেলাটি দেখাইয়া থাকি। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছি, তখন তাঁহারা ধরিয়া বসিলেন একটি খেলা দেখাইতে হইবে। অনেক অনুরোধের পর রাজী হইলাম। তখন পকেটের মধ্যে হাত দিয়া একটি দিয়াশলাই বাহির করিলাম, তাহার মধ্যে একটি সবুজ রংএর ছোট সিল্কের পাকিস্তানের পতাকা রহিয়াছে। তারপর পকেট খুঁজিতে খুঁজিতে অপর পকেট হইতে আর একটি দিয়াশলাই বাহির করিলাম। এইটির মধ্যে একটি সিল্কের ছোট ভারতবর্ষের পতাকা রহিয়াছে। দর্শকদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, বাম দিকের বাক্সে পাকিস্তান এবং ডান দিকের বাক্সে

পঞ্চম চিত্র

ভারতবর্ষের পতাকা রহিয়াছে। তাঁহারা ঠিকমত মনে রাখিলেন যে, বাম দিকে পাকিস্তান এবং ডানদিকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় পতাকা। যাদুকর এইবার ওয়ান-টু-থ বলিয়া যাদুযষ্টি বাহির করিলেন এবং একবার ডানদিকের দিয়াশলাইর বাক্স, তৎপর বামদিকের দিয়াশলাইর বাক্স স্পর্শ করিলেন। কি আশ্চর্য্য, পাকিস্তানের বাক্সে ভারতীয় পতাকা এবং ভারতীয় বাক্সে পাকিস্তান পতাকা চলিয়া গিয়াছে! যাদুকর তখন বুঝাইয়া বলিলেন, আপনাদের উভয়ই সমান ভাই ভাই, কেহ ছাড়া কেহ নাই। এই বলিয়া পুনরায় যাদুযষ্টি স্পর্শ করিবামাত্র দেখা গেল আবার অদলবদল হইয়া গিয়াছে, পাকিস্তানের বাক্সে পাকিস্তান পতাকা এবং ভারতীয় বাক্সে ভারতীয় পতাকা চলিয়া আসিয়াছে। এই দৃশ্যে জাতীয় ঐক্যের ভাব পরিলক্ষিত হয় বলিয়া সকল দেশের সকল শ্রেণীর দর্শকই বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। ব্যবসায়ী যাদুকরগণ এই খেলাটি ষ্টেজে দেখাইবার সময়

পেছনের পর্দ্দায় দুইটি বড় পতাকা 'হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান' মিলাইয়া রাখিবেন। উহা এই খেলায় অত্যুত্তম background হইবে।

এইবার খেলাটির কৌশল প্রকাশ করা যাইতেছে। দিয়াশলাইর বাক্স দুইটি বিশেষভাবে প্রস্তুত। প্রদত্ত ষষ্ঠ চিত্রে ঐ খেলার খুঁটিনাটি দেখান হইয়াছে—ইহার ক বাক্সে ভারতীয় পতাকা এবং খ বাক্সে পাকিস্তান পতাকা দেখা যাইতেছে। বাক্সগুলি উল্টাইয়া বসাইলেই ক বাক্সে পাকিস্তান পতাকা এবং খ বাক্সে ভারতীয় পতাকা বাহির হইবে। গ চিত্রে দেখান হইয়াছে কি ভাবে আড়াআড়িভাবে ভিতরকার ডালাটি 'পার্টিশন' করা হয়। দিয়াশলাইর কতকগুলি খালি বাক্স লইয়া উহা কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। খুব করিয়া ভিজিয়া গেলে উহার লেবেলগুলি আস্তে আস্তে টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে, এবং সেগুলিকে ব্লটিং পেপার (শোষকাগজে) শুখাইয়া লইতে হইবে। এইবার দুইটি ভাল দিয়াশলাইর খোল লওয়া হইল—উহার মার্কা যেরূপ আছে, জলে ভিজাইয়া উঠান মার্কাগুলি হইতে অনুরূপ মার্কার লেবেল ঐ দিয়াশলাইর পশ্চাতে আঠা দিয়া আঁটিয়া দিতে হইবে। তখন দিয়াশলাইর বাক্সের তলা ও উপর উভয় দিকেই একই ছবি হইল—যেদিক করিয়াই রাখা হউক না কেন, দর্শকগণ উহার পার্থক্য বুঝিয়া উঠিবেন না। ভিতরের ট্রের তলা একদম খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং প্রদত্ত ষষ্ঠ চিত্রের 'গ'এর ন্যায় উহা কোণাকুণি ভাবে (diagonally) আটকাইয়া লইতে হইবে। এইবার ভিতরের 'ট্রে'টি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। উপরের ভাগে হইল এক দেশের পতাকা এবং নীচের ভাগে রহিল অপর দেশের পতাকা। দিয়াশলাই একমুখী করিয়া খুলিলে ভারতীয় পতাকা বাহির হইবে তারপর সেইটি সকলকে দেখাইয়া টেবিলের উপর রাখিবার সময় বাক্সটি উপুড় করিয়া রাখিতে হয়, অর্থাৎ বাক্স উল্টাইয়া গেল; এবার দিয়াশলাইর বাক্স খুলিবামাত্র পাকিস্তান পতাকা বাহির হইবে। বাকি অংশ অতিশয় সহজ, যে কোন বুদ্ধিমান লোক বিনা পরিশ্রমে এই খেলা দেখাইতে পারিবেন। ইচ্ছা করিলে উভয় বাক্সেই ভারতীয় পতাকা এবং পরক্ষণে উভয় বাক্সে পাকিস্তান পতাকা দেখান যাইতে পারে। ইহা দেখিয়া খুব বুদ্ধিমান দর্শকগণও অবাক হইয়া যাইবেন।
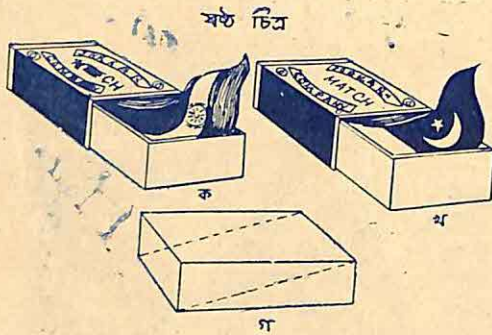
ষষ্ঠ চিত্র

এই খেলার মূল কৌশলই হইল প্রদর্শনভঙ্গী। পরিচ্ছন্নভাবে, বক্তৃতাচ্ছলে পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিতে হইবে এবং বলিতে হইবে—হিন্দুস্থান পাকিস্তান আজকাল সকলের মুখেই এক কথা। সেদিন স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইল, কেহ বা পাকিস্তান পতাকা উত্তোলন করিলেন, কেহ বা ত্রিবর্ণরঞ্জিত অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। কেহ

বলিলেন "জয় হিন্দ,—বন্দে মাতরম্", আবার কেহ বলিলেন "পাকিস্তান জিন্দাবাদ"। কিন্তু আমাদের কাছে কোনই ভেদাভেদ নাই; উহা আমাদের বুঝিবার ভুল—দেখিবার ভুল, Angle of vision ঠিক থাকিলে দেখা যাইবে যাহা হিন্দুস্থান তাহা পাকিস্তান—সকলেই ভাই ভাই—কেহ ছাড়া কেহ নাই। উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি দেখুন। এই আমার পকেটে দিয়াশলাইর বাক্স আছে। এই বাক্সটা আমাদের একটি রাজ্য,—মনে করুন 'পাকিস্তান'। হাসিবেন না, Aesop's Fableএ পড়িয়াছি, ব্যাঙ তাহার ক্ষুদ্র কূপটিকেই মনে করিত একটি সমুদ্র। এইটি আমার কূপ, আমার সমুদ্র, বিরাট পাকিস্তান রাষ্ট্র; এই দেখুন এর মধ্যে—আমি সিল্কের পাকিস্তান পতাকা রাখিয়া দিয়াছি। আরও একটি বাক্স আমার পকেটে আছে সেটি 'ভারত ডমিনিয়ন'। হাসিবেন না, আমার পকেটে এইরূপ দুই-চারটা রাজ্য সর্ব্বদাই থাকে। আমি যাদুকর কিনা ৩৬৪ পকেটওয়ালা, আমার কোট প্যাণ্টালুনে অন্ততঃ ৩৬৪টা ষ্টেট থাকে—মানে থাকা সম্ভবপর। এই যে ভারতবর্ষ পাওয়া গেল, এই দিয়াশলাই আমার ভারতরাজ্য এবং আমি তার মধ্যে ভারতীয় জাতীয় পতাকা পূর্ব্ব হইতেই রাখিয়া দিয়াছি। এইবার লক্ষ্য রাখুন, বাম দিকে রহিল পাকিস্তান আর ডান দিকে হিন্দুস্থান। কিন্তু দেখার ভুল, দেখুন ডান দিকেই পাকিস্তান এবং বাম দিকে হিন্দুস্থান রহিয়াছে। কোন কোন রাজনীতিবিদ মনে করেন, দুইটাই হিন্দুস্থান, দেখুন দুইটিতেই ভারতীয় পতাকা রহিয়াছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন দুই দিকেই পাকিস্তান। ঠিক হায়, এই দেখুন দুই বাক্সেই রহিয়াছে পাকিস্তান জাতীয় পতাকা। কিন্তু আমি জানি সবই দেখার ভুল, দেখুন পাকিস্তানের জায়গায় পাকিস্তান আর ভারতের জায়গায় ভারতীয় পতাকা আছে। ঠিক সেই সময়ে background musicএ "ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান" গানের এই কলিটি গীত হইয়া থাকে এবং দর্শকদের উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনিতে এই খেলা শেষ হয়। আমার পাঠকবর্গ এই খেলাগুলি বাড়ীতে তৈয়ার করিয়া অনায়াসে দেখাইতে পারিবেন।

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। পৃথিবীর অপর কোন দেশের যাদুকরই তাঁহার মত সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীযুক্ত সরকার আমাদের দেশের গৌরব—সমগ্র এশিয়ার গৌরব। শিশুসাথীর পাঠকপাঠিকাদের জন্য তিনি নিয়মিত যাদুবিদ্যার গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তিনি চাহেন, পাঠকপাঠিকাদের মধ্যেও কয়েকজন বড় বড় যাদুকর হইবে, যাহারা একদিন তাঁহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবে। ভবিষ্যতের সেই যাদুকরদের পথ সুপ্রশস্ত করার জন্যই তিনি যাদুবিদ্যাবিষয়ে বই লিখিয়াছেন, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন, এবং ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে বেতার মারফত ম্যাজিক শিখাইয়া দেন। —সম্পাদক

পূজার চিঠি

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ বছরের অম্লু সোনা পড়ে 'শিশুর পড়া';
ঝড়ের বেগে বলতে পারে নানান রকম ছড়া।
লিখতে পারে এক আধটুকু হয় না বানান ঠিক;
হাতের লেখা হিজির বিজির বেঁকে হারায় দিক।
মন্টি তাহার বোনটি ছোট, এক বছরের হবে,
এই ত সেদিন শিখেছে সে হামা দিতে সবে।
আসছে পূজো, বাবামণি লিখেন চিঠি কত—
আসতে লিখেন আত্মীয়দের যেথায় আছেন যত।

অম্লু ভাবে সেই বা কেন লিখবে নাকো চিঠি!
দোয়াত কলম করল জোগাড় এড়িয়ে সবার দিঠি।
কিন্তু চিঠি লিখবে কাকে? নেইক' পরিচয়;
পাশের বাড়ীর 'নন্তুটা' তো দুষ্ট অতিশয়।
বা—রে সে যে ভুলেই গেছে, মন্টি কাছেই আছে,
তার নামেতে লিখবে চিঠি অম্লু নূতন ধাঁচে:

"মন্টি আসিস্ পূজোর দিনে, যাসনে ভুলে ভাই,
খেতে দোব যা খুসি তোর, যতগুলো চাই।
রসমালাই হাতে দোব, পাতে দোব গজা,
আসিস্, দেখিস, পূজোর দিনে কেমন হবে মজা।
জানিস রে ভাই ফটুকেটা রোজ আমায় রাঙায় চোখ;
পূজোর দিনে ঐ ছেলেটার ঠ্যাঙটা খোঁড়া হোক।
আমরা ত ভাই ঘোড়ার মত করব ছুটোছুটি;
ঐ ছেলেটা পারবে না তা···হা···হা···হা···"

হাসির ছোটে অম্লু সোনা টেবিলে তুলে পা,
দোয়াত উল্টে কালি পড়ে ভরল সারা গা।
টেবিল থেকে পা-টা টেনে যেমনি ছাড়ে হাত,
চেয়ার নিয়ে মেঝের পরে পড়ল কুপোকাত।

Monindra Dutta

একটী করুণ কাহিনী

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

বাঙলা তেরোশো সাতান্ন সাল। শ্রাবণ মাস। অপরাহ্ণ।

কোন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম, 'একটি করুণ কাহিনী'। একটি উদ্বাস্তু তরুণ গ্যালিফ ষ্ট্রীটের ট্রামের তলায় পড়ে মরেছে। তার পকেটে পাওয়া গেছে একটি ফাউণ্টেন পেন ও এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়…আপনার বলতে আমার কেউ নাই…পকেটে একটি পেন রইল…তাই বেচে যেন আমার সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।…

কল্পনায় যেন দেখতে পেলাম—নিচে মারহাট্টা ডিচের নীলাভ জল। রাস্তার পাশে ছোট গাছটার ডালে বসে কর্কণ কণ্ঠে ডাকছে একটা কাক। দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে ট্রাম। হঠাৎ তার সামনে পড়ল একটি তরুণ। হৈ-হৈ করে উঠল চারদিকের জনতা—ঘ্যাচাং করে ব্রেক কসে থেমে গেল ট্রাম। ট্রামের তলা থেকে বের করা হল একটি দেহ—ছিন্নভিন্ন—রক্তাক্ত।

শরীর শিউরে উঠল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল।

সামনে টেবিলের উপর ছিল গরম চায়ের কাপ। তার ধোঁয়া উঠছে পাক খেয়ে খেয়ে। আমার মাথার ভিতরটাও যেন তেমনি পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল। সময়ের চাকায় লাগল উল্টো টান। ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলল বিদ্যুৎ গতিতে। কানে এল একটি কিশোর কণ্ঠের ডাক :

: শিগগির খেতে দাও মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

ঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন মা : খাবার তৈরীই আছে। ও ঘরে চল। বলি হ্যাঁরে, তোর পরীক্ষার ফল কি আজ বেরুল ?

অনুতোষ হেসে বলল : বেরিয়েছে মা !

চলতে চলতেই মা থেমে গেলেন। মুখ ফিরিয়ে শুধালেন : কি হল রে ?

তেমনি হাসতে হাসতেই অনুতোষ জবাব দিল : কি আর হবে, আমিই ফার্ষ্ট হয়েছি মা !

মায়ের মুখেও হাসি ফুটে উঠল : ফার্ষ্ট হয়েছিস্ ? যাক্, বাঁচলাম। মা মংগলচণ্ডী মুখ রক্ষা করেছেন।

খেতে বসল অনুতোষ। নারকেলের নাড়ু, আটার রুটি আর আখি গুড়।

খেতে খেতে একবার মায়ের মুখের দিকে চাইল অনুতোষ। তারপর সংকোচ-জড়িত কণ্ঠে বলল : একটা কথা শুনবে মা ?

: কি কথা রে ?

: না—এই—মাষ্টার মশাইরা লাইব্রেরীর ঘরে বসে বলছিলেন,—তাই আমি শুনে ফেললাম।

: কি কথা রে ?

: সেকেণ্ড টিচার গুরুদাসবাবু কি বলেছিলেন জানো মা ? তিনি বললেন, আপনারা দেখে নেবেন মাষ্টার মশায়, অনুতোষ ঠিক ইউনিভারসিটিতে ষ্ট্যাণ্ড করবে। আমাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মা সাগ্রহে শুধালেন : হ্যাঁরে অনু, এই কথা বললেন তিনি ?

: হ্যাঁ মা। শুনেই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

: মা দুর্গা করুন, তাঁর কথাই যেন ঠিক হয়। তুই মানুষ হ অনু, তবেই তো আমাদের দুঃখ ঘুচবে।

কথা বলতে বলতে মায়ের হাসি মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। সত্যি, বড় দুঃখের সংসার ওঁদের। অনুতোষের বাবা আশুতোষবাবু স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের একজন সাধারণ শিক্ষক। চাকরি করে—ছাত্র পড়িয়ে দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটান। অনুতোষ ছোট ছেলে। সবে থার্ড ক্লাসে উঠল। তবু সংসারের এ নীরব দুঃখের কাহিনী ও জানে। ও জানে—ওর বাবা আর মা দুঃখ-দারিদ্র্যের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে ওদের ভাই-বোনকে মানুষ করবার সাধনা করছেন।

অনুতোষ শুধাল : বাবা কি এখনো স্কুল থেকে ফেরেন নি মা ?

মা জবাব দিলেন : হাঁরে। স্কুল থেকে এসে উনি একটু শহরে গেলেন। আজই রাতের ট্রেনে ফিরবেন।

: হঠাৎ শহরে কেন মা ?

মা মৃদু হেসে বললেন : হঠাৎ তো নয় অনু, যাবার কথা তো আগের থেকেই ছিল। তোর কি মনে নেই, উনি একদিন বলেছিলেন,—অনু থার্ড ক্লাসে উঠলেই ওকে একটা ফাউণ্টেন পেন কিনে দেব।

অনুতোষ ঘাড় নেড়ে জানাল,—আছে।

মা বললেন : তাই আজ উনি শহরে গেছেন তোর পেন আনতে।

আনন্দে অনুতোষ প্রায় লাফিয়ে উঠল : উঃ, তুমি বল কি মা, আজ আমার পেন আসবে? কি পেন মা?

: তা তো ঠিক জানি না বাবা! উনি বললেন, দেখে শুনে পছন্দ করে একটা নিয়ে আসবেন।

অনুতোষ একটু চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করল : আচ্ছা মা, দিদির জন্যে বাবা কি আনবেন?

: বন্দনার জন্যেও আনবেন একটা সেলায়ের বাক্স।

দিন যেন আর কাটতে চায় না। অধীর প্রতীক্ষায় ভাই-বোন পথের দিকে চেয়ে রইল। কখন বাবা আসবেন—নিয়ে আসবেন কলম আর সেলাইয়ের বাক্স। ওদের ধৈর্য আর বাধ মানে না। দু'জন বাড়ীর রকে বসে রইল রাত আটটা পর্যন্ত।

মা খেতে ডাকলেন দু'বার। ওরা উঠল না। অনুতোষ বলল : আমরা এখন খাব না মা! বাবা আসুক, একসাথে বসে খাব।

বন্দনা বলল : তুমি বুঝতে পারছ না মা! বাবা আসবেন আমাদের জন্যে জিনিস নিয়ে। আর এসে দেখবেন আমরা খেতে বসে গেছি। না মা, সে বড় বিচ্ছিরি হবে।

যথাসময়ে বাবা এলেন। এল রোল্ড গোল্ডের ক্লিপ-ওয়ালা বাহারে পেন, আর সোনালী বাক্সে ভরা সেলাইয়ের সরঞ্জাম। ভাই-বোনের সে কী আনন্দ! টিপ টিপ করে বাবাকে প্রণাম করল। অনুতোষ দিল পরীক্ষার খবর। বন্দনা খুলে নিল জামা ও জুতো। মা নিয়ে এলেন গাড়ু ও গামছা। বাড়ীতে যেন উৎসব লেগে গেল।

আবার একদিন ভেঙে গেল সে উৎসব।

কলমের খোঁচায় ভাগ হয়ে গেল বাঙলা দেশ। শুধু দেশ বিভাগ নয়, দু'ভাগ হয়ে গেল মানুষের হৃৎপিণ্ড। সুখ গেল। শান্তি গেল। দাবানল জ্বলে উঠল শহরে ও গ্রামে।

বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী ফিরলেন আশুতোষবাবু; বিষণ্ণমুখে কি যেন পরামর্শ করলেন স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি চোখের জল মুছতে লাগলেন বার বার।

আশুতোষবাবু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: তুমি কিছু ভেবো না বড়বৌ, অবস্থা খারাপ বুঝলেই আমিও চলে যাব।

স্ত্রী কেঁদে কেঁদে বললেন: তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে আমার যে এক পাও কোথাও যেতে মন সরছে না। আমি বরং তোমার কাছে থাকি। অনু আর বন্দনাকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

আশুতোষবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন: তা হয় না বড়বৌ, তোমার এ অবস্থায় এখানে থাকা হয় না। বরং তোমরা চলে গেলে ঝাড়া হাত-পায়ে আমি অনায়াসেই যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারব।

তাই স্থির হল। দরজা-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে ওরা রওনা হল অনির্দিষ্ট হিন্দুস্থানের পথে। সঙ্গে রইলেন একটি প্রতিবেশী পরিবার ও তাদের এক বৃদ্ধ অভিভাবক।

ট্রেন ছাড়বার সময় হল। সকলেরই চোখ জলে ভরা।

অনুতোষ বাবাকে প্রণাম করল। গম্ভীরকণ্ঠে আশুতোষবাবু বললেন: তোমার মা আর দিদিকে তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম অনু। ছেলেমানুষ হলেও তুমি পুরুষ মানুষ। আমি যতদিন না যেতে পারি, বা তোমাদের আবার ফিরিয়ে আনতে পারি, ততদিন এদের রক্ষার ভার তোমাকেই নিতে হবে।

অনুতোষ সজল চোখ তুলে বলল: বাবা—

আশুতোষবাবু বললেন: তুমি কিছু ভেবো না বাবা, এত মানুষ যখন চলেছে স্বাধীন হিন্দুস্থানে, তখন ব্যবস্থা একটা সেখানে হবেই। ঈশ্বরের নাম করে তোমরা যাত্রা কর। শুধু মনে রেখো,—অন্যায়ের পথে কখনও যেও না। আর যথাসাধ্য অপরের দয়ার উপর কখনও নির্ভর করো না।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

ওদের পায়ের নীচ থেকে সরে গেল জন্মভূমির মাটি। সরে গেল—হারিয়ে গেল। একটি আধা-শহরের স্টেশন হতে ট্রেনে চড়বার সময় ওরা ছিল রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। ট্রেন থেকে যখন নামল শিয়ালদহ স্টেশনে তখন ওরা আর মানুষ নয়—উদ্বাস্তু। তখন ওরা হারিয়ে বসেছে সব। কিন্তু পেয়েছে কি?

এত সব বুঝতে অনুতোষের অবশ্য সময় লেগেছিল। সঙ্গী বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ও এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় আর বিস্মিত হয়। এখানে কেউ ওদের নাম ধরে ডাকে না। কেউ বলে না অনুতোষ, বন্দনা, আশুতোষবাবুর ছেলেমেয়ে। সবার মুখেই এক কথা—উদ্বাস্তু। কেউ সমবেদনায়

দরদভরা কণ্ঠে বলে—শরণার্থী। কেউ ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বলে—রিফ্যুজি। অনুতোষ দেখে শোনে আর অবাক হয়। অবাক হয় আর ভাবে: এ কোথায় এলাম? এই কি স্বাধীন দেশ?

ক্রমে শিয়ালদহ স্টেশন হতে শরণার্থী শিবির। সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন আহার্য সংগ্রহ। অনুতোষের মন বিদ্রোহ করে। এ কী পরনির্ভর ভিখারীর জীবন? এরি জন্যে কি ওরা দেশ ছেড়েছে? ছেড়েছে বাবাকে?

আসার পরে বাবার খবর ওরা পায় নি। কে কার খবর রাখে? সবাই চাচা আপন বাঁচা। মা কেঁদে কেঁদে আর ভেবে ভেবে বিছানা নিলেন। তারপর একদিন ঘুমের ঘোরে হঠাৎ রক্ত রক্ত বলে চেঁচিয়ে উঠে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সে-মূর্ছা আর ভাঙল না!

ভাই-বোন একেবারে ভেঙে পড়ল। কোথায় যাবে? কি করবে? একবার ভাবল—দেশে ফিরে যাবে বাবার কাছে। কিন্তু সঙ্গীরা সবাই বাধা দিল। বলল: সেখানে কি এখন মানুষ যেতে পারে? কখ্খনো যেও না। তোমাদের বাবা হয়তো পালিয়ে কোথাও চলে গিয়েছেন। একটু ঠাণ্ডা হলেই এসে তোমাদের খোঁজ করবেন। অতএব তোমরা এখানেই থাক।

তাই থাকল ওরা। সত্যি তো, যদি বাবা ফিরে আসেন? বাবার ফিরে আসার কথা ভাবতেই অনুতোষের আজ আবার নতুন করে মায়ের কথা মনে পড়ল। বাবা যে ওরই উপরে মায়ের রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। তা'হলে? বাবা এলে তাঁর কাছে ও কি বলবে?

অনুতোষের দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

সেই চোখের জলে ঝাপসা পথ বেয়ে অনুতোষ পথে বের হল একা। এই পরনির্ভর ভিখারীর জীবন আর নয়। অনুতোষ এবার নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কাজ করবে। যে কোন কাজ।

কিন্তু কোথায় কাজ? মহানগরীর রাজপথের পাষাণের ঘষায় অনুতোষের নরম পায়ের তলা রক্তাক্ত হল, কিন্তু মিলল না চাকরি।

দিন যায়।

সাম্প্রদায়িক দাবানল ক্রমে শান্ত হয়ে এল। ওদের ছেড়ে আসা শহর থেকে লোকও এল। কিন্তু আশুতোষবাবুর সঠিক খবর কেউ দিতে পারল না। শুধু বলল, আক্রমণকারীরা যখন বড় স্কুলের বোর্ডিং আক্রমণ করেছিল, তখন একবার আশুতোষবাবুকে তারা দেখেছিল সেই দিকে ছুটে যেতে। তার পরের খবর কেউ দিতে পারল না।

ভাই-বোন হতবাক। ওদের বহু আশার নীল আকাশ জুড়ে নেমে এল নিরাশার কালো মেঘ।

বন্দনা বলল: কি হবে অনু?

অনুতোষ বলল: কি হবে দিদি?

দু'জনের অবারণ চোখের জলে দিগন্ত ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু পথের হদিস মিলল না।

অনুতোষ তবু হার মানে না। বন্দনা তবু হাল ছাড়ে না। দু'জনেই ওরা চাকরির চেষ্টা করে।

অনুতোষ একদিন একটা রেস্তোঁরায় 'বয়'এর কাজ করে উপায় করল চকচকে একটি টাকা। শুনে বন্দনা চোখের জলে বুক ভাসাল। বলল : একাজ তোকে আমি কিছুতেই করতে দেব না অনু, না খেয়ে মরলেও নয়।

অনুতোষ জবাব দিল : না করে যে উপায় নেই দিদি, বাঁচতে তো হবে!

বন্দনা ঠোঁট কামড়ে বলল : সে আমি বুঝব।

অনুতোষ দৃঢ়কণ্ঠে বলল : সে হয় না। হাজার হোক তুমি মেয়ে। তোমাকে রক্ষার ভার বাবা আমাকেই দিয়েছেন।

বন্দনা দৃঢ়তর কণ্ঠে বলল : তা হয় না। মেয়ে হলেও আমি তোর দিদি। তোর ভাল-মন্দ দেখা আমার কর্তব্য।

ভাই-বোনে কথা কাটাকাটি হল অনেক। কোন মীমাংসা হল না।

সেদিন সন্ধ্যায় অনুতোষ বলল : একটা চাকরি বোধ হয় এবার পাব রে দিদি!

বন্দনা উৎসুককণ্ঠে প্রশ্ন করল : কি চাকরি রে অনু?

: চাকরি অবশ্যি খুব বড় দরের নয়। আর ঠিক কি চাকরি তাও আমাকে খুলে বলে নি। তবে ট্রাম কোম্পানীর চাকরি এইটুকু বলেছে।

ট্রাম কোম্পানীর কথা শুনেই বন্দনার খট্‌কা লাগল মনে। বলল : তাই তো রে অনু, ট্রামের কণ্ডাক্টার নয় তো?

মুখে হাসি টেনে অনুতোষ বলল : তা নয় তো কি চিফ্‌ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের চাকরি আমায় দেবে? তুমিও যেমন দিদি, সব তাতেই খুত-খুত।

বন্দনা তবু বলল : খুত-খুত কি আর সাধে করি রে ভাই! তোকে দিয়ে বাবার মনে যে কত আশাই ছিল—

বন্দনা আর কিছু বলল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করল।

কথা বলল অনুতোষ : কিন্তু দিদি, বড় একটা অসুবিধায় যে পড়ে গেছি।

: কি অসুবিধা রে?

: শোন তা'হলে। আজ ঘুরতে ঘুরতে চিৎপুরের ট্রাম ডিপোর কাছে চুপ করে বসেছিলাম। সেখানেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হল। ট্রাম কোম্পানীরই কোন লোক হবে। গায়ে 'সি-টি-সি' মারা খাকির কোট। সব কথা শুনে লোকটি আমাকে একটা চাকরি করে দেবে বলেছে। কিন্তু কথা হল, লোকটি বলছে চাকরি পেতে হলে কোন্ বাবুকে নাকি কিছু ঘুষ দিতে হবে।

বন্দনা যেন চমকে উঠল : সে কিরে? ঘুষ?

অনুতোষ বলল : আমিও তাই ভাবছি দিদি, শেষে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেব ? বাবা জানলে কি বলবেন ?

বন্দনা বলল : নারে অনু, ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়ে তোর কাজ নেই। তা ছাড়া, ঘুষের টাকাই বা আমরা পাব কোথায় ?

অনুতোষ বলল : সে আমি ভেবে রেখেছিলাম, না হয় এই ফাউণ্টেন পেনটাই দিয়ে দিতাম।

: সে কিরে ? বাবার দেওয়া ওই পেনটা দিয়ে দিবি ? দিতে পারবি ?

: না পেরে উপায় কি দিদি ?

: উপায় আমার হাতে। শোন্ অনু, আমি চাকরি পেয়েছি। দু-চার দিনের মধ্যেই কাজে যোগ দেব।

: কি চাকরি দিদি ?

: হাওড়ার ওদিকে কোথায় নাকি মাড়োয়ারীদের নতুন একটা হাসপাতাল হয়েছে। সেখানেই আমাকে চাকরি দেবে বলেছে।

অনুতোষ শুনেই ধনুকের মত ফিরে বসল। বলল : কিন্তু বুড়ো দাদু তো ও চাকরি করতে তোমাকে নিষেধ করেছে।

বন্দনা বলল : অত বিধি-নিষেধ মানলে কি এখন আমাদের চলে ভাই ! কাজ যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন দেখিই না কিছুদিন করে। অসুবিধা হয়, না হয় ছেড়ে দেব।

অনুতোষ তবু আপত্তি জানাল : না দিদি, এখন ও চাকরি তুমি নিও না। আগে দেখি আমার চাকরিটা হয় কিনা। তারপর ওসব দেখা যাবে।

রাতে বিছানায় শুয়ে অনুতোষ আকাশ-পাতাল ভাবল। ট্রামের চাকরি, বাবার পেন, ঘুষ, অসত্য আচরণ, দিদির চাকরি, মাড়োয়ারীদের হাসপাতাল, বুড়ো দাদুর নিষেধ—কতো কি !

ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা জড়িয়ে এল। অনুতোষ স্বপ্ন দেখল, ট্রেনের কামরা। বাবা ধরা গলায় বলছেন, তোমার মা আর দিদিকে তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম অনু ! ছেলেমানুষ হলেও তুমি পুরুষ মানুষ।

ঘুমের ঘোরেই অনুতোষ বলল, তাই হবে বাবা, তাই হবে !

পরদিন সকালে উঠেই অনুতোষ ছুটল চিৎপুর ট্রাম ডিপোর দিকে।

খুঁজে খুঁজে সেই 'সি-টি-সি' মার্কা লোকটিকে বের করল। অনেক অনুনয়-বিনয় করে ফাউণ্টেন পেনটিই দিল তাকে ঘুষ।

লোকটি খানিক এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে এসে বলল : তুমি বরং কাল সকালে এস খোকা, আমি এদিকে তোমার চাকরির ব্যবস্থা করে রাখব।

ট্রাম ডিপো থেকে বেরিয়ে এল অনুতোষ। অনেকদিন পরে আজ ওর মনে লেগেছে খুশির

হাওয়া। এইবার ও পারবে বাবার দেওয়া কর্তব্যের ভার বহন করতে। মাকে রক্ষা করতে ও পারে নি। কিন্তু এবার রক্ষা করতে পারবে দিদিকে। ছোট হলেও পুরুষ মানুষ তো।

এখানে-ওখানে ঘুরে দুপুর গড়িয়ে অনুতোষ শিবিরে ফিরল।

বাইরে থেকেই হাঁক দিল: বড্ড খিদে পেয়েছে দিদি, শিগ্‌গির খেতে দাও।

কোন সাড়া নেই। অনুতোষ ঘরে ঢুকল। ঘর খালি, দিদি ঘরে নেই।

খোঁজ নিল প্রতিবেশীর কাছে। বন্দনা চলে গেছে। দুপুর নাগাদ এসেছিল মস্ত একখানি লাল রঙের গাড়ী, তাইতে চড়ে বন্দনা চলে গেছে। বলে গেছে, অনুতোষ যেন মিথ্যে না ভাবে। শিগ্‌গির একদিন এসে সে অনুতোষকেও নিয়ে যাবে সেখানে।

লাল রঙের গাড়ী! নিশ্চয় সেই হাসপাতালের গাড়ী। লাল রঙ। আগুনের রঙ। আগুন জ্বলে উঠল অনুতোষের মাথায়। শেষে তুমি এই করলে দিদি? আমি যে এদিকে হারিয়ে এসেছি বাবার দেওয়া পেন!... আমি যে দিয়ে এসেছি ঘুষ! সব তুমি মিথ্যা করে দিলে? বাবার দেওয়া কর্তব্য পালন করতেও দিলে না?

অনুতোষ ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তীব্রগতিতে ছুটতে লাগল মহানগরীর রাজপথে। মাথার উপরে ছুটে চলেছে ট্রামের তার। পায়ের নীচে ছুটেছে ট্রামের লাইন। অনুতোষের মাথার ভিতরেও ছুটছে আগুনের স্রোত।

চিৎপুর ট্রাম ডিপোর মুখেই দেখা হয়ে গেল সি-টি-সি মার্কা সেই লোকটির সঙ্গে। হাঁপাতে হাঁপাতে অনুতোষ বলল: আমার ফাউন্টেন পেনটি ফিরিয়ে দিন্।

বিস্মিত হল লোকটি: সে কি?

অনুতোষ বলল: চাকরি আমি চাই না। ঘুষ আমি দেব না। দিন্ আমার পেন।

লোকটি চাইল অনুতোষের দিকে। ঘেমে নেয়ে গেছে অনুতোষ! চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে দুঃসহ আবেগে।

লোকটি পকেট থেকে পেনটি বের করে দিল। অনুতোষ পেন নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ডিপো থেকে।

কিন্তু কোথায় যাবে? শরণার্থী শিবিরে? কেন? কার জন্যে? মা নেই! বাবা আছেন কি না কে জানে! দিদি আজ ওর কাছে থেকেও নেই। সে তো নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে। তা'হলে? কার জন্যে ও ফিরে যাবে? কোথায় ফিরে যাবে?

কিসে কি যে হল, অনুতোষ পথের পাশেই বড় একখণ্ড কাঠের উপর বসে পড়ল। পকেট থেকে পেন নিয়ে এক টুকরো কাগজে খস্‌-খস্‌ করে কি যেন লিখে পকেটে রাখল। কলমটি সযত্নে গুঁজে রাখল বুকের পকেটে।

ওদিক থেকে ফুল স্পীডে ছুটে আসছে একখানি ট্রাম!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত অনুতোষ উঠে দাঁড়াল।

ট্রাম এগিয়ে আসছে। তার ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘটাং ঘটাং আওয়াজে ঢেকে গেল মহানগরীর কল-কোলাহল। ঢেকে গেল—আচ্ছন্ন হয়ে গেল অনুতোষের কান মন প্রাণ।

অনুতোষ পড়ল চলন্ত ট্রামের তলায়।

হৈ-হৈ করে উঠল চারদিকে জনতা। খ্যাচাং করে ব্রেক কষে থেমে গেল ট্রাম। ট্রামের তলা থেকে বের করা হল একটি ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ···

তার পকেটে পাওয়া গেল একটি ফাউন্টেন পেন ও এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা: আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়···আপনার বলতে আমার কেউ নাই···পকেটে একটি পেন রইল···তাই বেচে যেন আমার সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।··

এ যুগের ছেলের কথা

—শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

"রাজা-রাণী, টুনটুনি আর অপ্সরীদের নিয়ে
অনেক গল্প শুনেছি মা! ওদের কথা দিয়ে
ভুলিয়ো না আমায় মাগো! আজকে বলো দেখি,
মানুষেরা সবাই খাঁটি? কেহ কি নয় মেকি?
লক্ষজনা পায় না খেতে, হাজার মাথার 'পরে
আকাশ ছাড়া ছাদ নেই মা, রোদে, জলে, ঝড়ে।
খালি গায়ে থাকে কেন শীত-বরষার দিনে,
মরে কেন রোগ হলে মা ঔষধ-পথ্য বিনে?
এর কি কোনো শেষ নেই মা, কেন এমন হলো?"
"কপাল-দোষে ভোগে সবাই, কে খণ্ডাবে বলো!"
"না মা, এ যে মনুষ্যত্বের নিত্য অপমান,
বড় হয়ে আমি মা এর করবো সমাধান।"

আবহাওয়া বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

আদিম যুগের অধিবাসীদের সঠিক ইতিহাস আমরা জানি খুব কমই, কিন্তু এটুকু জানি যে আবহাওয়ার তারতম্যে আজকের আমাদের জীবনের মত তাদের জীবনও কম প্রভাবিত হতো না। আমাদের জীবন-ধারায় পরিবর্ত্তন এসেছে, কিন্তু আবহাওয়ার তারতম্য মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে যুগযুগান্তর ধরে। পুরানো দিনের মানুষেরা ঝড়ো আবহাওয়ায় না পারতো শিকার করতে, না পারতো মাছ ধরতে। অনাহারে থাকতে হতো তাদের যতদিন না আবহাওয়া আসতো অনুকূলে। দিনের আরম্ভে তাই বোধ হয় তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল—আকাশ পানে তাকিয়ে আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস জানবার প্রয়াস। দেখতে দেখতেই তারা শিখেছিল, কোন্‌টা ঝড়ের মেঘ, কোন্ মেঘে হয় বৃষ্টি, কোন্ মেঘ থেকে হতে পারে শিলাবৃষ্টি, আবার কোন্ মেঘ থেকে নেই কোন অনিষ্ট। তাই অদম্য কৌতূহল এবং একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখের সন্ধানী দৃষ্টিই ছিল তাদের যা কিছু সম্বল। আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস জানবার কোন রকম যন্ত্রই ছিল না তাদের।

আবহাওয়া বিজ্ঞানে প্রথম যে যন্ত্রের আবির্ভাব হলো, তাকে বলতে পারি বর্ত্তমান কালের বাতাস—দিকনির্ণয় যন্ত্রেরই প্রথম সংস্করণ। এতে দেখা যেতো কেবল বায়ুর দিক পরিবর্ত্তন। গ্রীস্ দেশের রাজধানী এথেন্স সহরে একটা অদ্ভুত রকমের বাড়ী তৈরী করা হয়েছিল। আটকোণা একটা স্তম্ভের ওপর সমুদ্র-দেবতা ট্রাইটনের একটি মূর্ত্তি রাখা ছিল। ট্রাইটনের হাতে ছিল একটা

দণ্ড। বাতাসের দিক পরিবর্ত্তন হলেই, ট্রাইটন্ তাঁর দণ্ড ঘুরিয়ে বাতাসের গতির দিক্‌নির্দ্দেশ জানাতেন। আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস দেওয়ার পুরাতন প্রণালীর এইটিই বোধ হয় তৎকালীন আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রথম যন্ত্র।

আমাদের জ্বর হলে গায়ের উত্তাপ যে যন্ত্র দিয়ে দেখে থাকি, তার নাম তোমরা জানো নিশ্চয়ই। যন্ত্রটির নাম থারমোমিটার, আবিষ্কার করেছিলেন বৈজ্ঞানিক ফারেনহাইট ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে। এই আবিষ্কার আবহাওয়া বিজ্ঞানে এনেছিল যুগান্তর। কারণ এই থারমোমিটার যন্ত্র দিয়ে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জল-বাতাসের উত্তাপ মাপতে শিখেছিলেন। এই যন্ত্র আবহাওয়া বিজ্ঞানে মস্ত সহায়ক, কিন্তু সবখানি নয়। এতেই সব কাজ হয়ে ওঠে না।

শতাব্দী কেটে গেল। বৈজ্ঞানিক টরিসেলী যখন তাঁর ব্যারোমিটার আবিষ্কার করলেন, তখনই আবহাওয়া বিজ্ঞানের কাজ সুরু হলো পুরাদমে। বাতাসের ওজন বা বায়ুচাপের পরিমাপ নির্ণয় করা গেল এই ব্যারোমিটার যন্ত্র দিয়ে। এই যন্ত্রই প্রথম প্রমাণ করলো যে বাতাসের ওজন আছে। আরও প্রমাণ করলো, পাহাড়ের মাথায় যা বায়ুচাপ তা পাহাড়ের নীচের জায়গার বায়ুচাপের চেয়ে কম; অর্থাৎ উচ্চতার তারতম্যে বায়ুচাপের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণায় বসলেন। তা'হলে বাতাস তৈরী হয় কি দিয়ে? বাতাসের চাপ ভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন উচ্চতায় কম-বেশীই বা হবে কেন? বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহলী মন নূতন তথ্যের আবিষ্কার সুরু করলো।

দিনে দিনে আবহাওয়া বিজ্ঞানের উন্নতি হতে লাগলো। পূর্ব্বাভাসের উপকারিতা বুঝতে শিখলো মানুষ। এ উপকারিতা চাষীদের কাছে হলো অমূল্য সম্পদ। এদের কাছ থেকেই পূর্ব্বাভাসের চাহিদা গেল বেড়ে। দেশ-বিদেশে আবহাওয়া পরিষদ গড়ে উঠলো। বর্ত্তমানে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য আবহাওয়া দপ্তর রয়েছে। এমন কি, নির্জ্জন নিরিবিলি দ্বীপেও তাদের অফিস বসিয়ে আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা এখন তাদের তথ্য জোগাড় করে বেতারে খবর পাঠাচ্ছে তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে। সেখানে চার্ট তৈরী হচ্ছে দিনরাত। পৃথিবীর এক একটা এলাকার আবহাওয়ার খুঁটিনাটি খবর সব এই ভাবে সেই এলাকার কেন্দ্রীয় অফিসের নখদর্পণে এসে গেছে।

বিমানপথে আবহাওয়ার খবর এবং পূর্ব্বাভাস জানা অপরিহার্য্য। বৈমানিকেরা পথের আবহাওয়ার খবর সব না জেনে এক পাও এগুবে না। প্রতিকূল আবহাওয়া বৈমানিকদের এবং বিমানপথের যাত্রীদের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তাই যত বেপরোয়া বৈমানিকই হোক না কেন, আবহাওয়ার খবর খারাপ থাকলে, স্বেচ্ছায় আবহাওয়ার খেয়াল খেলার সাথে অযথা গোঁয়ারতুমি করতে যায় না তারা। প্রায় সব বিমান-ঘাঁটিতেই আজকাল তাই আবহাওয়া দপ্তর থাকে।

বড় বড় সহরেও আবহাওয়া অফিসের আড্ডা থাকে—উঁচু কোনো বাড়ীর ছাদে যেখান থেকে চারদিকের আকাশ দেখা যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত। মাঝ-দরিয়ায় জাহাজ যে পথ দিয়ে চলেছে, সেখানের আকাশ-বাতাসের খবর সব সেখান থেকে বেতারে পাঠানো হয়ে থাকে মাটির কোন বেতার-

ঘাঁটিতে। বেতার-ঘাঁটি থেকে খবর চলে যায় আবহাওয়া দপ্তরে। এমনি ভাবে কেন্দ্রীয় দপ্তর আবহাওয়ার খবর বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো করে এবং স্থানীয় আবহাওয়ার খবর যোগ করে। কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে বেতার-বার্ত্তা পাঠানো হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ে। এরোপ্লেন হোক, জাহাজ হোক, কিংবা মাটির যে কোন কৌহতুলী লোকই এই প্রচারিত বেতার-বার্ত্তা শুনে স্থানীয় এলাকার আবহাওয়ার খবর এবং পূর্ব্বাভাস জানতে পারে।

আমেরিকায় ছাত্র, চাষী, এমন কি চাকুরেদের মধ্যেও অনেক স্বেচ্ছাসেবক আছে যারা আবহাওয়ার খবর জোগাড় করে 'মেন্' আবহাওয়া অফিসে বিনা পারিশ্রমিকে পাঠিয়ে থাকে। এতেও কাজ হয় অনেক। আবহাওয়ার খবর যে কত দরকারী, তা বোধ হয় এখন পৃথিবীর সব লোকই বুঝতে শিখেছে।

আবহাওয়ার খবর জোগাড় করা হয় কি উপায়ে তাই এবার দেখা যাক্। বলা বাহুল্য, যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য্য। বড় আবহাওয়া দপ্তরে যন্ত্রের ব্যবহার হয় ডজন খানেক, ছোট্ট ঘাঁটিতে দু'চারটে অবশ্য-প্রয়োজনীয় যন্ত্র দিয়েই কাজ চলে। এই সব বিভিন্ন যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণী এই প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। মোটামুটি কয়েকটির কথা বলি তোমাদের।

বাতাসের দিক্‌নির্ণয় করা যন্ত্র (wind vane) যেমন বহু পুরাকালে কাজ করতো, সেই কায়দায়ই কাজ করে আজও। তবে ট্রাইটনের মূর্ত্তির বদলে আমরা আজকাল ব্যবহার করি একটা কোন ধাতুর তৈরী তার। তারটা অনায়াসে সামান্য বাতাসের ধাক্কায় ঘুরতে পারে সবদিকেই। বাতাস যে দিক থেকে আসছে, সেই দিকেই মুখ করে থাকে এই তারটি সব সময়ই।
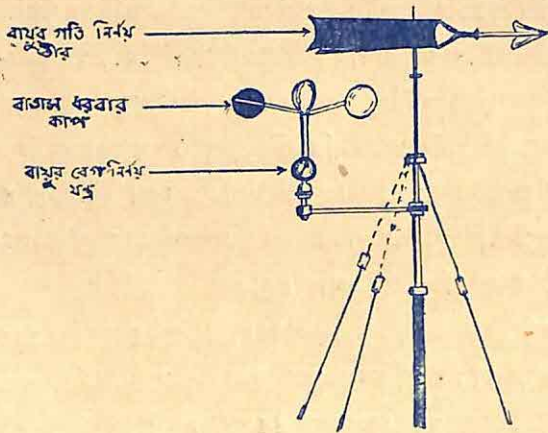
এ্যানিমোমিটারে (Anemometer) একটা খাড়াই রডের ওপর তিনটি অনুভূমিক রড জোড়া থাকে। এই তিনটি রডের সাথে আটকানো থাকে তিনটি ছোট কাপ। এই কাপগুলোর মধ্যে বাতাস লেগে সেগুলোকে ঘোরাতে থাকে। বাতাসের বেগ যত বেশী হয়, কাপগুলো ঘুরতে থাকে তত জোরে। কত দ্রুত ঘুরছে ওই খাড়াই রডটি, তাই মাপা হয় একটা যন্ত্র দিয়ে—এ যন্ত্রটি লাগানো থাকে ওই খাড়াই রডটির ঠিক নীচেই। বাতাসের বেগ কত, তাই তা'হলে এই এ্যানিমোমিটার যন্ত্র দিয়ে জানা গেল।

আগেই বলেছি, ব্যারোমিটার দিয়ে মাপা হয় বায়ুচাপ। ব্যারোমিটার যন্ত্রটা কি ভাবে বায়ুচাপ মাপে, তাই বলি এবার। এক মুখ বন্ধ পঁচিশ ফুট লম্বা একটা নল জলে ভর্ত্তি করলাম। অন্য মুখটি

নামতে থাকবে। নামবার সময়ও নিম্নগামী এই যন্ত্রটা জানিয়ে দিতে থাকে বিভিন্ন স্তরের বাতাসের খবর। তাই গ্রাহক-যন্ত্রে যখনই কোন খবরের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তখনই বুঝা যায় বেলুনটা আর ওপরে উঠছে না—সেটা ফেটে গিয়ে প্যারাস্থটে করে প্রেরক-যন্ত্রটাকে নামাতে আরম্ভ করেছে। তখন মাটির ঘাঁটি ওই গ্রাহক-যন্ত্রে খবর দেওয়া বন্ধ করে। পরে কোন্ সুদূর দেশের কোন্ অজানা নদীর ধারে হয়তো প্যারাস্থট সমেত ওই ছোট্ট বেতার প্রেরক-যন্ত্রটি ঝুপ করে গিয়ে পড়লো কে জানে! খুব দামী না হলেও যন্ত্রটি যদি কোন কারণে আবার ফেরত পাওয়া যায় সামান্য কিছু খরচ করে, আবার কাজে লাগানো যায় সেটাকে। এই যন্ত্রটির ইংরেজী নাম হলো Radio Sonde.

আবহাওয়ার খবর জানবার জন্য আরও একটা বেতার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যার নাম হলো RAWIN বা RADIO WIND। বেতার বিজ্ঞানের সাহায্যে ওপরকার বাতাসের গতি এবং বেগ জানাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এতেও থাকে একটা বেতার প্রেরক-যন্ত্র—হাইড্রোজেন গ্যাস্ ভর্ত্তি একটা মস্ত বড় বেলুনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া থাকে সেটাকে। মাটির ঘাঁটিতে দিক্ নির্ণয়কারী বৈদ্যুতিক যাদু চোখের (Radar) মত একটা গ্রাহক-যন্ত্র দিয়ে এই বেতার প্রেরক-যন্ত্রের সঙ্কেতটাকে 'চোখে-চোখে' রাখা হয়। প্রত্যেক মিনিটে বেলুনটা কতখানি উঁচুতে উঠছে এবং যেখান থেকে বেলুনটাকে ছাড়া হয়েছে, সেখান থেকে কতখানি সরে যাচ্ছে, এ দুটোই লক্ষ্য করে বিভিন্ন স্তরের বাতাসের গতি এবং বেগ দিব্যি বলে দেওয়া যায়। দূরবীন দিয়ে যেভাবে এই খবর জানা হয়, এরও কায়দাটা অনেকটা একই রকমের; কিন্তু এখানে বেলুনটাকে দূরবীনের ভেতর দিয়ে নিজের চোখে আর দেখতে হয় না—বেতার-ঢেউ দিয়েই বেলুনটার পরিস্থিতি জানা যায়। বেতার-ঢেউ না মানে অন্ধকার, না মানে কুয়াসা, না মানে মেঘের আড়াল। তাই আকাশের অবস্থা ভাল না থাকলে ওপরকার বাতাসের খবর জানবার জন্য RAWIN অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। শরৎকালের সুন্দর পরিষ্কার নীল আকাশে অবশ্য সাধারণ হাইড্রোজেন-ভর্ত্তি বেলুন এবং দূরবীন দিয়ে বেশ ভালভাবেই কাজ চলে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলের প্রথম দিকের কথা। পশ্চিম ভারতে একটি করদ-মিত্র রাজ্য ছিল; রাজ্যটি ছোট হলেও সমৃদ্ধ। এর বৃদ্ধ মহারাজা ইংরেজকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেই ত রাজা হয়ে বসেছে। তাদের প্রবর্তিত টেলিগ্রাফ, রেলপথ ও ইংরেজী শিক্ষাকে মহারাজা সন্দেহের চোখে দেখতেন। সেই রাজ্যেরই একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ছেলে—পূরণ দাস। পূরণ দাস কিন্তু বুঝেছিলেন ইংরেজী শিক্ষার সুফলটুকু গ্রহণ করতে হবে, ইংরেজ-চরিত্রের সদ্‌গুণগুলো আয়ত্ত করতে হবে, দেশকে এবং দেশবাসীকে উন্নত করতে হলে অনেক জিনিস শিখতে হবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি রাজকর্মচারীরূপে যোগদান করলেন এবং যোগ্যতার গুণে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করলেন। বৃদ্ধ মহারাজা পরলোক গমন করলে রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করলেন; পূরণ দাসই হলেন প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বময় কর্তা।

পূরণ দাস ব্রাহ্মণ-সন্তান। দীর্ঘ ঋজুদেহ, প্রশস্ত ললাট, চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি, সমগ্র অবয়বে এমন একটি শুভ্র চরিত্রের আভা যে, তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালে আপনা থেকেই সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসে। প্রজার মঙ্গলই তাঁর একমাত্র চিন্তা। বিলাতের শাসন-ব্যবস্থা কেমন, জনসাধারণের অবস্থা কেমন দেখবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে নানা দিকে রাজ্যের উন্নতি সাধন করতে

লাগলেন। বড় বড় রাজপথ নির্মিত হ'ল, স্কুল কলেজ হাসপাতাল স্থাপিত হ'ল, রাজ্যের সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা বিরাজ করতে লাগল। ইংরেজ সরকার প্রধান মন্ত্রীর কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কে. সি. এস. আই. এবং আরো অনেক উপাধিতে ভূষিত করে সম্মান দেখালেন। প্রজাবৃন্দ ধন্য ধন্য করতে লাগল।

* * *

একদিন অকস্মাৎ রাজধানীর অধিবাসীরা শুনল যে, প্রধান মন্ত্রী পূরণ দাস বাহাদুর পদত্যাগ করেছেন। সঠিক কারণ কি, তা কেউ অনুমান করতে পারল না। সমগ্র রাজধানীতে বিষাদের ছায়া নেমে এল। জনগণ রাজপথে সমবেত হয়ে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের দিকে এগিয়ে চলল। তারা পূরণ দাসকে রাজপথ দিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে দেখে, সম্ভ্রমভরে দুইপাশে সারিবদ্ধ হয়ে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রইল। পূরণ দাস নগ্নপদে হেঁটে চলেছেন, পরনে গেরুয়া কাপড়, বগলে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, বাম হাতে নারিকেলের মালার ভিক্ষাপাত্র, ডান হাতে পিতলের হাতলওয়ালা একখানা চিম্‌টা, পায়ের দিকে মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ। প্রজাপালনকারী পূরণ দাস বাহাদুর সংসার ত্যাগ করে নূতন আলোকের সন্ধানে চলেছেন। তাঁর পথ রোধ করার সাহস কারো হ'ল না; নাগরিকগণ অশ্রুপূর্ণ চোখে নীরবে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। নগরের বাইরে এসে উত্তরাভিমুখী পথ ধরে পূরণ দাস অগ্রসর হলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁর অনুগত প্রজাদের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা এখন তোমাদের নিজের ঘরে ফিরে যাও। আমার সঙ্গে এসে কোন লাভ নেই। আমার আহ্বান এসেছে, আমাকে যেতে হবে। তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের মঙ্গল হোক্।

পূরণ দাস পুনরায় পথ ধরে চললেন। প্রজাগণ সেখানেই দাঁড়িয়ে যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ তাঁর দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে রইল। সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা পিছনে ধূলাতে পড়ে রইল, পূরণ দাস কোন্ অজানা সম্পদের আকর্ষণে এগিয়ে চললেন ; চোখের দৃষ্টি পথের ওপর নিবদ্ধ, কিন্তু মন তাঁর উচ্চ ভাবে ভরপুর।

* * *

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর অন্নচিন্তা নেই, বাসস্থানের চিন্তা নেই। পথ চলতে, মন্দিরে বা কোন বৃক্ষতলে রাত্রি কাটে ; খাবার যেদিন যা জোটে তাতেই চলে যায়। পূরণ দাসের জননী ছিলেন পাহাড়ে দেশের মেয়ে ; পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণ তাঁর রক্তে মিশে আছে। নগর প্রান্তর ছাড়িয়ে পূরণ দাস হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন ; বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে অবশেষে হিমালয়ের এক উচ্চ শৃঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেন একটি মন্দিরে। ট্রেনে চড়ে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেলে কিছুদূর পর্যন্ত সুড়ঙ্গের গুম্‌গুম্ শব্দ কানে বাজতে থাকে। সংসার ত্যাগ করে এসেও তেমনি পূরণ দাসের কানে সংসারের কলরোল লেগেছিল। কিন্তু হিমালয়ের এই নির্জন রম্য স্থানটিতে এসে তাঁর চিত্ত স্থির হয়ে গেল। সম্মুখে চেয়ে দেখলেন, শুভ্র তুষারের মুকুট পরে স্তব্ধ

যোগীশ্বরের মত মহান হিমাদ্রি ; সূর্যকিরণ তার ওপর সোনার আবীর ছড়িয়ে দিয়ে নিত্য হোলি খেলে। নীচে পাহাড়ের গায়ে পাইন ও দেবদারুর ঘন বন, গাঢ় সবুজ উত্তরীয়ের মত, মেঘের দল তার ওপর দিয়ে আনাগোনা করে ; কখনো নীচে নেমে আসে, কখনো বা পর্বতের গা বেয়ে শূন্যে উঠে মিলিয়ে যায়। ছবির মত মনোরম স্থানটি দেখে পূরণ দাস মনে মনে বললেন—এখানেই আমার মনের শান্তি মিলবে, আমার কাম্য ধন মিলবে।

মন্দিরের পিছন দিক থেকে শুরু হয়েছে গভীর অরণ্য। মন্দিরটির ভেতরে একটি কালো পাথরের কালী মূর্তি। যে পাহাড়টির চূড়ায় মন্দির অবস্থিত, তার দেড়হাজার ফুট নীচে একটি বস্তি। পূরণ দাস পাইনগাছের শুক্‌না ডালপালা দিয়ে মন্দির পরিষ্কার করলেন ; কাঠ দিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে, মৃগচর্ম বিছিয়ে বসলেন। মন্দির থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে বস্তির লোকেরা খোঁজ নিতে এল। পুরোহিত এসে পূরণ দাসকে প্রণাম করে বললেন : ভকত, আপনি এখানে অবস্থান করুন ; আমরা আপনার নিত্য খাবার সংস্থান করে দিয়ে ধন্য হব। পাত্রটি বাইরে ঐ গাছের গুড়ির ওপর রাখবেন, ওখানে আমরা প্রতিদিন খাবার রেখে যাব।

একজন বলল : আপনার কম্বল আছে তো ? আগুন জ্বালানোর আরো কাঠ লাগবে তো ?

পূরণ দাস সাধুভক্ত লোকদের দিকে চেয়ে শুধু নীরবে হাসলেন। সাধুর প্রশান্ত দৃষ্টি লাভ করে তারা কৃতার্থ হয়ে গেল। প্রণাম করে ফিরে যাবার সময় বলাবলি করতে লাগল : আমাদের পুণ্যবলে অনেকদিন পর একজন প্রকৃত সাধক এসেছেন আমাদের মন্দিরে।

পূরণ দাসের পথ চলার অবসান হ'ল ; এবার তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করার সাধনায় নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন। বস্তির লোকেরা নিয়মিত খাবার দিয়ে যায়—গমের রুটি, দুধ বা ফলমূল। মহিলারা মাঝে মাঝে প্রণাম করতে আসে ; বলে : ভকত বাবা, আশীর্বাদ করুন ; আমাদের মঙ্গল কামনা করুন।

সাধু নিরন্তর স্থির হয়ে বসে নাম জপ করেন, বাহ্য জগৎ তাঁর কাছে লুপ্ত, দেহের অস্তিত্বও ভুলে যান তিনি ; মন তাঁর চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে। বাইরের জগতে দিনের পর রাত্রি আসে ; বছরের পর বছর কেটে যায়, কিন্তু তাঁর কাছে কালের চাকা থেমে গেছে ; অনন্যচিত্ত হয়ে সাধু তাঁর মনোজগতে মগ্ন হয়ে থাকেন। প্রত্যূষে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের নয়নশোভন প্রশান্ত গাম্ভীর্য অবলোকন করেন। নীচে সুপ্তিমগ্ন পল্লী, সেখানে বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের মনে ও প্রকৃতিতে রঙ বদল চলে।

মন্দিরের পিছন দিকের বনে ধূসর গোঁফওয়ালা অসংখ্য বড় বড় বানরের বাস। গাছ থেকে তারা সাধুকে লক্ষ্য করে। প্রথমে একটি বানর সাহস করে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই ; ভিক্ষাপাত্রটি মেঝেতে গড়িয়ে দেয়, চিম্‌টাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, মৃগচর্মটির কাছে গিয়ে মুখ ভেংচি দেখায়। সাধু নির্বিকার, বানরের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। ক্রমে

বানরটির সাহস বাড়ে, কাছে গিয়ে বসে; খাবারের জন্য হাত পাতে। সাধু কয়েকটি বাদামের দানা দেন; সে নিয়ে মুখে পুরে দেয়।

কয়েকদিন পর সে আরও কয়েকটি বানর সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আগুনের চারপাশে তারা ঘিরে বসে, যেন সাধুর আত্মীয়! দিনের বেলায় সর্বক্ষণ একটি বানর সাধুর কাছে গম্ভীরমুখে বসে থাকে, জানালা দিয়ে তুষার-ঢাকা হিমালয়ের শৃঙ্গের দিকে বিজ্ঞের মত চেয়ে থাকে, রাত্রিতে সাধুর পাশে কম্বলের ওপর শুয়ে ঘুমায়। বসন্তকালে ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে বানরী আসে; মন্দিরের মধ্যে চঞ্চল শিশুকে নামিয়ে দিয়ে তার মা চুপ করে বসে থাকে; শিশু বেশি চাপল্য প্রকাশ করলে ছোটখাটো চড় বসিয়ে দেয়!

বানরের পরে আসে শিংওয়ালা বড় হরিণ। রাত্রিতে পাথরের কালী প্রতিমার সঙ্গে তার শিং ঘষতে এসেছিল, মানুষের গন্ধ পেয়ে প্রথম দিন ছুটে বেরিয়ে গেল। পরে চুপে চুপে আসে, দেখে মানুষটি একই ভাবে পাথরের মত স্থির হয়ে বসে থাকে, নড়ে না, শব্দ করে না। ক্রমে সাধুর গায়ের ঘ্রাণ নিয়ে যায়। সাধক কোনদিন বা ধীরে ধীরে তার গলায় হাত বুলিয়ে দেন। নিঃশঙ্ক হরিণ পরে হরিণীকে নিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট্ট শাবকটি। রাত্রিতে তাদের চোখ নীল জোনাকির মত ঝিক্‌মিক্ করে। অবশেষে আসে কস্তুরী মৃগ, অত্যন্ত লাজুক, অতি সুশ্রী তার আকৃতি। সাধু এদের ডাকেন 'ভাই' বলে, সামান্য খাবার রেখে দেন এদের জন্য। 'ভাই' 'ভাই' ডাক শুনলে দিনের বেলাতেও এরা চলে আসে মন্দিরের ভেতরে। এ ছাড়া রঙিন পালকওয়ালা ময়ূরের মত পাখী আসে, বনের কালো ভালুক—গলার কাছে যার সাদা ডোরা দাগ—সেও আসে। প্রথম প্রথম ভোররাত্রিতে সাধুকে বনের পথে দেখতে পেয়ে সে আক্রমণ করার জন্য রুখে দাঁড়াত, কিন্তু দেখত সাধুর কোনদিকে লক্ষ্য নেই। শেষে সেও অন্যদের মত সাধুর স্নেহের ভাগ নিতে আসত, কখনো বা মন্দিরের কাছে এসে গান জুড়ে দিত। মন্দিরে বন্য জীবজন্তুর যাতায়াত পল্লীর লোকেরা দূর থেকে লক্ষ্য করত; তারা ভাবত এ সব সাধুর লীলা।

* * *

এভাবে অনেক কাল কেটে গেছে। পূরণ দাস এখন হয়েছেন ভকত; তাঁর দীর্ঘ চুল-দাড়ি জটা পাকিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে আসে। যে সব বালক আগে পল্লী থেকে সাধুর খাবার নিয়ে আসত, এখন তারা তাদের ছেলেদের পাঠায়। সাধু কতদিন থেকে ও মন্দিরে আছেন কেউ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে—'চিরদিনই আছেন।'

একবার বর্ষাকালে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ পর্বতের গায়ে এসে সমবেত হ'ল; মুষলধারে বর্ষণ হতে লাগল। তিন মাসের মধ্যে একদিনের জন্যও মেঘ কেটে গেল না। মন্দিরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভকত দেখেন, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত চলমান মেঘরাশি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসে, আর অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হতে থাকে; নীচের পল্লী ভিজা কুয়াসার আবরণে ঢাকা। কোন লোক উপরে

আসতে পারে নি, বনের 'ভাইদের' কারো সঙ্গেও দেখা হয় নি। সাধু ভাবেন—এদের কি হ'ল কে জানে।

অবশেষে বর্ষণ থামল; সোনালী রোদের হাসি আকাশে, পর্বতচূড়ায়, গাছের পাতায় ঝিলমিল করতে লাগল। বনের ভেজা মাটির মধুর মিষ্ট গন্ধে বাতাস হ'ল সুরভিত। ভকত আশা করেছিলেন তাঁর বন্য ভাইগণ নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু কারো দেখা পাওয়া গেল না। 'ভাই' 'ভাই' বলে কত ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু একটি প্রাণীরও সাড়া মিলল না। সাত দিন রোদের পর আবার দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি শুরু হ'ল, পাহাড়ের গা বেয়ে শত শত ধারায় জলের স্রোত ছুটে চলল; তারই কলকল খলখল শব্দে কানন-ভূমি মুখরিত হয়ে উঠল।

গভীর রাত্রিতে সাধু অনুভব করলেন কে যেন তাঁর হাত ধরে টানছে। হাত বুলিয়ে দেখলেন ছোট্ট একখানি হাত, লোমে ঢাকা। বুঝলেন তার ভাই হনুমান এসেছে। কম্বলের একটি ভাঁজ খুলে দিয়ে বললেন: কে ভাই! এখানে শুয়ে পড়। আজ বড় দুর্যোগ।...বানরটি তাঁর হাত ধরে আগের মত টানতেই লাগল। সাধু উঠে বসলেন, বললেন: কি খিদে পেয়েছে? দেখি কিছু আছে কিনা।... তবু বানর তাঁর হাত ধরে টানে, একবার ছুটে যায় দরজার কাছে, আবার ফিরে এসে টানতে থাকে। তার চোখে যেন কত কথা, কিন্তু সে প্রকাশ করে বলতে পারে না।

সাধু বললেন: এত চঞ্চল কেন ভাই! তোমার নিজের জন কেউ ফাঁদে পড়েছে? কিন্তু এখানে তো কেউ ফাঁদ পাতে না। তবে কি আমাকে বাইরে যেতে বলছ? কেন?

এমন সময় বড়শিং হরিণ মন্দিরে প্রবেশ করল। সাধু বললেন: ওই দেখ আজ বড়শিংও এসেছে।

হরিণ এসে ভকতকে শিং দিয়ে ঠেলতে লাগল দরজার দিকে। তিনি বললেন, ব্যাপার কি বল তো? এই বুঝি আশ্রয় দেওয়ার প্রতিদান?...হরিণটি নাক দিয়ে এক রকম শব্দ করতে করতে ক্রমাগত সাধুকে ঠেলতে লাগল। এমন সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত শব্দ করে মন্দিরের মেঝের দুখানা পাথর ফাঁক হয়ে গেল। সাধু উঠে দরজার কাছে গেলেন, দেখলেন, সিঁড়ির পাশ দিয়ে অনেকখানি ফাটল, তার ভেতর জলের স্রোত চলেছে; বললেন: বুঝেছি, পাহাড় ধ্বসে যাচ্ছে, আর তোমরা আমাকে নিতে এসেছ। কিন্তু আমি যাব কেন? জীবনের প্রতি তো আমার কোন মোহ নেই।

তখনও বানর এবং হরিণটি তাঁর পায়ের কাছে এসে তাঁকে বাইরে নিয়ে যেতে অস্থিরতা প্রকাশ করছে। অকস্মাৎ শূন্য ভিক্ষা-পাত্রটির ওপর সাধুর দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে করুণার আভাস ফুটে উঠল, তাঁর মনে পড়ল শান্ত নিরীহ পল্লীবাসীদের কথা—যারা বহুদিন ধরে ভক্তির সঙ্গে তাঁর খাবার জুগিয়েছে। সাধকের মনের আকাশে একটি চিন্তা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে গেল; বললেন: আচ্ছা ভাই, দাঁড়াও, তোমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।

ভকত তখন ধুনির আগুনে একখানি কাঠ ভাল করে জ্বালিয়ে বাম হাতে নিলেন, হরিণকে উদ্দেশ করে বললেন: ভাই বড়শিং, আমার তো দুইখানি মাত্র পা, আমাকে সাহায্য করো।...এই বলে

ডান হাত দিয়ে হরিণের গলা জড়িয়ে ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলেন। নিবিড় অন্ধকার রাত্রি, তখনও বৃষ্টি পড়ছে। বানর আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে, প্রজা-পালনকারী একটি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী পূরণ দাস বাহাদুর চলেছেন দুর্যোগময় রাত্রিতে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে পল্লীর বাসিন্দাদের রক্ষা করতে। কিছুদূর নেমে এসে দেখা গেল সাধুর বন্ধুগণ তাঁর প্রতীক্ষায় এক জায়গায় সমবেত হয়েছে—বানরের দল, হরিণের পরিবারবর্গ, ভালুক ও

তার আত্মীয়-স্বজন। সাধু স্মিত হাসি হাসলেন : ও, তোমরা এখানে অপেক্ষা করছ, আর দুত পাঠিয়েছিলে আমায় খবর দিতে! বেশ, চলো।

ভকত আগে আর তাঁর পিছনে চলল বন্য বাহিনী। পল্লীতে পৌঁছে রাস্তার পাশেই কর্মকারের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিলেন। মানুষের গন্ধ পেয়ে বন্য জন্তুগুলো জড়সড় হয়ে রইল, ভালুক চাপা রোষ প্রকাশ করতে লাগল। ভকত বন্ধ দরজায় আঘাত করে বললেন : ভেতরে যারা ঘুমিয়ে আছ, ওঠ, শীগ্‌গীর উঠে পল্লীর আর সবাইকে ডেকে একত্র করো। পাহাড় ধ্বসে পড়বে, বেশি দেরী নেই। শীগগীর ছুটে

ঐ উপত্যকা পার হয়ে সামনের বড় পাহাড়টিতে গিয়ে আশ্রয় নাও। আমরা তোমাদের পিছনে পিছনে যাচ্ছি।

কর্মকারের স্ত্রী মশালের আলোকে জানালা দিয়ে জন্তু-পরিবেষ্টিত ভকতকে দেখতে পেয়ে তার স্বামীকে ঠেলে তুলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা পল্লীতে কলরব পড়ে গেল; সবাই দৌড়াদৌড়ি করে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে সমবেত হ'ল, তারপর নির্দেশমত উপত্যকার ভেতরকার ছোট অগভীর নদীটি পায়ে হেঁটে পার হয়ে সম্মুখের পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল। সঙ্গীদের নিয়ে ভকত চললেন পিছে পিছে। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে পাহাড়ের ওপর একটি দেবদারুগাছের নীচে হরিণটি স্থির হয়ে দাঁড়াল। ভকত বুঝলেন, স্থানটি নিরাপদ, বন্য জন্তুরা তা টের পেয়েছে। তিনি লোকদের ডেকে বললেন: তোমরা গ'ণে দেখ সবাই এসেছে কিনা; এখানেই অবস্থান করো।

কিছুক্ষণ নানা কণ্ঠে নাম ডাকার পালা চলল, দেখা গেল সবাই হাজির আছে। এর কিছু সময় পর থেকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা গর্জনের মত আওয়াজ শোনা গেল; ক্রমে তা বাড়তে বাড়তে কান-বধির-করা ভীষণ প্রলয়ংকর গর্জনে পরিণত হ'ল। পাহাড়-পর্বত থরথর করে কাঁপতে লাগল, পাইন দেবদারু বন প্রবল আলোড়নে আছাড়ি-বিছাড়ি করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক এইভাবে চলার পর অবস্থা শান্ত হ'ল। ভোর হলে দেখা গেল, সমগ্র পল্লী এবং মন্দির সমেত পাহাড়টি যেখানে ছিল সেখানে বসতি, গাছপালা বা পাহাড়ের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই—বিশাল এক সমভূমিতে কাদা ও জলের প্রান্তর; প্রায় দুই হাজার ফুট উঁচু ও দেড় মাইল দীর্ঘ পাহাড় ও তার সানুদেশ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে মিশে গেছে! সে বীভৎস দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘোরে।

কৃতজ্ঞ পল্লীবাসীরা ভোরের আলোকে তাদের প্রাণরক্ষাকারী ভকতকে প্রণাম করতে এল। একটি পাইনগাছের গুড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে তিনি পূর্বাস্য হয়ে যোগাসনে বসে আছেন, মুখমণ্ডল প্রশান্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, পাশে বড়শিং হরিণটি নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গাছের ডালে বানরগুলো মাথা নীচু করে চুপ করে আছে। পুরোহিত প্রথমে এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে হরিণটি গাছের আড়াল দিয়ে ছুটে বনের মধ্যে চলে গেল। পুরোহিত এসে দেখলেন, ভকতের দেহ স্থির, নিঃস্পন্দ। যোগাসনে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। পল্লীবাসীরা এসে করজোড়ে ঘিরে দাঁড়াল; শিশু-কোলে মহিলাদের গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল; এই নির্মল উষ্ণ অশ্রু ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উপহার। *

---

* রাডয়ার্ড কিপ্‌লিঙের একটি রচনা হতে উপাদানটুকু গৃহীত।

শ্রীপ্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দুষ্টু ছেলে, তুষ্ট কেন মিষ্টি মধু গল্পেতেই ?
খোকনমণি, সোনার খনি মিল্‌বে এত অল্পেতেই ?
মায়ের দিদিমায়ের বুকে নয়ন মুদে শয়ন সুখে,
হজম কর গুজবগুলো আজব যত জাল পেতেই ?
খোকনমণি, সোনার খনি মিল্‌বে এত অল্পেতেই ?

রাজার মেয়ে বিজন বনে বন্দী আছে কোন্ কারায়,
সোনার কাঠি ঘুমিয়ে রাখে, রূপার কাঠি ঘুম তাড়ায়।
একদা কোন্ রাজার ছেলে সাগরজলে উজান ঠেলে
দাঁড়ায় এসে বীরের বেশে, ঘুমটি ভাঙে সেই সাড়ায়,
অবুঝ খোকা, বোঝো না তুমি, তোমায় ওরা ঘুম পাড়ায় ?

জান্‌লা খুলে দেখ্‌তে যদি ঘট্‌ছে কী যে কাণ্ডটা,
দু'হাতে কারা দোহন করে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডটা।
দু'টি রুটির টুক্‌রো নিয়ে মানুষগুলো কর্‌ছে কী এ ?
সুধার লোভে, ক্ষুধার ক্ষোভে ভ'ঙে বিষের ভাণ্ডটা,
চক্ষু দু'টি খুল্‌তে যদি, দেখ্‌তে যদি কাণ্ডটা !

অনেক শেখা শিখেছ খোকা, একটু শুধু শিখ্‌লে না,
স্বপ্নে রাঙা মনের কোণে একটি লেখা লিখ্‌লে না।
ঠাকুরমা'র ঝুলিটি ঝেড়ে অনেক মধু নিয়েছ কেড়ে
নবাতর সভ্য যুগে তবুও বুঝি টিঁক্‌লে না,
মানুষে কেন মানুষ মারে, সেই কথা তো শিখ্‌লে না !
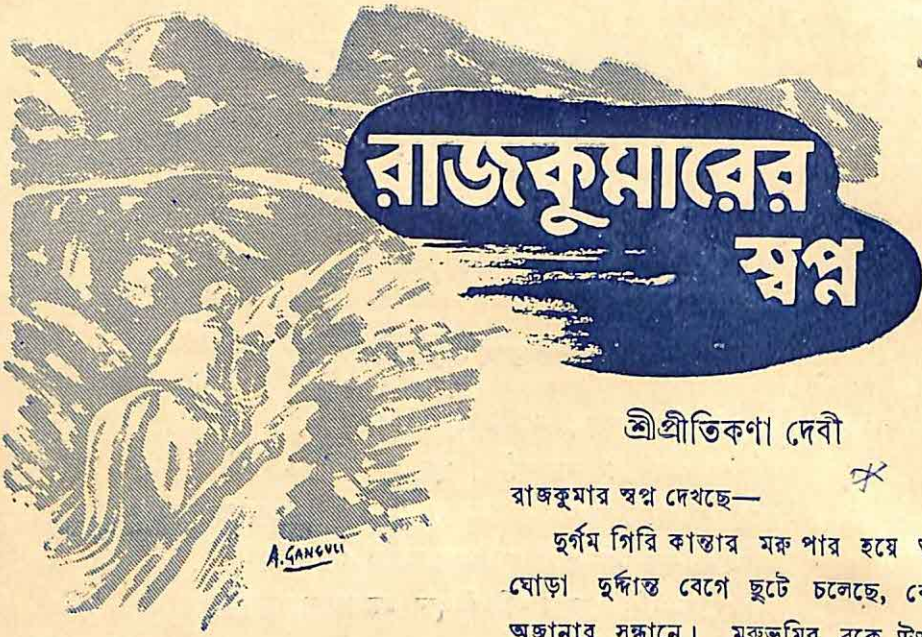
রাজকুমারের স্বপ্ন

শ্রীপ্রীতিকণা দেবী

রাজকুমার স্বপ্ন দেখছে—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে তার ঘোড়া দুর্দ্দান্ত বেগে ছুটে চলেছে, কোন্ অজানার সন্ধানে। মরুভূমির বুকে উড়ছে বালির ঝড়। উঃ—কি ভীষণ অন্ধকার। "মাগো!"—বলে আঁৎকে ওঠে রাজকুমার।

ঘুম ভেঙ্গে যায়। জানালা দিয়ে ভোরের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিছানায়। কাল রাতে চুরি করে সে পড়ছিল এক রোমাঞ্চকর কাহিনী—'পিরামিডের রহস্য'! ভারি মজার বই! সারা রাত স্বপ্ন দেখেছে ও—মরুর দেশের সব রোমাঞ্চকর ব্যাপার!

আজ রবিবার।

কোন রকমে মুখ ধুয়ে খাবারের সন্ধানে হানা দিল রান্নাঘরে। মুখে গুণ-গুণ করে সুর ভাজছে—'আয়ে গা—আয়ে গা'। জলের ঘটিটা পায়ের দাপটে ছিটকে পড়ে দূরে। ছোট খুকী খাওয়া ভুলে ভয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। চারধারে ওঠে বকুনীর ঝড়!

ওর তাতে ভারি বয়ে গেছে! কোন রকমে গোটা চারেক পরোটা ও আলুর দম গিলে, বাড়ী থেকে দে—ছুট!

রবিবারটা বাস্তবিক বড় মজার দিন! দল বেধে সিনেমায় চল। নয় তো 'ঢাকুরিয়া' বা 'যাদবপুর' বন্ধুর বাড়ীতে চড়ুইভাতির নিমন্ত্রণ! মজাসে কাটিয়ে এস! মাষ্টার মশাইর বকুনী দাদার চোখ রাঙানী, বুড়ী ঠাকুরমার বকাবকি—কোন কিছুর ঝামেলা নেই। আর পয়সা তো মার কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। বাজার খরচের থেকে একটি টাকা মাকে দিতেই হয়। হিসাব দেবার সময় বাড়ীর কর্ত্তা বকাবকি করবেন, বেচারী মাকেই সামলাতে হবে সে ঝক্কিটা! সেবার রাঙাদির শ্বশুর-বাড়ীতে দু'দিন কাটিয়ে এল। উঃ, সে কি খাতির! তা'ছাড়া রাঙাদি একটা টাকা হাতে দিয়ে চুপি চুপি বলেছিল—"আবার আসবি ভাই!" চোখে সকরুণ মিনতি! পয়সা জমাবার

ছোট বাক্সটিতে টপ করে টাকাটা ফেলে দেবে ভেবে রেখেছে, পরদিন বাজী ধরে বন্ধুদের খাওয়াতে গিয়ে টাকাটা গেল। কাজের সময় বাক্সটা ধরে ঝাকুনি দিলে গোটা কতক তামার পয়সা ঝনঝন করে ওঠে। এতে মন খারাপ লাগে বই কি!

যাক্, রবিবারে অনেক কিছু করবে বলে ভেবে রাখ! কিন্তু কাজের বেলায় উল্টো হয়ে দাঁড়ায়।

এই রাজকুমারের কথাই ধরো। বড়লোকের ছেলে। ভারি সুন্দর দেখতে ওকে। তার জন্যই তো ঠাকুরমা আদর করে নাম দিয়েছেন—'রাজকুমার'!

লেখাপড়ায় বেশ ভাল, আর দুষ্টু সে তোমাদের চেয়ে খুব বেশী নয়; কিন্তু বাড়ীতে ওকে কেউ ভালবাসে না। ওইটুকু ছেলে, মিথ্যা কথা বলতে ওস্তাদ। বাড়ীর সবাই দিনরাত বকে ওর এই স্বভাব বদলাবার জন্য, কালো কোকড়ান চুলগুলো হিচড়ে টেনে ধরে বড়দা ধমকায়—"বল্ আর মিথ্যা কথা বলবি না!"—

"বাঃরে—মিথ্যা কথা বলছি নাকি?"—রাজকুমার প্রতিবাদ জানায়।

"হতভাগা—মিথ্যুক!"—বড়দা আর একটা গাট্টা বসিয়ে দেয় ওর মাথায়।

ঝগড়া হলে বন্ধুরা গালাগালি দেয়—"দূর মিথ্যাবাদী!"

রাজকুমার হাসে মিটিমিটি।

ও কি করবে বল? সত্য কথা বলতে গেলেও, অভ্যাসের দোষে ধা করে মিথ্যেটাই বেরিয়ে পড়ে ওর।

তার মাষ্টার মশাই অবনীদা একদিন হেসে বলেছিলেন—"উঃ! কি মিথ্যে কথা বলতে পারিস্ তুই!" যে অবনীদা সব চেয়ে ভালবাসেন তাকে তিনি বললেন একথা! ওর ভারি দুঃখ হোল।

অবনীদা তো আপনমনে বই পড়ে চলেছেন। হঠাৎ খেয়াল হোল। কাছে টেনে নিলেন দু'হাতে—"এত বোকা কেন রে তুই? একথা শুনে কাঁদছিস্? বড় হয়েছিস্, এখন মিথ্যে বল্‌বি কেন? ভাল ছেলে হবি, সবাই যাতে ভাল কয় সে ভাবে চলবি। মানুষের মত মানুষ হবি।"

কি ভালই লাগত তাকে। সিঁড়ির ধারে ছোট একটা ঘরে থাকতেন তিনি। ওদের পড়াতেন। আবার নিজেও কলেজে পড়তেন। আর দিনরাত খাতায় কি সব লিখতেন। পটলা ওরা বলেছে—"অবুদা নাকি কবিতা লেখেন।" কবিরা খুব বিদ্বান হয়, ও জানে। অবুদাও তো কত বিদ্বান ছিলেন। মোটা মোটা ইংরেজী বই পড়তেন। দেশ-বিদেশের কত মজার গল্প শোনাতেন ওদের। সে বড় হলে সে সব বই পড়বে, অবুদা বলেছেন। সেবার অবুদার কি অসুখ হোল। ছোট ছেলেদের তার ঘরে যেতে দিত না। রাজকুমার কত চেষ্টা করেছে, একবার উঁকি মেরে দেখতে, কিন্তু পারেনি। হাসপাতালে নিয়ে গেল গাড়ীতে করে। পরদিন নূতন মাষ্টার মশাই এলেন পড়াতে। সবাই বলল, অবুদা ভাল হয়ে বাড়ী চলে গেছেন। এতদিনে রাজকুমার বুঝতে পেরেছে,—ওরা মিথ্যা কথা বলেছে, অবুদা মারা গেছেন……

সেদিন বাড়ীর সবাই গেছে সিনেমায়।

রাজকুমার ও তার সঙ্গীরা মিলে জুটল অবুদার ঘরে। আজ একটা নূতন খেলা খেলবে তারা। ধুলোভরা টেবিলটা ঝেড়ে পুছে নিয়ে, মাঝখানে বসিয়ে দিল অবুদার একটা পুরানো ফটো। একটা বেলফুলের মালা ও গোটা দুই মোমবাতি, ন্যাড়া কোথা থেকে যোগাড় করেছে।

ধূপকাঠি জ্বলছে। ছোট ঘরখানা সুগন্ধে ভরে উঠল। বাড়ীর সব ছোটরাই সেখানে। এমন কি পুষি বেড়ালটাও সভার একধারে এসে বসেছে। ওদের পাড়ায় সেদিন একটা শোকসভা হয়ে গেছে। সে কথা ওদের বেশ মনে আছে। সমবেত কণ্ঠে 'রামধুন' গাওয়া হোল।

প্রার্থনার পর বক্তৃতা। প্রথমে উঠল ন্যাড়া। অবুদার কথা ও যতটুকু জানে, ততটুকুই বেশ গুছিয়ে বলল। তিনি যে তাদের বিস্কুট খাওয়াতেন সে কথাও বলতে ভুল হোল না। তারপর পটলা। ওরা হাততালি দিল ঘন ঘন। এবার উঠল রাজকুমার। একটু ভেবে নিয়ে ও বলতে সুরু করে—"অবুদা! তুমি যে লাট্টুটা আমাকে কিনে দিয়েছিলে, ওটা আমি হারাইনি। আমার এক বন্ধু—ওরা ভারি গরীব কিনা, ওর কোন খেল্‌না নেই, তাই ওকে দিয়ে দিলাম। বাড়ীতে মিথ্যা করে বলেছি, ওটা হারিয়ে গেছে। তোমার কাছে সত্য কথা বলছি। আর বড়রাও মিথ্যে কথা বলে, জান অবুদা! তুমি মরে গেছ, ওরা বলল, ভাল হয়ে গেছ। কেন, সত্য কথা বললেই তো হোত! আমি তো কাঁদতাম না। তোমার সব কথাই আমার মনে আছে। আমি আর মিথ্যে কখনও বলব না, আমি ভাল হব, বড় হব, মানুষ হব।"

রাজকুমারের গলা ধরে আসে। ওর দু'গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।...

রাজকুমার শুধু ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখত না। ওর মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে সব চেয়ে সুন্দর স্বপ্ন—বড় হব, মানুষ হব, সত্যকে আঁকড়ে থাকব!

তোমরা কি চাও না এই দুষ্টু ছেলে রাজকুমারের বন্ধু হতে?—

পরমাণবিক বোমা

শ্রীআদিনাথ সেন

রথের সময় ছেলেদের হাতে ফট্‌কার খুবই ব্যবহার হয়। ইহা একটি সরু ছিদ্রওয়ালা বাঁশের চোঙ্‌ এবং একটি হাতলযুক্ত কাঠি, যাহা ছিদ্রে সহজে ঢোকে এবং লম্বায় চোঙ্‌ হইতে সামান্য ছোট। ছিদ্রের মাপ মত শক্ত কোন বুনো ফল ছিদ্রে পুরিয়া কাঠি দিয়া প্রথমে ঠেলিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় আরেকটিও ঐভাবে ঠেলিলে, ভিতরের বায়ুর চাপে প্রথমটি সশব্দে বাহির হইয়া যায়। সংকুচিত
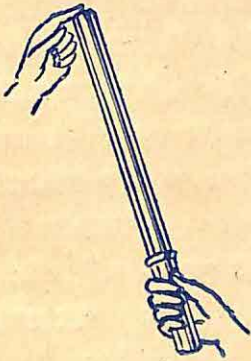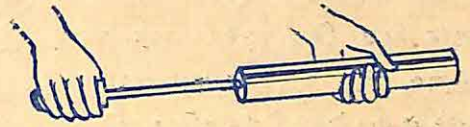
বায়ুর হঠাৎ প্রসারণে প্রথম ফলটি ছুটিয়া যায়। বাইসিকলের পাম্পের মুখে আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া রাখিয়া হাতল চালাইলে, এই চাপের পরিচয় পাওয়া যায়। বন্দুক ছোঁড়াও প্রায় এই ব্যাপার। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইবার ন্যায়, আঘাতে বা ঘষাতে, বারুদ জ্বলিয়া অকস্মাৎ বায়ুর (গ্যাসীয়) আকার ধারণ করে এবং প্রসারিত হয়। বন্দুকের নলে বারুদ পুরিয়া, তাহার উপর হাল্‌কা জিনিস চাপাইয়া বন্দুক ছুঁড়িলে ফাঁকা আওয়াজ হয়। সীসা ইত্যাদি ভারী জিনিস চাপাইলে, উহা ছিট্‌কাইয়া গিয়া ধ্বংস সাধন করিতে পারে। দেওয়ালী বা বিবাহাদি উপলক্ষে শুধু আওয়াজের জন্য ছোট-বড় বোমার ব্যবহার সুপরিচিত।

পলিতায় আগুন লাগাইয় দিলে, ক্রমে আগুন বদ্ধ জায়গার বারুদে পৌঁছে এবং অকস্মাৎ প্রসারণে সশব্দে বোমা ফাটাইয়া দেয়। বারুদের সঙ্গে কঠিন পদার্থ রাখিলে, উহা
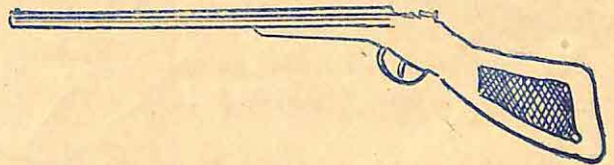
ছিটকাইয়া গিয়া ধ্বংস সাধনও করিতে পারে। যুদ্ধে এই প্রকার হাতবোমার ব্যবহার আছে; মাটিতে পড়িবার আঘাতেই ইহার বিস্ফোরণ হয়। তামাসার বোমার বেলাও নিরাপদ স্থানে

সরিয়া যাওয়া দরকার। সেই নিমিত্ত ইচ্ছামত লম্বা পলিতা ব্যবহার করিয়া বিস্ফোরণ বিলম্বিত করা যায়। ঘড়িতে যেমন এলার্ম কাঁটা যথাস্থানে ঘুরাইয়া ইচ্ছামত এলার্ম বাজান যায়, সেই রকম ভাবে ইচ্ছামত সময়ে আঘাতে বা ঘর্ষণে বোমা ফাটান যায়। যুদ্ধে শত্রুর আগমনের পথে অথবা ভবিষ্যৎ আবাসস্থানে এইরূপে বোমার লুক্কায়িত ব্যবহার হয়। বোমা কামানের গুলির মত অথবা উড়োজাহাজ হইতে ছাড়িয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে ফেলান যায়। ইচ্ছামত উচ্চতায় বিস্ফোরণ করাইয়া আঘাতের পরিমাণ, প্রখরতা বা বিস্তৃতি নির্দিষ্ট করা যায়।
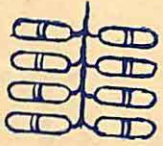
এই তো হইল তামাসায় বা যুদ্ধে বোমার ব্যবহার। বারুদের উপাদানগুলি যতই দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকিবে এবং ক্রিয়া যতই দ্রুত হইবে, বিস্ফোরণ ততই ফলপ্রদ অর্থাৎ ভীষণ হইবে। কারণ, হাল্‌কা ভাবে স্থিত পদার্থকে ছড়ান সহজ, কিন্তু দৃঢ়ভাবে যুক্ত পদার্থ ছিট্‌কাইয়া দেওয়া কঠিন হইলেও, ফলে অধিকতর ধ্বংস সাধন করিবে। বোমার গড়ন অবশ্য কার্যনৈপুণ্যের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু উপাদানগুলি যতই সহজপ্রাপ্য হইবে এবং নির্মাণ সরল হইবে, ততই ইহার ব্যবহার সহজ হইবে।
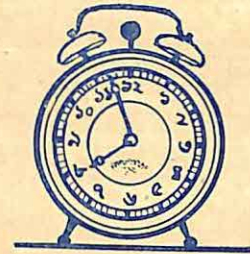
লৌহের মরিচা পড়া, কয়লা পোড়ান, বাজী ছোড়া যদিও একই প্রকার ক্রিয়া (যাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলে), তথাপি ইহাদের কার্যের বৈষম্য সহজেই দেখা যায়। লৌহের মরিচা অতিশয় আস্তে আস্তে পড়ে, কয়লা পুড়িতেও কিছু সময়ের দরকার, কিন্তু বারুদ অকস্মাৎ জলিয়া উঠে। উত্তাপের পার্থক্যেও এইরূপ তফাৎ —লৌহের বিলম্বিত ক্রিয়ায় উত্তাপ বোঝাই যায় না। কয়লা যথেষ্ট উত্তাপের পরিচয় দেয়। বারুদ অকস্মাৎ ভীষণভাবে জলিয়া উঠে। উত্তাপ দ্বারাই শক্তির উদ্ভবের পরিচয় পাওয়া যায়।
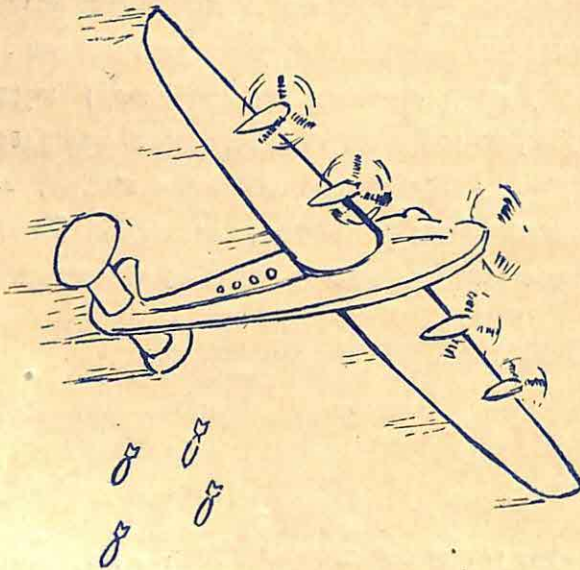
পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, কতকগুলি মৌলিক (যাহা আর অন্য কোন পদার্থে ভাগ হয় না) পদার্থে গঠিত। এগুলিকে ক্রমাগত ভাগ

করিতে থাকিলে, ৯২টি বিশিষ্ট প্রকারের সূক্ষ্ম সমষ্টিতে পৌছান যায়। ইহাদের পরমাণু বলা যায়, এবং এক বা বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সংযোগকে অণু বলা যায়। ইহারা এতই সূক্ষ্ম যে, ইহারা যে কেবল সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে তাহাই নহে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যতদূর দৃষ্ট হয়, ইহারা তাহারও বাহিরে থাকে। একটি চুলের প্রস্থে ৫০,০০০ পরমাণু থাকিতে পারে। অথচ, পৃথিবীর ৫ লক্ষ রকম পদার্থ ইহাদেরই ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি ; যেমন, জলের অণু ২টি হাইড্রোজেন ও ১টি অক্সিজেন পরমাণুতে গঠিত। বাতাসে অন্য গ্যাসের সহিত এই অক্সিজেন আছে এবং আমাদের নিশ্বাসে প্রবাহিত হইয়া জীবিত রাখে। অণু-পরমাণুর যোগাযোগেই (বিশেষতঃ অক্সিজেন যোগে) উপরোক্ত দৃষ্টান্তের ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হয়। একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এই সব ক্রিয়ায় অণু-পরমাণুগুলি পূর্ণভাবেই অংশ নেয় এবং শক্তির বা তেজের উদ্ভব, বিভিন্ন পরিমাণের উত্তাপ ও আলোর বিকাশে প্রতিপন্ন হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কেহ কখনও অণু-পরমাণু প্রত্যক্ষভাবে দেখে নাই, অথবা মাপিতে পারে নাই। অথচ অতি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাদের ওজন, ব্যবহার, গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তথ্যই অজানা নাই। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত অণু-পরমাণু আর ভাগ হয় না, এই বিশ্বাস

হাইড্রোজেন অক্সিজেন জল

পরমানু

অনু

দুইটি পরমানু সংযোগে

দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন সংযোগে

ইহারা সকলেই মৌলিক পদার্থ ও সূক্ষ্মতম অংশ।

বলবৎ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ৯২ রকম পরমাণু ৩টি অতি সূক্ষ্ম কণাদ্বারা গঠিত। একটি বড় ঘরে একটি ধূলিকণা..যতটুকু স্থান জুড়িয়া থাকে, একটি পরমাণুর মধ্যে এই কণাগুলিও প্রায় ততটুকু স্থান জুড়িয়া থাকে—ভিতরে থাকে অধিকাংশ খালি জায়গা। কণা কতক দেখা যায় এবং

সকলগুলিই মাপা যায় এবং পরমাণুর আকার-প্রকার ইহাদের থেকেই অনুমিত হয়। রেডিয়াম নামক ধাতু হইতে কণার আলো বাহির হইতে দেখা যায়। ঘড়ির কাঁটা বা ঘণ্টা মিনিটের দাগ, রেডিয়াম লাগান থাকাতে রাত্রে দেখা যায়। এই কণাগুলি ইলেকট্রন্, প্রোটন ও নিউট্রন্ নামে অভিহিত। ইহাদেরই অল্প কয়েকটির সংযোগে আরও কয়েকটি যুক্ত কণা (যেমন ট্রিটিয়াম) ও বিভিন্ন সংখ্যার সংযোগে ও বন্দোবস্তে ৯২টি পরমাণুর সৃষ্টি হয়। প্রতি পরমাণুতে কতকগুলি প্রোটন ও নিউট্রন্ একটি কেন্দ্রে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে, যাহার চারিদিকে ইলেকট্রন্‌গুলি বৃত্তাকারে বিভিন্ন পথে বেগে ঘুরিতে থাকে। হাল্‌কা পরমাণুর দিকে কণাগুলি দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকিলেও, কণারই আঘাতে পরমাণু ভাঙ্গা যায়। কোন কোন ভারী পরমাণু আপনা-আপনি কণা বিকীরণ করিয়া নিজেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ইহার ফলে বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই ভঙ্গুনীতে অসম্ভব রকম শক্তির উদ্ভব হয়, যাহা পূর্বোক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি হইতেও লক্ষগুণ বেশী।

পরমানুর গঠন
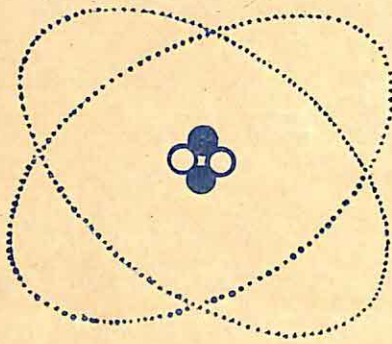
কেন্দ্রে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন্ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। চতুর্দিকে ২টি ইলেক্‌ট্রন বেগে ২টি পথে ঘুরিতেছে। ইহা হিলিয়াম—সাধারণ পরমাণুর নমুনা। আল্‌ফা কণা হিলিয়ামের কেন্দ্রবস্তু—ইলেক্‌ট্রন বাদে। সর্বাপেক্ষা সরল হাইড্রোজেন পরমাণুতে কেন্দ্রে একটি প্রোটনের চারদিকে একটি ইলেক্‌ট্রন্, একটি পথে ঘোরে। সর্বাপেক্ষা ভারী ইউরেনিয়াম পরমাণুতে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন্ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত কেন্দ্রের চতুর্দিকে ৭টি খোলসে ৯২টি পথে ৯২টি ইলেক্‌ট্রন্ বেগে ঘুরিতেছে। বিশুদ্ধ কার্যকরী ইউরেনিয়ামে, ৯২টি প্রোটন, ১৪৩টি নিউট্রন্ ও ৯২টি ইলেক্‌ট্রন্। প্লুটোনিয়ামে ৯৪টি প্রোটন, ১৪৫টি নিউট্রন্ ও ৯৪টি ইলেক্‌ট্রন্ আছে।

এই পরমাণুর রূপান্তর একটি নূতন আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলও হইতেছে সুদূর-প্রসারী। বহু শতাব্দী ধরিয়া অন্য ধাতুকে সোনায় পরিবর্তনের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কারণ কণা তখন অজ্ঞাত ছিল এবং পরমাণু না ভাঙ্গিয়া রূপান্তর সম্ভব নহে। এই রূপান্তরের ফলে একদিন হয়ত 'ক্ষ্যাপার পরশমণি খোঁজা' এবং তাহা দিয়া লোহাকে সোনা করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

আর একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাঙ্গুনীতে অথবা কণা সংযোগে নূতন পরমাণু গঠিত হইলে ওজনের ঘাটতি হয়। একটি ফল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলে, টুকরাগুলির ওজন ফল হইতে কম, অথবা ঘুঁগনি প্রস্তুত করিলে উপাদানগুলির ওজন অপেক্ষা ঘুঁগনির ওজন কম, এই দুই রকম অসম্ভব পরিস্থিতি দেখা যায়। সামান্য ঘাটতির অংশ (প্রকৃতপক্ষে পদার্থ মাত্রেই) বিশাল শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ পরমাণবিক বোমায়। ভারী ধাতু ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম (কৃত্রিম), নিউট্রন্-কণার আঘাতে বোমায় বিস্ফোরণ হয়। খনিজ দ্রব্য হইতে কার্যকরী ইউরেনিয়াম পৃথক্ করা অথবা প্লুটোনিয়াম তৈয়ারী করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য, এবং ইহা বহুকষ্টে ও বহু

আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে নলটি উল্টে ফেলে খোলা মুখটি যদি জলের মধ্যে দিয়ে আঙ্গুল সরিয়ে নিই, তা'হলে তোমরা দেখবে, নলের ভেতরের জল কিছুমাত্র নীচে পড়ে যাবে না। নলের নীচের দিকের মুখটা খোলা থাকা সত্ত্বেও, নলটি জলে ভর্ত্তিই থাকবে। এর কারণ পঁচিশ ফুট উঁচু জলের চাপ আমাদের সাধারণ বায়ুচাপের চেয়ে কম। প্রায় চৌত্রিশ ফুট উঁচু জলের চাপ সাধারণ বায়ুচাপের সমান। তার মানে, নলটা যদি চৌত্রিশ ফুটের চেয়ে লম্বা হয়, তখন উপযুক্ত পরিমাণে জল বের হয়ে গিয়ে সেই চৌত্রিশ ফুট মাত্র জল নলের মধ্যে থেকে যাবে। অবশ্য বায়ুচাপ কম-বেশী হলে এই জলের উচ্চতাও কম-বেশী হবে। চৌত্রিশ ফুটের ওপর যে শূন্যস্থান জলের মধ্যে থেকে যাবে, তা সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য। জল না ভরে যদি নলের মধ্যে পারদ (mercury) পুরি, তা'হলে, পারদ জলের চেয়ে প্রায় চৌদ্দ গুণ বেশী ভারী বলে, বাইরের বায়ুচাপ এই পারদের মাত্র তিরিশ ইঞ্চি ভার ধরে রাখতে পারবে। এই পারদের উচ্চতার পরিবর্ত্তনে বাইরের বায়ুচাপের পরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট হবে। সাধারণ বায়ুচাপ মোটামুটি ভাবে তিরিশ ইঞ্চি ধরা হয়। মেঘ সাধারণ বাতাস অপেক্ষা হাল্কা, তাই বাতাসে মেঘের সমারোহ হলে, বায়ুচাপ যায় কমে। ব্যারোমিটারে কম বায়ুচাপ দেখা গেলেই বৃষ্টির পূর্ব্বাভাস পাই আমরা।
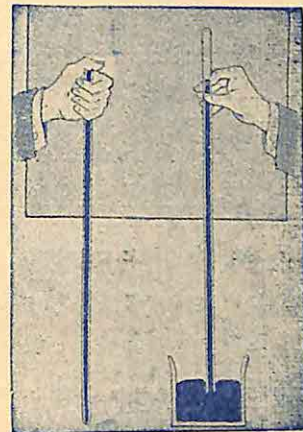
এই ব্যারোমিটার যন্ত্র যখন বায়ুচাপের পরিবর্ত্তন একটা কাগজের ওপর ক্রমাগত দেগে দিতে থাকে, তখন সেই যন্ত্রকে বলি আমরা ব্যারোগ্রাফ্।

দিনরাতের মধ্যে উত্তাপ কখন সবচেয়ে বাড়লো, আর কখন আবার সব চেয়ে কমলো, জানতে হলে আমাদের সারা দিনরাত বসে থারমোমিটার পাহারা দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে। এ অসুবিধা দূর করবার জন্য দু'ধরনের থারমোমিটারের ব্যবহার চলে। একটা পারদ পোরা থারমোমিটার—এটা দিয়ে দেখা হয় বাতাসের উত্তাপ সবচেয়ে বেশী বাড়লো কখন। যত উত্তাপ বাড়তে থাকে, পারদ এই থারমোমিটারের বল দিয়ে তত উঠতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বলের মধ্যে একটা ইস্পাতের টুকরোও উঠতে থাকে। উত্তাপ কমে গেলে পারদ নীচে নেমে আসে, কিন্তু ইস্পাতের টুকরোটি আগের জায়গাতেই থেকে যায়। এই ইস্পাতের টুকরোটি কোথায় রয়েছে দেখলেই বুঝা যায়, উত্তাপ সব চেয়ে বেশী উঠেছে কত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সবচেয়ে বেশী টেম্পারেচার দেখা হয়ে গেলে, ইস্পাতের টুকরোটিকে আবার নীচে নামিয়ে দেওয়া হয় একটা চুম্বকের সাহায্যে।

দ্বিতীয় থারমোমিটারটি এ্যাল্কোহল (alcohol) দিয়ে ভর্ত্তি। এটা দিয়ে দেখি টেম্পারেচার সবচেয়ে নামলো কত। এ্যাল্কোহলের মধ্যে এক টুকরো ফাঁপা সূক্ষ্ম কাঁচের ডাম্বেলের আকৃতির

সূচক থাকে। উত্তাপ যত কমে এ্যাল্‌কোহল সঙ্কুচিত হয়ে থারমোমিটারের বল দিয়ে তত নীচে নামতে থাকে। এ্যাল্‌কোহল নিজের সঙ্গে এই সূচকটিকেও টেনে নিতে পারে। উত্তাপ যখন বাড়ে, তখন এ্যাল্‌কোহল অনেক পাতলা বলে, সেটা এই সূচকটির পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, ক্ষুদ্র কাঁচের সূচকটি আগের জায়গায় থেকে যায়। এ থেকেই সবচেয়ে কম টেম্‌পারেচার নির্দ্ধারিত হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সবচেয়ে কম টেম্‌পারেচার দেখা হয়ে গেলে, এই এ্যাল্‌কোহল থারমোমিটারে ওই সূচকটিকে আবার এ্যাল্‌কোহলের ওপর তুলে দিতে হয়। যন্ত্রটি একটু কাৎ করে ধরলেই সূচকটি যথাস্থানে চলে আসে।
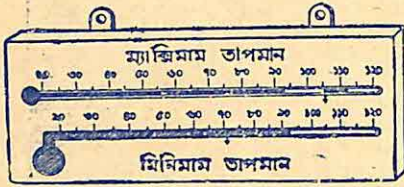
বায়ুর উত্তাপ সাধারণতঃ যা আমরা এই থারমোমিটার দিয়ে দেখে থাকি, তা সব সময়ই ছায়ায় দেখা হয়। রৌদ্রে রাখলে সূর্য্যকিরণ পড়ে থারমোমিটারে টেম্‌পারেচার দেখাবে অনেক বেশী।

ব্যারোগ্রাফের মত থারমোগ্রাফেরও চলন আছে বড় বড় আবহাওয়া দপ্তরে। তাপের তারতম্য একটা কাগজের ওপর ক্রমাগত দেগে দিতে থাকে যে যন্ত্র তাকেই বলি থারমোগ্রাফ।

বাতাসের আর্দ্রতা বা বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জানবার জন্য হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই যন্ত্রে আছে দুটো থারমোমিটার। একটা সাধারণ, আর একটা একটু অসাধারণ। দ্বিতীয় থারমোমিটারের বাল্বের (bulb) গায়ে জড়ানো থাকে এক টুকরো ভিজে ন্যাকড়া। বায়ুতে জলীয় বাষ্প যত কম থাকে, ঐ ন্যাকড়া তত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় আর থারমোমিটারের বাল্ব (bulb) ঠাণ্ডা হয়। এর ফলে এই দ্বিতীয় থারমোমিটারে প্রথম থারমোমিটারের তুলনায় তাপ দেখায় কম। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকলে, ন্যাকড়া শুকায় দেরীতে, উত্তাপও তেমন বেশী কমে না। এই ভিজে ন্যাকড়া জড়ানো থারমোমিটারের তাপের সঙ্গে অপর সাধারণ থারমোমিটারের তাপের পার্থক্য যত কম, বায়ুর আর্দ্রতা তত বেশী। এর জন্য একটা তালিকা করা থাকে। যে কোন সময় এই থারমোমিটার দুটির উত্তাপ দেখেই বাতাসে জলের পরিমাণ সহজেই বলে দেওয়া চলে। ব্যারোগ্রাফ কিংবা থারমোগ্রাফের মত হাইগ্রোগ্রাফেও বাতাসের আর্দ্রতার পরিবর্ত্তন দেগে দেওয়া চলে।
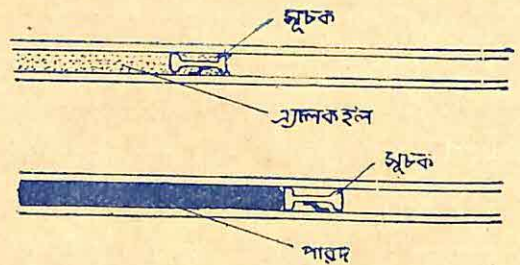
আবহাওয়া বিজ্ঞানে যত যন্ত্র আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ সরল হলো বৃষ্টি মাপবার যন্ত্র। সাধারণতঃ একটা লম্বা চোঙের (cylinder) ওপর তার মুখের ব্যাসের সমান একটি 'ফ্যানেল' এভাবে বসানো থাকে যে, চোঙের মুখে যেটুকু বৃষ্টির জল পড়বে, তা সমস্তই ওই ফানেলের মধ্য দিয়ে পড়ে

চোঙ্গের মধ্যে জমা হতে থাকে। এই যন্ত্রটা কোন উন্মুক্ত জায়গায় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচুতে এমনভাবে রাখা থাকে, যাতে ঠিক বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য কোন জল তার মধ্যে না গিয়ে পড়ে। নির্দ্দিষ্ট সময় পর পর ঐ চোঙ্গের মধ্যে কত জল জমা হলো, তাই চোঙ্গের গায়ে দাগ অনুসারে মেপে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বলে দেওয়া হয়। পাত্রের মুখে ফানেল থাকায় সঞ্চিত বৃষ্টির জল সহজে বাষ্পীভূত হতে পারে না। এই সহজ উপায়ে আমরা প্রত্যেক দিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানতে পারি এবং সারা বছরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যোগ করে, এক বছরে স্থানীয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বলে থাকি।

এই তো গেল বিভিন্ন যন্ত্রের কথা। এ ছাড়া আছে আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্নসন্ধানী একজোড়া চোখ। আকাশপানে তাকিয়ে তাঁরা আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস জানবার প্রয়াস পান। বিভিন্ন পর্য্যায়ের মেঘগুলোর জাতধর্ম্ম জানা আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের একটা মস্ত কর্ত্তব্য।

এই সব আবহাওয়া গবেষণা সবই চলে মাটির ওপর এবং মাটির কাছে আকাশরাজ্যে। কিন্তু মাটির বহু উঁচুতে আকাশের মধ্যে আবহাওয়ার কি খেলা চলছে, তাও তো জানতে হবে আমাদের। এর জন্যও বিজ্ঞানীরা উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাই এবার বলি তোমাদের।

মেলায় যেসব বেলুন বিক্রী হয়, তাদের মধ্যে কতকগুলো দেখবে খুব লম্বা সুতো দিয়ে বাঁধা। ফেরীওয়ালা সুতোর গোড়াগুলো হাতে শক্ত করে ধরে রাখে, আর বেলুনগুলো সব উড়তে থাকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। ভিড়ের মধ্যেও অনেকদূর থেকে এ বেলুনগুলোকে দেখা যায়। এগুলোতে হাওয়া না ভরে, ভরা থাকে খুব হাল্কা গ্যাস হাইড্রোজেন। তাই তারা সব সময়ই চায় ওপরদিকে উঠতে। বেশ খানিকটা লম্বা সুতো বেঁধে বেলুনটাকে ছেড়ে দিলে অনেক—অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে সেটা। হঠাৎ হাত ফস্কে যদি সুতোটা ছেড়ে যায়, বেলুনটা অমনি দিব্যি ওপরে উঠতে উঠতে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

ওপরকার আকাশে বাতাসের গতি এবং বেগ একটা অতি প্রয়োজনীয় খবর। এটা জানবার কায়দাটা বলি। মেলায় যে সাইজের বেলুন বিক্রী হয়, তার চেয়ে অনেক বড় একটা বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরে, তার মুখটা একটা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এই দড়ির আর এক মুখে বাঁধা থাকে ঘুড়ির মত একটা কাগজ। বেলুনটাকে ছেড়ে দিলেই সেটা আকাশে উঠতে থাকে সোঁ-সোঁ করে। বেলুনটাকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্টপ্‌ওয়াচ (ঘড়ি) চালিয়ে দেওয়া হলো। বেলুনটা ছাড়ার ঠিক আধ মিনিট পরে থিয়োডিলাইট্ বা বিশেষ ধরনের একটা দূরবীন দিয়ে বেলুনটাকে যদি দেখা যায়, তা'হলে দেখা যাবে, বেলুনটা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে যাওয়া ছাড়া, সেটা সরেও গেছে যেখান থেকে ছাড়া হয়েছিল সে জায়গাটার থেকে, অর্থাৎ একেবারে সোজা মাথার ওপরে নেই। বাতাসের গতি অনুযায়ী বেলুনটা এদিক ওদিক সরে যেতে থাকবে। দূরবীনটা থাকে একটা 'তেপায়ার' ওপর দাঁড় করানো, বেলুনটাকে নজরে রাখতে গিয়ে দূরবীনটা কতখানি কোন্‌দিকে হেলানো হচ্ছে তা অনায়াসে জানা যেতে পারে, এবং এই থেকেই বেলুনটা কোন্‌দিকে এবং কতখানি

উঁচুতে যাচ্ছে বলা সহজ হয়। এইভাবে প্রত্যেক আধ মিনিট অন্তর যদি বেলুনটাকে দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য করা যায়, তা'হলে সেই জায়গার ওপরকার বিভিন্ন বাতাসের স্তরের গতি এবং বেগ সম্বন্ধে আমরা সঠিক খবর জানতে পারবো।

আকাশের খবর এইভাবে জানবার একটা মস্ত অসুবিধা রয়ে গেছে। আকাশে মেঘ থাকলে, কিংবা স্থানীয় জায়গাটাতে খুব কুয়াসা হলে, বেলুন ছাড়া এবং সেটাকে দূরবীন দিয়ে নজর করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য বেতারের সাহায্য নেওয়া হলো। আকাশের খবর জানবার জন্য সাধারণতঃ যে হাইড্রোজেন-ভর্তি বেলুন ছাড়া হয়, তাকে বলে পাইলট্ বেলুন। এই পাইলট্ বেলুনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় একটা হাইড্রোজেন-ভর্তি বেলুনের সঙ্গে বাঁধা থাকে ছোট্ট একটা বেতার প্রেরক-যন্ত্র। এ ছাড়া থাকে থারমোমিটার, ব্যারোমিটার এবং হাইগ্রোমিটার—সব কটা যন্ত্রই ছোট হাল্কা সংস্করণের। বেলুনটা যখন ওপরে উঠতে থাকে, ছোট্ট এই বেতার প্রেরক-যন্ত্রটা তার আকাশ-তার দিয়ে বৈদ্যুতিক বেতার-ঢেউ পাঠাতে থাকে আপনা-আপনি। মাটির ঘাঁটিতে একটা গ্রাহক-যন্ত্রে ওই প্রেরক-যন্ত্রের নির্দ্দেশমত একটা কাঁটা দেগে দেয় বিভিন্ন স্তরের নানা রকম খবর। বাতাসের চাপ, উত্তাপ এবং আর্দ্রতা মাপবার জন্য যে যন্ত্রগুলো থাকে, সেগুলো ওই ছোট্ট বেতার-প্রেরক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মিনিটে বিভিন্ন বাতাস-স্তরের ভেতর দিয়ে উঠতে উঠতে তাদের খবর জানিয়ে দেয় মাটির গ্রাহক-যন্ত্রকে। এখানে কুয়াসা, মেঘ, অন্ধকার এসবের বাধা নেই কিছুই, কারণ বেলুনটাকে তো আর দূরবীন দিয়ে নজর করতে হচ্ছে না এখন। সব কিছু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে বেতার-ঢেউ ঠিক এসে হাজির হচ্ছে গ্রাহক-যন্ত্রে। এইসব বেলুন
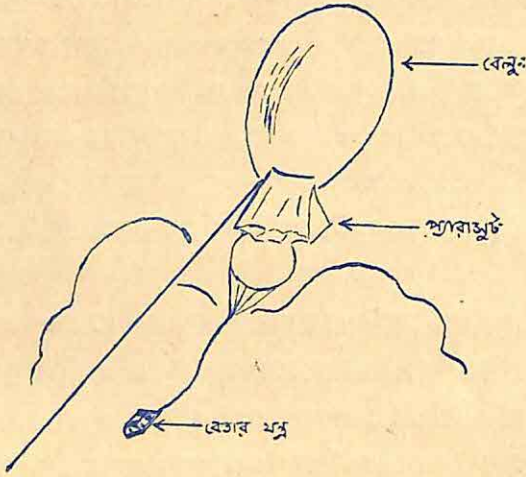
প্রায় ৬০,০০০ ফুট ওপরে উঠে যেতে পারে, তার মানে, প্রায় দশ মাইল উঁচু পর্য্যন্ত আকাশের খবর এর থেকে পাওয়া সম্ভব। যত উঁচুতে বেলুনটা উঠতে থাকবে, বাতাসের চাপ কমতে থাকবে তত, শেষে এমন একটা সময় আসবে যখন বাতাসের চাপ এতো কমে যাবে যে বেলুনটা যাবে ফেটে। তার কারণ, বেলুনটার মধ্যে যে হাইড্রোজেন গ্যাস পোরা হয়েছে, তার একটা চাপ আছে—বাইরের বাতাসের চাপ খুব কমে গেলে, বেলুনের ভেতরের চাপটা হয়ে যাবে বেশী, ফলে পাতলা রবারের বেলুনটা শেষ পর্য্যন্ত ফাটবেই। তাই এইসব বেলুনের সঙ্গে বাঁধা থাকে ছোট্ট একটা প্যারাস্যুট্। বেলুনটা ফেটে গেলে এই প্যারাস্যুটের সাহায্যে ছোট্ট বেতার প্রেরক-যন্ত্রটা আস্তে আস্তে মাটির দিকে

পরীক্ষার পর সম্ভব হইয়াছিল। এই তৈয়ারীতেও নিউট্রন্-কণার অনবরত দরকার হয়। ইহা স্বতই উৎপন্ন হয় এবং একটি পরমাণু ভাঙ্গিলে অপ্রত্যাশিত ভাবে খাদ ইত্যাদির সহিত তিনটি কণারও
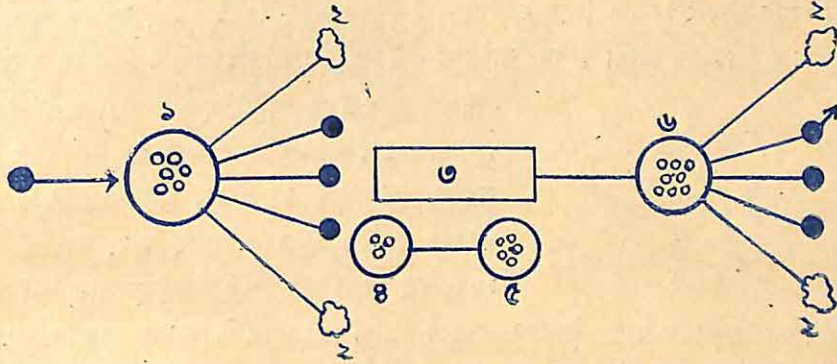
১—বিশুদ্ধ কার্যকরী ইউরেনিয়াম। ২—ইউরেনিয়াম ভাঙ্গনীর টুকরা ও খাদ। ৩—গতি মন্দকারী হাল্কা জিনিস।
৪—খনিজ ইউরেনিয়াম। ৫—প্লুটোনিয়াম (মধ গতি কণার আঘাতে প্রস্তুত)।
৬—মন্দগতি কণার আঘাতে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম।

সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরমাণুর মধ্যে অধিকাংশ খালি জায়গা থাকাতে, যথেষ্ট তৈয়ারী হইলেও নিউট্রন্-কণা সহজেই পলায়ন করিতে পারে। ইউরেনিয়ামে বাজে খাদ বর্তমান থাকিলে, কণা শুষিয়াও নিতে

গ্রাফাইট স্তম্ভ বা পাইল
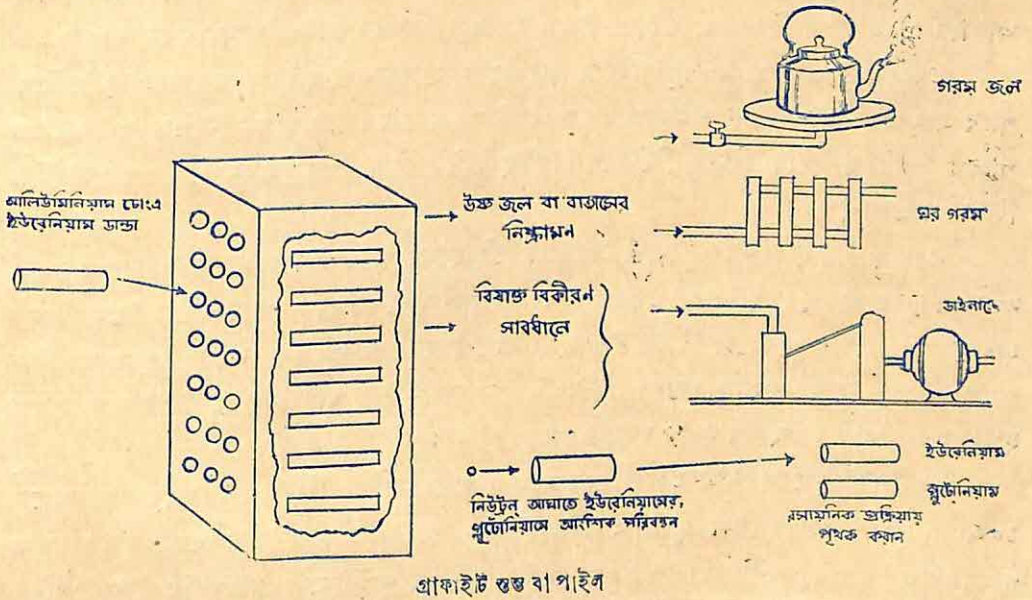
পারে। ছোট জিনিসের মধ্যস্থ নিউট্রন্-কণা সহজেই বাহির হইয়া যাইতে পারে বলিয়া, বোমার পরিকল্পনার সমষ্টিগুলি (unit) যথেষ্ট বড় আকারের হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে উপাদান তৈয়ারীর নিমিত্ত

শত শত সমষ্টির দরকার হয়। আবার সমষ্টির আকার বেশী বড় হইলে, কণার পলায়ন বন্ধ হইয়া বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারে। খনিজ ইউরেনিয়াম ধাতব আলুমিনিয়াম চোংএ রাখিয়া এবং উহা হাল্‌কা জিনিসের (যেমন গ্রাফাইট—পেনসিলে যাহাতে দাগ ফেলে—কয়লার রূপান্তর, ইহাতে কণা শুষিয়া নেয় না) স্তম্ভ বা পাইলের মধ্যে স্থাপন করিয়া নিউট্রনের পলায়ন বন্ধ করা যায়। যেমন বিস্ফোরণ সম্পাদনের নিমিত্ত নিউট্রন্‌-কণা আবশ্যক পরিমাণে রাখিতেই হয়, তেমনি ইহা অত্যধিক পরিমাণে থাকিয়া অসময়ে বিস্ফোরণ না ঘটায়, এই জন্য ইহার পলায়ন ব্যাপার অনেক রকম বন্দোবস্ত দ্বারা আয়ত্তে রাখিতে হয়। পাইলের মধ্যে সৃষ্ট নিউট্রন্‌-কণার গতি অতিশয় দ্রুত। উপরের বন্দোবস্ত দ্বারা উহাকে এভাবে মধ্যগতি ও মন্দগতি করিয়া দেয়, যাহাতে ইহা পাইলের মধ্যে পরমাণু পরিবর্তনে ও ভাঙ্গনে কার্যকরী হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে বিশাল শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা উত্তাপে পরিণত হইয়া সমস্ত গলাইয়া না ফেলে, সেইজন্য জলের বা বাতাসের প্রবাহে পাইল সর্বদা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। বাহক মারফত, এই প্রভূত উত্তাপকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে। হয়ত এই উত্তাপ দ্বারা রান্নাবান্না, জল বা ঘর গরম অথবা ইঞ্জিন বা টারবিন ডাইনামো চালান ইত্যাদি কাজ অপেক্ষাকৃত কম খরচে সম্ভব হইবে। আণবিক বোমায় উপাদানগুলি নির্দিষ্ট আকারে দুই ভাগে রাখিতে হয়, যাহাতে ইচ্ছামত সময়ে একত্রিত করিয়া বিস্ফোরণ করান যায়।

হিলিয়াম প্রস্তুতের একটি রকম

একটি ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বোমায় ৩ মাইল ব্যাপী স্থানে সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিতে পারে এবং প্রবল বায়ু-প্রবাহে কলিকাতার মত একটি বড় শহরের বেশীর ভাগই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে। অধিকন্তু ইহার বিষাক্ত বিকিরণে নিকটস্থ উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদির তৎক্ষণাৎ অথবা বিলম্বিত বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়।

এখন আবার হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে হাল্‌কা পরমাণু ও কণার সংযোগে নূতন পরমাণু (হিলিয়াম) তৈয়ার হইয়া, পদার্থের ঘাটতির দরুন, দারুণ শক্তির উদ্ভব হইবে। হাইড্রোজেন বোমার আকারের নির্দিষ্ট সীমা নাই—যত ইচ্ছা তত বড় করা যায়। কেবল অত্যধিক তাপে ও চাপে ইহার বিস্ফোরণ সম্ভব। ইউরেনিয়াম বোমায় ইহা ঘটে বলিয়া, উহার সঙ্গে রাখিয়া হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করান যাইতে পারে।

একটি হাইড্রোজেন বোমা ১০ মাইলের মধ্যে সমস্ত পোড়াইয়া দিবে এবং বায়ুপ্রবাহে আরো ১০ মাইল দূরবর্তী দালান কোঠা ভূমিসাৎ করিয়া দিবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। ইহা কোন গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত হইবে না। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, পৃথিবী দ্রুত ধ্বংসের দিকেই যাইতেছে।

শুধু সাধারণ লোকের নহে, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদেরও, শুধু চাক্ষুষ দৃষ্টির নহে, বতমানের বিশেষ সাহায্য-প্রাপ্ত দৃষ্টিরও অনেক বাহিরে—পরমাণু কণার ব্যাপার; ইহা কেবল অনুমানের বিষয়; কাজেই শিশুসাহিত্যে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া খুব কঠিন।

এ যুগের বাল্মীকি

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সে-যুগের আসল বাল্মীকির কাহিনী বহুকালের কথা এবং আমরা বইয়ে উহা পড়িয়াছি, কিন্তু এ যুগের এই বাল্মীকির ব্যাপার অতি অল্পদিনের কথা; আমাদের মধ্যে অনেকেরই উহা নিজের চোখে দেখা, নিজের কানে শোনা। আসল বাল্মীকির কথা হয়ত সত্য, কিন্তু এ বাল্মীকির কথাও একচুল মিথ্যা নয়, খাঁটি সত্য।

গ্রামের নাম কাপাসতলা। গ্রামটা রেল-স্টেশন হইতে চার মাইল দূরে। ছোট্ট গ্রাম, মাত্র বিশ-পঁচিশ ঘর কৈবর্ত্তের বাস। ব্যবসায়সূত্রে সকলেরই সাংসারিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। খালি নন্দ বাড়ুই কোন কাজকর্ম্ম করে না; চাষ-আবাদও তাহার নাই, অথচ সংসার যে খুব অসচ্ছল তাহাও নয়। সকলেরই মেটে বাড়ী, নন্দরও তাই। পথের ধারে তাহার ছোট্ট বাড়ীখানা পাঁচীল দিয়া ঘেরা। বাড়ীর মধ্যে দুইখানা শয়নঘর, রান্নাঘর, গোয়াল; একপাশে ছোট একটা ঢেঁকিশাল। সংসারে নন্দ, তাহার স্ত্রী, দুইটি মেয়ে, একটি ছেলে। বড় মেয়েটির বয়স ১৮।১৯; ছোটটির বছর ১৪; ছেলেটির আরও কম। নন্দর নিজের বয়স—চল্লিশের কাছাকাছি, স্বাস্থ্য খুব ভাল, শরীরে অসীম বল। মাথাভরা বাবরী চুল।

নন্দর বড় মেয়েটির নাম পুঁটুরাণী। মাস দুই-তিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। জামাই কলিকাতায় কোন এক কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করে। মাহিনা ভালই পায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে নন্দ নতুন জামাইকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া চিঠি দিল। পুঁটু বাপের কাছেই ছিল।

কলিকাতা হইতে যে ট্রেনটা এখানে সন্ধ্যা সাতটায় আসে, জামাই ষষ্ঠীর দিন সেই ট্রেনে জামাইয়ের আসিবার কথা। নতুন জামাই; বিয়ের সময় মাত্র একবার শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছিল। অচেনা পথঘাট। সেজন্য নন্দ সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্টেশনে আসিল, জামাইকে লইয়া যাইতে।

যথাসময়ে কলিকাতা হইতে সাতটার গাড়ী আসিল; কিন্তু জামাইকে দেখা গেল না। ছোট স্টেশন; যে দুই-একজন প্যাসেঞ্জার নামিল, তাহার মধ্যে জামাই নাই। নন্দ মনে করিল, হয়ত জামাই ছুটি পায় নাই বা কাজের ঝঞ্ঝাটে আসিতে পারে নাই; কাল সকালের গাড়ীতে হয়ত আসিবে। সে ফিরিয়া গেল।

মাইল দুই আসিবার পর, অর্থাৎ স্টেশন ও নন্দর বাড়ীর মাঝামাঝি পথে ছিল একটা তাড়ির দোকান। তখনকার দিনে নিম্নশ্রেণীর নেশাখোর লোকেরা এই তাড়ির নেশায় অভ্যস্ত ছিল। নন্দ প্রায় প্রত্যহই তাড়ি খাইত। সে এই তাড়ির দোকানে ঢুকিল।

অনেক পরে তাড়ির নেশায় মত্ত হইয়া নন্দ যখন দোকান হইতে বাহির হইল, তখন রাত প্রায় দশটা। একে পল্লী অঞ্চল, তাতে লোকালয়ের বাহিরে; জনমানবশূন্য নৈশ-নিস্তব্ধতায় চারিদিক থম্‌-থম্‌ করিতেছে। সঙ্কীর্ণ মেঠো পথের দুই পাশে কোথাও রুক্ষ অনুর্ব্বর পতিত জমি, কোথাও পাঁকভরা নালা-ডোবা, কোথাও বা বড় বড় বুনো গাছের সন্নিবেশ। নন্দ তাহার চিরকালের তেলে-পাকা লাঠিগাছটা হাতে লইয়া সেই নির্জ্জন পথে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

খানিকটা আসিবার পর নন্দ দেখিল পথটা যেখানে বাঁক ঘুরিয়া গিয়াছে, সেইখানে একজন লোক হাতে একটা কাগজের মোড়ক লইয়া ধীরপদে যাইতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া নন্দ দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নেশাতপ্ত রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে সুপ্ত পিশাচ জাগিয়া উঠিল। একটা পৈশাচিক উত্তেজনার সহিত সে তাহার লাঠিগাছটা দৃঢ়ভাবে মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল। নেশায় তাহার চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল। এখন তাহা হইতে যেন লালসার একটা তীব্র বিষ উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। নিরীহ পথিক ধীরপদে চলিতেছে; দেখিলে মনে হয়, এই পথের সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই; হয়ত এই অপরিচিত পথে সে নতুন যাত্রী। আশে-পাশে সমুখে-পশ্চাতে ঝিঁঝিপোকার ডাক, আর দূরে শিয়ালের রব ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাইতেছিল না। কে এই তরুণবয়স্ক পথিক? কোথা হইতে সে আসিতেছে? কোথায় যাইবে? হয়ত পৌণে নয়টার

গাড়ীতে সে আসিয়াছে, নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে যাইবে। কিন্তু নন্দ নিঃশব্দে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল কেন? কেন বজ্রমুষ্টিতে সে তাহার লাঠিগাছটা বাগাইয়া ধরিল?

* * *

রাত প্রায় দুপুর।

নন্দ সন্তর্পণে বাড়ী ঢুকিল। তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—"এত রাত হোল কেন? জামাই আসে নি?"

"না।"

"ইস্, খাবার-দাবার সব নষ্ট; কেন এল না?"

"হয়ত কাল সকালের গাড়ীতে আসবে। সকালে একবার স্টেশনে যাব"—বলিয়া নন্দ কোমরের কাপড়ে বাঁধা কতকগুলা টাকা, একটা রিষ্টওয়াচ, দু'টা আংটী বাহির করিয়া বিছানার উপর রাখিল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কার?"

তেমনি জড়িত কণ্ঠে নন্দ কহিল—"আজ এক মক্কেল পেলুম, দিলুম তাকে সাবাড় ক'রে। কাল যদি···" বাকী কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না, টাকাগুলা ও ঘড়ি-আংটী সে এক গোপনস্থানে রাখিয়া দিয়া মুখহাত ধুইতে বাহির হইয়া গেল।

নন্দ এই কাজই করে। সে একজন 'ঠ্যাঙ্গাড়ে'। চিরকাল সে এই কাজই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ যে সে তাহার জামাইকেই খুন করিয়া আসিয়াছে, তাহা তখনো পর্য্যন্ত সে জানিতে পারে নাই। পরদিন সকালে সে স্টেশনে গিয়াও যখন জামাইয়ের কোন হদিস্ পাইল না, তখন সে জামাইয়ের সন্ধানে কলিকাতায় চলিয়া গেল। সেখানে খবর শুনিয়া সে পাগলের মত বাড়ী ফিরিল ও আংটী দুইটার মধ্যে একটা আংটী ভাল করিয়া দেখিবার পর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। সেদিন সাতটার গাড়ীতে তাহার জামাই আসিতে পারে নাই; আসিয়াছিল পৌনে নয়টার গাড়ীতে। অন্য পথিক মনে করিয়া নন্দই তাহাকে খুন করিয়াছে ও লাস জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে, সেখানে শেয়াল-শকুন তাহাকে কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।

এই ব্যাপারে সে যেন কি রকম হইয়া গেল। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরাইবার উপায় নাই, কিন্তু···, সে আর ভাবিতে পারিল না। দুইদিন ধরিয়া সে নির্জীব জড়ের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। দুইদিনের মধ্যে সে বিছানা ছাড়িয়া উঠে নাই বা বাহিরে যায় নাই। তাহার অশিক্ষিত পৈশাচিক অন্তরও অনুতাপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহা যতই কঠোর হউক, সে তাহা করিবে। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগিল—সে সংসারের জন্যই চিরকাল এই পাপ কাজ করিয়া আসিয়াছে এবং সেদিনও করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এই পাপের অংশ তাহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা লইবে, কিংবা ষোল আনা অংশ তাহাকেই লইতে হইবে? সে তখন নির্জীব অথচ ক্ষিপ্তের মত তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তাহারা তাহার পাপের

অংশ লইবে কিনা। তাহারা চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিল—"আমরা তোমার পাপের ভাগ নিতে যাব কেন? বরাবরই তোমাকে এই কাজ করতে বারণ ক'রে এসেছি, তুমি ত আমাদের কথা কখনো কানে নাও নি। এ পাপ তোমার একলার পাপ।"

আর কোন কথা না বলিয়া নন্দ আবার উপুড় হইয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া সাতদিন কাটিবার পর, নন্দ একদিন প্রত্যূষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে বাড়ী হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার গৃহত্যাগের মাস-খানেক পরে দেখা গেল, যে জায়গাটায় নন্দ তাহার জামাতাকে খুন করিয়াছিল, সেইখানে এক পুকুরের পাড়ে অশথতলায় নন্দ ছোট একখানা কুঁড়েঘর তৈরী করিয়া, তন্ময়চিত্তে ভগবৎসাধনায় দিন কাটাইতেছে। দিনান্তে একবার স্বপাকে দুটি ভাতে ভাত সিদ্ধ করিয়া খাইত, আর সারাদিন ভগবানের নাম জপ করিত। এইভাবে দীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল—ভগবানের উদ্দেশে জপ-ধ্যান করিয়া সে মারা যায়। লোকে বলে যে, সে সিদ্ধ হইয়াছিল। কাহারো সহিত সে বড় একটা বাক্যালাপ করিত না। তাহার মৃত্যুর পর ওই অঞ্চলের লোকেরা ঐ স্থানটাকে পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিত, এবং যে যাহা মানস করিয়া ঐ স্থানে আসিত এবং ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া অশথবৃক্ষতলে পূজা দিত, তাহার সেই মানস পূর্ণ হইত।

বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনো পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই-চারিজন করিয়া লোক ঐ স্থানে আসিয়া থাকে এবং ভক্তিভরে পূজা ইত্যাদি দিয়া যায়। ঐ অঞ্চলে স্থানটি 'নোদুর আস্তানা' বলিয়া খ্যাত। ঘটনার সাদৃশ্য বিচার করিয়া নন্দকে এ যুগের বাল্মীকি বলা যাইতে পারে।

আগম বাণী

—শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী

আগমনীর আগম বাণী ওরে
নিদ্‌ টুটালো শেফালিকার আজ;
ছাতিম ফুল আর থল-কমলের বুকে
জাগলো স্বপন, তাই তো রঙিন সাজ।
হিম-শিহরণ জাগলো মেঘের কোলে,
নীল চাঁদোয়ায় হাসলো বিমল চাঁদ;
কাশ ফুলে আর রজত মেঘে মেঘে
পাতলো ধরায় নতুন খুশীর ফাঁদ।

খুশীর স্রোতে গা ভাসালো নদী
কুলু-কুলু গাইলো মিলন গান;
মরালী আর শ্বেতবলাকা সবে
মালা গেঁথে করলো তারে দান।
শরৎ রাণী আসেন আজও নিয়ে
হস্তে ঝাঁপি কনক ধানের তাই;
মা আমাদের কাঙ্গালিনী তবু
তাঁর তুলনা তিন জগতে নাই।

টেলিফোনের কবলে

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আমাদের খুকুমণির একটি মাত্র দাঁত। তার চোটে সবাই অস্থির। সামনে যা-কিছু পড়বে, ঐ ক্ষুদে দাঁতটুকু থেকে কারো নিস্তার নেই। ধূর্জ্জটি ঘোষের ছেলে কমলের অবস্থাও ঠিক খুকুর মতন। বাড়ীতে নতুন টেলিফোন এসেছে। আর যায় কোথায়? চেনা, আধচেনা কিংবা মুখচেনা—টেলিফোনের নাগালের মধ্যে পড়েছ কি রক্ষা নেই। দিনে সতেরবার কমলের ক্রীং ক্রীং তোমার কান ঝালাপালা না করে ছাড়বে না। যাদের বাড়ীতে ফোন নেই, তাদেরও কি বাঁচবার পথ আছে। পাশের বাড়ীতে কিংবা কাছাকাছি কোনো দোকানে ক্রীং বেজে উঠল—

—কাকে চাই?

—বাদলকে একটু ডেকে দিতে পারেন?

—কে বাদল?

—আপনাদের পাড়ায় তেত্রিশ নম্বর বাড়ীতে থাকে। বলবেন, কমল ডাকছে।

লম্বা গরমের ছুটি চলছে। ইস্কুল বন্ধ। বেলা দশটায় বাবা বেরিয়ে যান কোর্টে। কমলও সকাল সকাল খেয়েদেয়ে তৈরি। তারপর সারা দুপুর বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে চলতে থাকে টেলিফোন। মা থাকেন ওপরে, এসব খবর রাখেন না। তা ছাড়া দুপুর রোদে টো টো করে না ঘুরে ছেলে যে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ী বসে আছে, এতেই তিনি খুসী। এদিকে ক্রমাগত 'রিং' খেয়ে নিজের লোক আর বন্ধুবান্ধবরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে; আজকাল আর সাড়া দেয় না। পিসীমা সেদিন এমন খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, কমলের মনে হ'ল তার কানের পর্দ্দাটাই বুঝি ফেটে গেল। সেজ মামা ধমকে দিয়েছেন—দাঁড়াও, তোমার বাবাকে বলে দিচ্ছি! কমল তাই বিরক্ত

হয়ে চেনা-মহল ছেড়ে দেওয়া স্থির করল। এবার তার ফোনের পাল্লায় পড়ে গেল গোটা কলকাতা সহর। গাইড দেখে বেছে বেছে যাকে খুশী ডাকে—কখনো কোনো বড় দোকান বা কোনো বড় আফিস, কিংবা কোনো নামজাদা বড়লোক। কেউ ভদ্রভাবে সাড়া দেয়, দু'মিনিট হয়তো একটু গল্পও করে; কেউ বা রেগে মেগে ঘটাং করে রিসিভার রেখে দেয়। কারো গলাটা ভারী মিষ্টি, কেউ আবার কথা বলে যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে। সে এক বিচিত্র জগৎ। সমস্ত দুপুর সে তন্ময় হয়ে থাকে, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে তারের জালে ঘেরা টেলিফোনের রহস্যলোকে।

—হ্যালো!

—আপনি কি ঝট্‌পটিলাল খট্‌মট্‌ওয়ালা?

—জী। আপ কাঁহাসে বলতে হে?

কমল গলাটা যদ্দূর সম্ভব গম্ভীর করে বলে, আমি প্রিন্‌স্ অব ডাল্‌টন্‌গঞ্জ কথা বলছি।

—প্রিন্‌স্ অব ডাল্‌ডন্‌গঞ্জ! সেলাম হুজুর। বলিয়ে ক্যা হুকুম?

—দেখুন, আপনাদের ভালো বেনারসী সাড়ী হবে তো?

—জরুর হোবে। আপনি কোতো চান?

—বেশী নয়, খান পঞ্চাশেক সাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারেন?

—হাঁ, হাঁ। এখনি দিচ্ছি।

—না, না, এখনই চাই না। বিকেলের দিকে পাঠালেই চলবে।

—বহুৎ আচ্ছা। আপনার ঠিকানাটা যদি মেহেরবানী করে— কমল ঠিকানা জানিয়ে দিল।

সেদিন বিকেলে ভাল খেলা ছিল মাঠে। কিন্তু খট্‌মট্‌ওয়ালার লোক তার বেনারসীর বোঝা নিয়ে কি রকম নাকালটা হয় দেখবার জন্যে খেলার লোভও ছাড়তে হ'ল। চারটা বেজে পঞ্চান্ন। ধূর্জ্জটিবাবু আফিস থেকে ফিরেই আবার একদল মক্কেল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এমন সময় একখানা জমকালো মোটর এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। নাবলেন একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। সঙ্গে চাকরের মাথায় বিশাল এক কাপড়ের বাণ্ডিল। ঘরে ঢুকে "রাম রাম" জানিয়ে বললেন, প্রিন্‌স্ অব ডাল্‌ডন্‌গঞ্জ আছেন কি?

ধূর্জ্জটিবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, প্রিন্‌স্ অব ডাল্‌টন্‌গঞ্জ! সে আবার কে? আপনি বাড়ী ভুল করেছেন।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, জী নেহি। নম্বর হামি সাথ সাথ নোট করে লিয়েছি। ভুল হামি করি নাই।

ধূর্জ্জটিবাবু রুক্ষভাবে বললেন, দেখুন, বাজে তর্ক করবার সময় আমার নেই। এটা আমার বাড়ী। কোনো প্রিন্‌স্ টিন্‌স্ এখানে থাকে না। দয়া করে এবার আসুন। নমস্কার!

—আপনি কোষ্টো করে একটু খবর নিয়ে দেখুন, বাবুসাব! প্রিন্স্ পঁচাশ জোড়া বেনারসীর অর্ডার দিলেন। ঘুরে গেলে বড্ড গোসা হোবেন। হামিও—

—আঃ, লোকটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে দেখছি! একশ'বার বলছি এটা আমার বাড়ী। আমি ধূর্জ্জটি ঘোষ, ওকালতি করে খাই। আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ প্রিন্স্ নেই!

মাড়োয়ারী বললেন—লেকিন্—

—আবার লেকিন্? আপনি যাবেন কিনা, জানতে চাই। দু'চারজন মক্কেলও বোঝাতে চেষ্টা করল—মাড়োয়ারী বাবুর নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। টেলিফোনে বাড়ীর নম্বর এবং রাস্তার নামটা হয়তো তিনি ঠিক ধরতে পারেননি। কিন্তু মাড়োয়ারী নাছোড়বান্দা। জোরের সঙ্গে বলতে লাগলেন, পঁচিশ বছর টেলিফোন নিয়েই তার কারবার। ভুল তার হতেই পারে না। তা ছাড়া, সময়ের দাম তাদেরও আছে। কিন্তু গাড়ীভাড়া আর মুটেখরচ না নিয়ে সে কিছুতেই নড়বে না। তার মনিব বড়বাজারের খট্‌মট্‌ওয়ালা লাখ লাখ টাকার মালিক। এরকম উকিল বাবু দু'চার ডজন তাদের গদিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে—

ধূর্জ্জটিবাবু রুখে এলেন আস্তিন গুটিয়ে। মাড়োয়ারীও পেছ-পা নয়। মক্কেলরা মাঝখানে পড়ে হাতাহাতিটা আর হতে দিল না। কোনরকমে ঠেলেঠুলে মাড়োয়ারীকে গাড়ীতে তুলে রওয়ানা করে দিল। সে চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে গেল—আচ্ছা হাম্‌ভি দেখ লেঙ্গে।

রোখারুখি দেখে কমল প্রথমটা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেশ মজাই লাগল। টেলিফোনটা মুখে তুলে দুটি মাত্র কথা। তার থেকে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড!

(২)

কমলদের বাড়ীর ঠিক সামনে রাস্তার ওপারে থাকতেন এক জমিদার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ী; তার সঙ্গে ফলের বাগান। ভদ্রলোকের থাকবার মধ্যে স্ত্রী আর এক ভাগনে।

হাড়কঞ্জুস! সারাদিন যক্ষের মত বসে আছে বাইরের ঘরে। পাড়ার কোনো ছেলে গেটের ভেতর পা দিয়েছে কি দাঁত খিচিয়ে তাড়া করবে। অথচ অমন গাছ ভর্ত্তি আম, ডাল-ভেঙে-পড়া লিচু আর জামরুল—এসব দেখে ঠিক থাকাই বা যায় কেমন করে? সেদিন একটা সুখবর পাওয়া গেল—বুড়োর নাকি অসুখ। দুপুরবেলা। পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে। বাসনওয়ালা কাঁসর বাজিয়ে চলে গেল। কমল আস্তে আস্তে রাস্তা পার হয়ে গেটটা আলগোছে টপকে বাগানে ঢুকে পড়ল। মালীটারও দেখা নেই। বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। সামনেই একটা ছোট লিচুগাছ; সহজেই ওঠা যায়। টপাটপ কয়েকটা পাকা লিচু মুখে পুরে দিয়ে কমলের প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। দু'পকেট ভর্ত্তি করে যেমনি নেবে পড়া—ব্যস্। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জমিদার বুড়ো।

—কে হে তুমি চাঁদ?

কমল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জমিদার বাবু এগিয়ে এসে চিবুকে হাত দিয়ে তার

মুখটা তুলে ধরে বললেন, ওঃ ঘোষেদের ঐ বাঁদর ছোঁড়াটা! বাবা অত বড় উকিল, আর ছেলে হ'ল চোর। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চাম্‌চিকে। কান ধর্—ধর্ কান, বলছি। কমল ডু-পকেট থেকে লিচুগুলো বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগে অপমানে তার দু'চোখ ফেটে বেরিয়ে এল কান্না।

পরদিন দুপুরবেলা। টেলিফোন বেজে উঠল এক ডাক্তারের ক্লিনিকে। —হ্যালো।

—ডক্টর সান্যাল আছেন কি?

—কথা বলছি।

কমল অনুনয়ের সুরে বলল, দেখুন আমার মামার বড্ড অসুখ। আপনাকে এখ্‌খুনি একবার আসতে হবে, ডাক্তারবাবু!

—কী অসুখ?

—তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথার অসুখ বলে মনে হচ্ছে।

—মাথার অসুখ!

—হ্যাঁ। যাকে দেখছেন, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাড়া করছেন। বাড়ীতে আমি আর মামীমা ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি।

—আপনার নাম আর ঠিকানা?

কমল জমিদার বাবুর বাড়ীর ঠিকানা আর তার ভাগনের নাম বলে দিল।

জমিদার ঘনশ্যাম রায় তাঁর বৈঠকখানার পাশের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ও-পাশের ঘরে তাঁর ভাগনে কী একটা করছিল। ডাক্তারের গাড়ী এসে বাড়ীর সামনে থামল। ডক্টর সান্যাল নেমে এসে কড়া নাড়তেই দরজা খুলল ঘনশ্যামের ভাগনে।

—যতীনবাবু আছেন?

—আমারই নাম যতীন।

—ওঃ আপনিই বুঝি ফোন্ করেছিলেন? মামা কেমন আছেন?

—মামা?

—হ্যাঁ। যার মাথার অসুখ। তিনি আপনার মামা নন?

যতীন মুখচোরা লোক। হঠাৎ হতভম্ব হয়ে জবাব দিতে পারল না। কথাটা ঘনশ্যামের কানে গেল। তিনি এ ঘরে এসে কড়া মেজাজে বললেন, কে আপনি?

—আমি ডাক্তার।

—এখানে কি দরকার?

ডাক্তার সান্যাল বুঝলেন, ইনিই তার রুগী। মাথার গোলমাল, কাজেই চটালে চলবে না। ঠাণ্ডাভাবে মোলায়েম করে বললেন, আমি আপনার কাছেই এসেছি। এখন কেমন আছেন, বলুন তো?

—থাক্, অতটা দরদ না দেখালেও চলবে। যান এবার মানে মানে সরে পড়ুন!

ডাক্তার যতীনের দিকে চেয়ে বললেন, বাড়ীতে চাকর-বাকর আছে তো? একটু ধরতে হবে।

ঘনশ্যাম গর্জ্জে উঠলেন—কী! ধরতে হবে আমাকে? কি মতলব তোমার?…যতীন, পুলিশে খবর দে। লোকটা মনে হচ্ছে ডাকাত।

ঠিক এমনি সময়ে একখানা অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, এটাই কি ১৫ নম্বর বাড়ী?

যতীন বললে, হ্যাঁ।

—যতীনবাবু বলে একজন ফোন করছিলেন এখানে নাকি একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে।

ডাক্তার সান্ন্যাল বললেন, অ্যাক্সিডেণ্ট নয়, একটা মেণ্টাল কেস, মাথার ব্যাপার। যাক্, এসে ভালই হয়েছে। হাসপাতালেই নেওয়া দরকার।
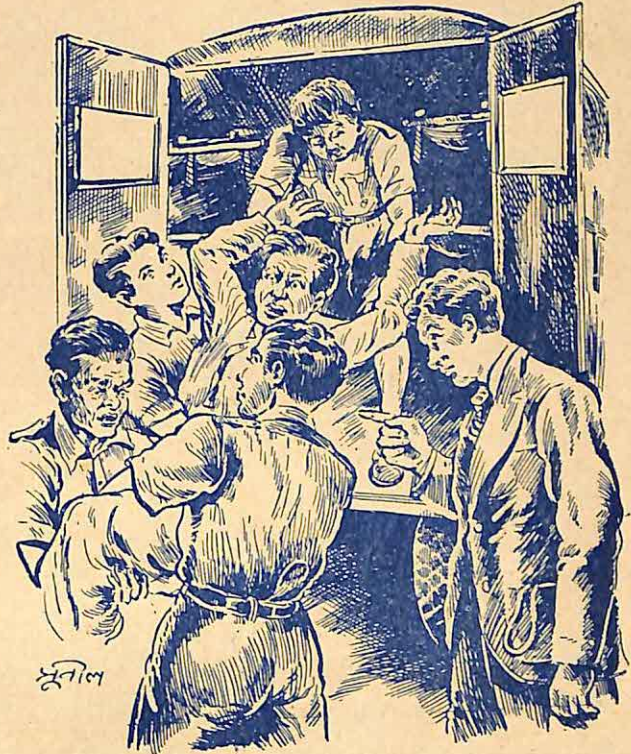
ঘনশ্যাম হঠাৎ ফেটে পড়লেন যতীনের উপর। গালে এক চড় কসিয়ে দিয়ে গর্জ্জে উঠলেন, এসব হচ্ছে কি, উল্লুক?

যতীন কেঁদে ফেলল। ডাক্তার সান্ন্যাল অ্যাম্বুলেন্স-ওয়ালাদের কি একটা ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চার জনে ঘনশ্যামকে জাপটে ধরল, এবং টেনে হিঁচড়ে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দিল। জমিদার বাবু কেঁদে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে পাড়া মাথায় করে তুললেন। যতীনের মামীমা ওপরের ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। সোরগোল শুনে যখন বেরিয়ে এলেন, গাড়ী তখন ষ্টার্ট দিয়েছে।

ডাক্তার সান্ন্যাল নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনি ভাববেন না, মা, আপনার স্বামীর চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না।

(৩)

অ্যাডভোকেট ধূর্জ্জটি ঘোষ তাঁর কোর্ট আর মক্কেলের মধ্যেই ডুবে থাকতেন। একমাত্র ছেলের পড়াশুনার খবরদারি করবার সময় ছিল না, খেয়ালও ছিল না। ঐ বদভ্যাস ছিল কমলের এক

কাকার। তিনি ছিলেন 'গোবর্দ্ধন ব্যাঙ্কের' ম্যানেজার। একদিকে এক থালা রসগোল্লা আর একদিকে একখানা অঙ্কের প্রশ্নপত্র রেখে যদি তাঁকে বলা হ'ত—কোন্‌টা চাই, তিনি ঐ প্রশ্নপত্রটাই তুলে নিতেন। এ হেন কাকাকে কমল প্রাণপণে এড়িয়ে চলত।

গরমের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, কোথাও এবার বেড়াতে যাওয়া হ'ল না। রবিবারের দুপুরটা বোটানিকেলে ঘুরে এলে কেমন হয়, খেয়েদেয়ে কমল এই সম্বন্ধে একটা প্লান করছিল। হঠাৎ কাকা হাঁক দিলেন, কমল, অ্যালজেব্রা নিয়ে এসো।…তারপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোটা চল্লিশেক শক্ত শক্ত ইকোয়েশন, হার্ডার ফ্যাক্টরস্ আর আইডেনটিটিজ। কমল ঠিক করল, এর শোধ নিতে হবে!

এবারকার টেলিফোন ঝঙ্কার দিল থানায়।

—অফিসার-ইন-চার্জ্জ কথা বলছি।

—সর্ব্বনাশ হয়েছে, বড়বাবু, শীগগির পুলিশ পাঠান।

—কোথায়? কি ব্যাপার? কে আপনি?

—আমি গোবর্দ্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। এখনি সাহায্য চাই—

সন্ধ্যাবেলা কাকা যখন ফিরলেন, তাঁর মুখ দেখে চমকে উঠল সবাই। দারোয়ান বলল—কে কোত্থেকে উড়ো খবর দিলে ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। থানার বড় দারোগা এসে যাচ্ছেতাই করে বকে গেল ম্যানেজার বাবুকে। উনি কত করে বললেন, আমি কিচ্ছু জানি না। কে শোনে? আবার জানিয়ে গেল—মামলা করবে পুলিশকে মিথ্যা হয়রান করবার জন্যে।

কমলের সমস্ত রাগ পড়ল গিয়ে ঐ দারোগার উপর। আচ্ছা, সেও মজা দেখাতে জানে। একটা রাত আর কয়েক ঘণ্টার মামলা। তারপর বাবাজী টের পাবেন ক'টা ধানে ক'টা চাল।

পরদিন বেলা এগারটা।

—নাম্বার প্লিজ!

—বড়বাজার ওয়ান ও ফাইভ সেভেন।

—হ্যালো।

—বড়বাবু আছেন?

—তিনি তো কোর্টে গ্যাছেন। আপনার কি দরকার?

—ওঁকে এখ্‌খুনি খবর দিন যে ওঁর ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে। ভয়ানক পাগলা কুকুর…

ফোনের ওদিকটা আঁৎকে উঠল—কুকুর কামড়েছে! কী সর্ব্বনাশ! আপনি কে বলুন তো?

—আমি ওদের পাড়ার লোক।

ফোন রেখে কমলের মনে হ'ল গলাটা যেন তার চেনা চেনা।

ঘণ্টাখানেক পরে একখানা ট্যাক্সি এসে হাজির। ধূর্জ্জটিবাবুর মুহুরি ব্যস্তসমস্ত হয়ে

বাড়ী ঢুকল। পেছনে ওদের পুরানো ডাক্তার গজপতি সেন। কমল বাইরের ঘরেই ছিল। ডাক্তার সেন এগিয়ে এসে তার হাতের নাড়ি পরীক্ষা করতে করতে বললেন, কতক্ষণ আগে কামড়াল? কুকুরটা ক্ষ্যাপা না পোষা, লক্ষ্য করেছ?

কমল অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

ডাক্তার তার পিঠ চাপড়ে বললেন, বোকা ছেলে। পাগলা কুকুরের কামড় লুকোতে আছে কখনো? নিজে নিজেই বুঝি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে?

কমল বলল, কি বলছেন আপনি? এ তো কিচ্ছুর কামড় নয়। খেলার মাঠে পড়ে গিয়ে কাঁটা তারে কেটে গ্যাছে খানিকটা।

ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন, বেশ তাই হ'ল। এবার ওঠ দিকিনি। একটা জামা পরে নিয়ে চল। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

মুহুরির সঙ্গে মা নেবে এলেন হন্তদন্ত হয়ে।—কি সর্ব্বনেশে ছেলে মাগো! পাগলা কুকুরের কামড়! কাউকে বলা নেই কওয়া নেই দিব্যি চুপচাপ বসে আছে—দুটো ইন্‌জেকসন দেবে এই ভয়ে!

মুহুরি বলল, তাই একবার দেখুন দিকি মা! ভাগ্যিস একটি পাড়ার ছেলে বুদ্ধি করে খবরটা দিলে তাই। বাবু সবে কোর্টে গিয়ে মামলা ধরেছেন। জানাই কি করে? চুপ করেও তো থাকা যায় না। শেষটায় খবর দিতে হ'ল। শুনে কোর্টশুদ্ধ লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবু বললেন, ট্যাক্‌সি নিয়ে ছোটো, নিবারণ, ডাক্তার বাবুকে নিয়ে গিয়ে দ্যাখ ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা।

মা কেঁদে ফেললেন, কি হবে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার সেন ভরসা দিলেন, না-না, ভয়ের কিছু নেই। এখ্‌খুনি হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছি।

কমল বুঝল, প্রতিবাদ টিকবে না। নিজেকে ছেড়ে দিল ভাগ্যের হাতে। ভাগ্য বৈ কি? নৈলে সে চাইল—ওয়ান ও ফাইভ সেভেন, আর একচেঞ্জ ডেভিলটা দিয়ে বসল—ওয়ান ও নাইন সেভেন? একেবারে তার বাবার নম্বর? পাঁচের বদলে নয়—তার ফল যে এতখানি মারাত্মক হবে কে কবে ভাবতে পেরেছিল? ··· ···

পাস্তর ইন্‌সটিটিউট্। একটা উঁচু মতন বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল তাকে। কাঁটা তারের খোঁচাটাকে ছুরি দিয়ে কেটে বাড়িয়ে দিল কচ্‌কচ্‌ করে—যেন শশা কাটছে। তার মধ্যে ঢেলে দিল কষ্টিক না কি এক পৈশাচিক ঔষধ। কমলের চোখে দুনিয়ার সব আলো নিভে গেল দপ্‌ করে, বুক চিরে বেরিয়ে এল এমন এক বীভৎস চিৎকার যার তুলনা মেলে একমাত্র শ্মশানে প্রেতগুলো যখন চেঁচায়। তারপর আর এক জল্লাদ এসে পেটের উপর ফুটিয়ে দিল প্যাট্ প্যাট্ করে দুটো ইন্‌জেক্‌সন; হেসে বলল, ভয় কি খোকা? এই তো সবে সুরু। এই রকম আটাশটা দিতে হবে চৌদ্দদিন ধরে।

কমল শুধু ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে তাকাল একবার।

আর একদিনের পৃথিবী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

ভবিষ্যতে মানুষের চেহারা কেমন হবে তাই নিয়ে পণ্ডিতেরা জল্পনা-কল্পনা করছেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, শরীরের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশী ব্যবহার করা হয়, সেগুলিই সতেজ হয়, ব্যবহার না করলে তা পুষ্ট হয় না। কামারের ডান হাতখানি সবল হবেই। ফুটবল খেলোয়াড়েরও, অন্য অঙ্গ যাই হোক না কেন, পায়ের গড়ন সুপুষ্ট হতে বাধ্য। প্রাণিজগতেও ঠিক এই জিনিসটি দেখা যায়। উটপাখী পাখা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলে তার উড়বার ক্ষমতা হারিয়েছে। বুনো হাঁস যেমন উড়তে পারে, পোষা হাঁস তা পারে না। কাজেই ভাবী যুগের মানুষের চেহারা কেমন হবে তা অনেকটা নির্ভর করবে তার চালচলনের উপর।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই নানা ব্যাপারে যতটা সম্ভব যন্ত্রপাতির সাহায্য নিচ্ছে। আগেকার দিনের মানুষ অবলীলাক্রমে বিশ ক্রোশ পথ হেঁটে চলে যেত, এখন তিন পা যেতেই তার গাড়ীর দরকার হয়। ফলে পায়ের শক্তি তার অনেক কমে গেছে। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, প্রাণশক্তি—এ সবও আগেকার তুলনায় কমে আসছে। কিন্তু আগেকার দিনের মানুষের চেয়ে এখনকার মানুষ মাথার কাজ করছে অনেক বেশী। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ভবিষ্যতে মানুষের মগজের কাজ আরও বেড়ে যাবে—ফলে মাথার খুলি আরও পুষ্ট হবে এবং আকারেও অনেক বড় হবে। চোখ, কান, নাক—এগুলির সঙ্গে যতটা সম্ভব কৃত্রিম যন্ত্র ব্যবহার করায় এগুলির প্রয়োজনও অনেক কমে যাবে, কাজেই এগুলি হয়তো শেষ পর্য্যন্ত সেই বিরাট মাথার মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট ছিদ্র

রূপেই অবশিষ্ট থাকবে। হাত-পার ব্যবহারও ঠিক ঐ রকম কমে যাওয়ায় সেগুলিও লিক্লিকে হয়ে যাবে, অর্থাৎ তখনকার মানুষের চেহারা মোটামুটি দাঁড়াবে এই রকম : বিরাট একটা মাথা, তার মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি ছিদ্র। আর তার নীচে মাকড়শার ঠাংএর মত লিক্লিকে হাত-পাওয়ালা খানিকটা অংশ।

এই রকম মানুষের কথা ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগে, না? কিন্তু পরিবর্ত্তনই হচ্ছে জগতের নিয়ম। এখনকার মানুষের সঙ্গে সেকালকার সেই গুহামানুষদের তুলনা করলেও এই রকম অদ্ভুতই মনে হবে। আর মানুষ তো ছার, আমাদের এই পৃথিবীরই কি কম পরিবর্ত্তন হয়েছে? সূর্য্যের গা থেকে যখন একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলার মত পৃথিবী ছিটকে বেরোল, তখন তার সমস্ত শরীর ছিল জ্বলন্ত গ্যাসে তৈরী। তারপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে তা ঠাণ্ডা হতে লাগল। গ্যাস জমে প্রথমে হল তরল, তারপর আরও খানিকটা জমে হল নিরেট—মাটি আর পাথর। এদিকে তার ওপর-কার ঘন কুয়াসাও আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে সেখানে দেখা দিল একটা বাতাসের আবরণ—বায়ুমণ্ডল।

তারপর দেখা দিল পৃথিবীর আর এক রূপ। এল গাছপালা, এল জীবজন্তু, তারপর মানুষ। পৃথিবীর প্রথম যুগে যে জীবের জন্ম হল, তাকে দেখে বুঝবার উপায় ছিল না সেটা প্রাণী না উদ্ভিদ্! তারপর ধীরে ধীরে বড় বড় জন্তুও দেখা দিল। প্রথম যুগের জন্তুরা অবশ্যি সকলেই বাস করত জলে। তার অনেক পরে ডাঙ্গায় প্রাণীর আবির্ভাব হয় এবং ক্রমে দেখা দেয় ডাঙ্গার সেই অতিকায় সরীসৃপের দল। টির‍্যানোসরস্, ব্রণ্টোসরস্ মেগালোসস্, ষ্টিলাসরস্, ইগুয়াসাউন্—ঐ রকম আরও কত গাল-ভরা নাম দিয়েছেন তাঁদের প্রাণিতত্ত্ববিদরা। পঞ্চাশ—ষাট—আশী হাত লম্বা শরীর নিয়ে এই সব অতিকায় সরীসৃপরা যখন পৃথিবীর উপর রাজত্ব করে, তখন তারা হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি একদিন পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে, আরও উন্নত ধরণের বংশধররা এসে তাদের রাজ্যে রাজত্ব সুরু করবে।

পৃথিবী জমাট বাঁধবার পরও তার চেহারার কত না পরিবর্ত্তন ঘটছে। এক দিনে নয়, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে এই কাণ্ড ঘটছে। বিশ্বাস করতে পার, আজ যে কলকাতা সহরের বুকে সুসজ্জিত ঘরে বসে মনের আনন্দে বার্ষিক শিশুসাথী পড়ছ, রাস্তার দিকে তাকিয়ে জনতার হট্টগোলে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছ, সেখানে এক সময় সমুদ্রের জল টলটল করত। গোটা বাংলা-দেশটারই তখন অস্তিত্ব ছিল না—সব জলে জলময়, এমন কি আজ যেখানে নগাধিরাজ হিমালয় পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—যার চূড়ায় উঠতে গিয়ে কত দুঃসাহসী হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন—সেখানে এক সময় ছিল বিরাট অতল এক সমুদ্র। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন 'টেথিস্ সাগর'। হিমালয়ের বুকে নানা সামুদ্রিক প্রাণীর পাথুরে কঙ্কাল আজও সেদিনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। আবার এদিকে ভারতবর্ষের সঙ্গে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া ছিল একত্র যোড়া। পণ্ডিতেরা সেই বিরাট মহাদেশের নাম দিয়েছেন 'গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড'। নানা তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা এই সত্যে উপনীত

হয়েছেন। তারপর কালের সঙ্গে সঙ্গে দু' দেশের মধ্যে কত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মাঝখানকার বিরাট মহাসাগর!

ছোটখাট কত পরিবর্ত্তন তো আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে! অল্প কিছুদিন আগেও যেখানে বিরাট নদী দেখেছি, এখন সেখানে ডাঙ্গা জেগে উঠেছে—চাষবাস হচ্ছে—লোকজনের বসতি হয়েছে। আবার কত হাস্যময়ী গ্রাম চোখের সম্মুখে জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে! সমুদ্রের বুকে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন দ্বীপ, গহন অরণ্যের মধ্যে তৈরী হচ্ছে বিরাট বিরাট নগর, আবার কত প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে।

এই সব দেখে-শুনে পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে চলেছেন, অবশ্যি সে সব জল্পনা-কল্পনা চলছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরই নির্ভর করে।

কে জানে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে কিনা। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপদের মত তাদেরকেও হয়তো একদিন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেতে হবে—কিংবা তাদেরই বংশ থেকে আরও কোন উন্নততর প্রাণী তৈরী হয়ে পৃথিবীর রাজত্ব-ভার গ্রহণ করবে। তারপর হয়তো তাদেরও একদিন বিদায় নিতে হবে—পৃথিবী জীববাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর মত আরও যে সব গ্রহ তাদের উপগ্রহ সমেত সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে তাদের চাল-চলন দেখে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এ কথা অবিশ্বাস করার উপায় নেই যে, পৃথিবী ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পৃথিবীর ভিতরটা এখনও কিছু গরম আছে বটে, কিন্তু একদিন তাকেও ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হবে। পৃথিবীর বুকে এক সময়ে আগ্নেয়গিরির উৎপাত ছিল প্রচুর—এখন তার অধিকাংশই নিভে এসেছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেছেন—বর্ত্তমানে চাঁদের যে অবস্থা পৃথিবীকেও একদিন সেই অবস্থায় আসতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, চাঁদে জল নেই, বাতাস নেই, আগুন নেই—গাছপালা বা জীবনের কোন চিহ্ন নেই সেখানে। আছে শুধু রাশি রাশি মৃত আগ্নেয়গিরির স্তূপ আর দিগন্তযোড়া ফাটল-ধরা রুক্ষ পাথরের ময়দান।

পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে আর সেই সঙ্গে লাটুর মত নিজের চারদিকেও ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খেয়ে নিচ্ছে। প্রথমটিকে আমরা বলি পৃথিবীর 'বছর', দ্বিতীয়টিকে বলি 'দিন'। পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন পৃথিবী যতই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তার 'দিন' ততই বড় হচ্ছে, অর্থাৎ তার ঘুরপাক খাওয়ার বেগ কমে আসছে। আদ্যিকালের পৃথিবীর দিন আরও ছোট ছিল, সে তখন আরও জোরে বন্‌-বন্‌ করে ঘুরত। ভবিষ্যতে এমন একদিন হয়তো আসবে যখন পৃথিবীর সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যতটা সময় লাগে নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে একটা পাক খেতেও ঠিক ততটা সময় লাগবে, অর্থাৎ তখন তার এক দিন হবে এক বছরে। শুক্র এবং বুধ গ্রহের এই অবস্থা এখনই এসে গেছে।

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখ। সে অবস্থা যখন আসবে, তখন পৃথিবীর একটা পিঠ আর কখনও

সূর্য্যের মুখ দেখবার সুযোগ পাবে না। একদিকে, ধর আমাদের দিকে, যদি দিন হয় তো বরাবরই দিন চলবে এবং অপর দিকে, অর্থাৎ আমেরিকার দিকে, চলবে চিরকালের মত রাত্রি। একপিঠে ক্রমাগত রোদ পড়ে পড়ে সেটা এমন তেতে উঠবে যে, খাল, বিল, সাগর, নদী—সমস্ত শুকিয়ে খা-খা করছে; গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। শুধু চারদিকে থাকবে ধূ-ধূ করা মরুভূমি আর বড় বড় ফাটল। অপর দিকে হবে ঠিক উল্টো অবস্থা। ক্রমাগত হিম আর অন্ধকার সয়ে সয়ে সেদিকটা হয়ে যাবে অসম্ভব ঠাণ্ডা। খাল-বিল, নদী-সমুদ্র সব যে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবে। সেই প্রচণ্ড শীতে গাছপালা বা জীবজন্তুর পক্ষেও টিকে থাকা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া আর একটা ভীষণ কাণ্ড দেখা দেবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, কোন জায়গা গরম হলে তার উপরকার বাতাসও গরম হয়ে যায়। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্কা, তাই বাতাস গরম হলেই তা উপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু তার জায়গাটা আর কিছু ফাঁকা থাকতে পারে না, চারদিক্ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এসে তখনই সে ফাঁক ভরাট করে ফেলে। এই ভাবেই ঝড় হয়। পৃথিবীর এক পিঠ গরম আর এক পিঠ ঠাণ্ডা হলে এই ব্যাপারটি সর্ব্বক্ষণ ধরে চলতে থাকবে। একদিক্কার গরম বাতাস উপরে উঠে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক্ থেকে প্রবল বেগে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এসে সেই ফাঁক ভরাট করবার চেষ্টা করবে; অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়া যুড়ে সারাক্ষণ ধরে চলবে তুমুল ঝড়-ঝাপ্টা!

চাঁদের গায়ে এখন আর বাতাস বা বায়ুমণ্ডল বলে কিছু নেই, চাঁদের টান অগ্রাহ্য করে সে বাতাস মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে পৃথিবীরও এ অবস্থা হওয়া বিচিত্র নয়। এমন একদিন হয়তো আসবে, যেদিন পৃথিবী আর তার মাধ্যাকর্ষণের শক্তি দিয়ে তার উপরকার বায়ুমণ্ডলকে টেনে রাখতে পারবে না, পৃথিবীর বাতাসও চাঁদের বাতাসের মত সে টান অগ্রাহ্য করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। কিংবা, হয়তো, অন্য কোনও শক্তিশালী জ্যোতিষ্ক এসে পৃথিবীর কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তখনকার অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় পৃথিবীর বাতাস উড়ে না গিয়ে হয়তো জমে তরল হয়ে পৃথিবীর বুকেই ঝরে পড়বে, অর্থাৎ তখন, বাতাসের যে রূপ আমরা দেখছি, সে রূপ আর থাকবে না। বায়ুমণ্ডল বলেও কিছু থাকবে না।

বাতাস না থাকলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে কল্পনা করতে পার? বাতাসের অভাবে জীবজন্তু বা গাছপালা কোনটাই বাঁচতে পারে না। অবশ্যি পৃথিবী থেকে প্রাণী বা গাছ তার অনেক আগেই হয়তো লোপ পাবে। কাজেই সে প্রশ্ন আর উঠবে না; কিন্তু বাতাসের অভাবে আরও অনেক মজার মজার কাণ্ড ঘটবে। বাতাস আমাদের পৃথিবীকে ঠিক কম্বলের মত জুড়ে রেখেছে। দিনের বেলা এই বাতাসের কম্বল সূর্য্যের আঁচ থেকে পৃথিবীকে অনেকটা রক্ষা করে—সূর্য্যের সবটা তেজ পৃথিবীর উপর পড়তে না দিয়ে মাঝপথেই তার অনেকখানি লুফে নিয়ে শূন্যে ফেরত পাঠায়। আবার রাত্রিবেলা ঠিক ঐ ভাবে বাতাসের কম্বল পৃথিবীকে চট্ করে জুড়িয়ে যেতে দেয় না। বাতাস না থাকলে দিনের বেলা সূর্য্যের সবখানি রশ্মি যেমন পৃথিবীর বুকে পড়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে তাতিয়ে

তুলবে, তেমন রাতের বেলা পৃথিবী মুহূর্ত্তে জুড়িয়ে গিয়ে হয়ে দাঁড়াবে হিম-শীতল। ক্রমান্বয়ে এই অতি-গরম আর অতি-ঠাণ্ডার অত্যাচারে পৃথিবীর অবস্থা স্বভাবতঃই খুব কাহিল হয়ে পড়বে।

শব্দের সৃষ্টি হয় বাতাসের ঢেউ থেকে। কাজেই পৃথিবীতে বাতাস না থাকলে শব্দও থাকবে না। আমরা যে গন্ধ টের পাই সেও বাতাসেরই জন্য, বাতাসই সেই গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। বাতাস না থাকলে পৃথিবীতে গন্ধ বলেও কিছু থাকবে না। আবার, বাতাস গেলে সেই সঙ্গে জলকেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। কোন পাত্রের মধ্যে জল রেখে যদি তার উপরকার বাতাসটুকু পাম্প করে নেওয়া যায়, তা হলে সে জল দেখতে দেখতে ফুটতে থাকে এবং একটু পরেই বাষ্প হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। বাতাস চলে গেলে পৃথিবীর যেখানে যত জলাশয়—পুকুর-নদী, হ্রদ-সাগর—সবেরই জল ঐ ভাবে ফুটতে থাকবে এবং শেষে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবে। বাতাসের অভাবে কারো টিকে থাকা যদি বা সম্ভব হ'ত, এই ভাবে জলের অভাবে তাকে আবার বিপদে পড়তে হবে।

তারপর ধর, ধূলো। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস গুঁড়ো হয়ে ধূলোয় পরিণত হয়, তারপর বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এই ভাবে আমাদের আশেপাশে সর্ব্বত্র অজস্র ধূলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর আকাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, সর্ব্বত্রই এই ধূলো ছড়িয়ে আছে। এক কথায় আমরা সর্ব্বক্ষণ ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলে আমরা সব সময়ে তা দেখতে পাই না এবং কতকটা অভ্যস্ত থাকার দরুণ টেরও পাই না তার অস্তিত্ব। কিন্তু এই অদৃশ্য ধূলোর দরুণ যে কত কাণ্ড হয়, তা শুনলে অবাক হবে। আকাশে আমরা যে রংএর খেলা দেখি তা হয় ধূলোরই জন্য। আকাশের যে নীল রং দেখে আমরা মুগ্ধ হই, তারও কারণ ঐ ধূলো। আকাশে যদি ধূলো না থাকত, তা হলে তার ঐ রংও আর থাকত না। তখন দিনের বেলাই আকাশটাকে দেখাত ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু তার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ, সূর্য্য আর তারার দল ঝক্‌ঝক্ বা ঝিকমিক করত, ঐ দিনের বেলাতেই।

ঐ ব্যাপারটি ঘটবে বাতাস না থাকলে। কারণ, আগেই বলেছি, আকাশে যে বিরাট ধূলোর রাশি তা ভেসে বেড়ায় বাতাসকেই অবলম্বন করে। বাতাস না থাকলে এই সব ধূলো আশ্রয় না পেয়ে পৃথিবীর বুকেই ঝরে পড়বে এবং তাই যদি হয় তা হলে সেই বিপুল ধূলিরাশির তলায় পৃথিবীর যাবতীয় বাড়ীঘর, গাছপালা—এমন কি, পাহাড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত চাপা পড়ে যাবে। সমস্ত দেশ যুড়ে পড়ে থাকবে সাহারা মরুভূমির মত এক সৃষ্টি-যোড়া ধূলিসমুদ্র।

পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে এই রকম আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে হয়। কিন্তু আজকের মত সে কথা থাক্। তবে একদিন-না-একদিন যে পৃথিবীর ও-দশা হবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত। তবে একটা আশার কথা এই যে, কত লক্ষ কোটি বছর পরে পৃথিবীর এ দশা হবে, তা এখনও ঠিক হিসেব করা যায় নি, এবং সেদিন যদি আসেও, তবে সেই ভীষণ দৃশ্য দেখবার জন্য তুমি-আমি কেউই তখন বেঁচে থাকব না।

দিদি
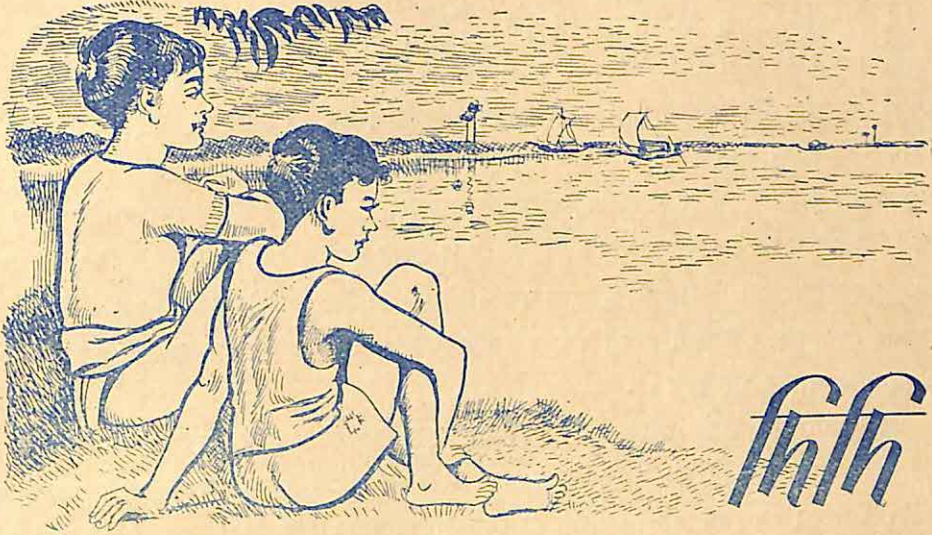
শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা

সহর ছেড়ে ওরা গ্রামের বাড়ীতে চ'লে এল ওদের বাবা মারা যাবার পর।

নদীর পাড়েই ছোট একখানা গ্রাম। বাঁক ঘুরে ঘুরে নদীটা গ্রামখানাকে প্রায় বেষ্টন ক'রে ফেলেছে। বর্ষাকালে নদীর গৈরিক জলোচ্ছ্বাস দুই কূলের বাঁধ ভেঙ্গে এপাড় ওপাড়ের সব কিছু গ্রাস করতে চায়। ভোরবেলা বাঁশি বাজিয়ে ষ্টীমার-ষ্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে একখানা ষ্টীমার যাত্রা করে নদীর বুক বেয়ে, ডিঙ্গি নৌকাগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে নেচে নেচে একদিক থেকে চ'লে যায় আরেক দিকে।

রুণু, বেণু আর ভানু তিনটি ভাই আর একটি বোন, নাম তনুশ্রী, সকলে তাকে 'তনু' ব'লে ডাকে। অকস্মাৎ বাপকে হারানোর আঘাতটা তখনো ওরা সামলে উঠতে পারে নি। ষোলো বছর বয়সে রুণু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে, তনুর বয়স দশ, আর বেণু, ভানু দুই ভাইয়ের বয়স এই আট আর ছয় হবে, সেই সময় ওদের মাও মারা গেলেন। এক বছর আগে পরে মা-বাবাকে হারিয়ে ছোট ছোট ভাইবোন ক'টি একেবারে নিঃসহায় হয়ে পড়ল।

ওদের বৃদ্ধা দিদিমা জামাই মেয়ের শোকে যত না কাতর হলেন, তার চেয়ে বেশী কাতর হলেন অসহায় নাতি-নাতনীদের দুঃখে। জ্ঞাতি জ্যাঠা খুড়ো যাঁরা ছিলেন, তাঁরা একটু আধটু মৌখিক সহানুভূতি আর দু'টাকা পাঠিয়েই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মাতুলও চার চারটি ছেলেমেয়ের ভার নিতে সাহস পেলেন না, তিনিও ডাক মারফৎ কিছু কিছু

অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু দিদিমা দূরে থাক্‌তে পার্‌লেন না, চ'লে এলেন ওদের কাছে। সকলের দেওয়া যৎসামান্য অর্থ দিয়ে তিনি কোনো মতে ওদের সংসার চালিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। মাকে হারিয়েও মাতামহীর আদর-যত্নে ওরা ভালই রইল। সমস্ত আবদার আর উৎপাত সহ্য ক'রে দিদিমা বেণু আর ভানুকে বড় ক'রে তুল্‌লেন, কিন্তু মানুষ কর্‌তে পার্‌লেন না, অতিরিক্ত আদর আর বিনা শাসনে ওরা বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গ'ড়ে উঠ্‌ল।

ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সকলের পরামর্শমত পড়া ছেড়ে দিয়ে রুণু ষ্টীমার কোম্পানীর কাজে ঢুকে পড়ে। অল্প আয়ে কষ্ট ক'রে সংসার চালিয়েও সে ভাইদের স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিল। কিন্তু পড়াশুনায় ওদের মন ছিল না। পড়াশুনার চেয়ে স্কুল পালিয়ে গাছে উঠে পাখীর ছানা পাড়তে, হাঁড়ি ভেঙ্গে খেজুরের রস খেতে, নদীতে সাঁতার দিতে, ডাংগুলি খেল্‌তে, আর ঝগড়া মারামারি কর্‌তেই ওদের উৎসাহ আর আনন্দ ছিল বেশী।

কিছুদিন পর বুড়ো মানুষ দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়লে এখানে সেবাযত্ন কর্‌বার কেউ নেই ব'লে মামা এসে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। সংসারের সমস্ত ভারই পড়্‌ল ছোট মেয়ে তনুশ্রীর উপরে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে, বোনের গৃহকার্য্যে সাহায্য করে রুণু, ছোট ভাই দুটিকে কাছে বসিয়ে পড়ায়। কিন্তু বেণু ভানু দু'ভাই সাহায্য করা দূরে থাকুক, নানা রকমে অপদস্থ করে দিদিকে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তনু মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে দাদার কাছে অভিযোগ করে। ক্রুদ্ধ রুণু তাদের দণ্ড দিতে উদ্যত হলে প্রথমতঃ উচিত শিক্ষা হয়েছে ভেবে সে উল্লাস অনুভব কর্‌তে চেষ্টা করে, কিন্তু ছোট ভাইদের কান্না শুনে পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে তাদের আড়াল ক'রে তাদের দণ্ড নিজের অঙ্গে তুলে নিয়ে তাদের রক্ষা করে। সেদিন কার বাগান থেকে আম চুরি ক'রে এনেছিল ব'লে তনু ভাইদের কান মলে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল পিঠে। বেণু দিদিকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল, আর দূর থেকে ভানু এমন জোরে একটা ঢিল ছুঁড়ে মার্‌ল যে, তনুর কপাল কেটে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে রক্ত পড়তে লাগ্‌ল। দু'হাতে কপাল চেপে ধ'রে কেঁদে উঠ্‌ল তনু। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে দু'ভাই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়, আর দাদার সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে সন্ধ্যার পরেও বাড়ী আসে না।

রুণু এসে বোনের কপালের ক্ষত দেখে কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে তনু বলে যে, একটুক্‌রো ইটের উপর প'ড়ে গিয়ে তার কপাল কেটে গেছে। রুণু আইডিন্‌ আর তুলো দিয়ে বোনের কপালে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দেয়।

রাত্রি অবধি ভাইদের বাড়ী না ফির্‌তে দেখে রুণু তাদের খুঁজে নিয়ে এসে পিঠে চাবুক মারে। দিদিই যে তাদের নামে লাগিয়েছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তারা দিদির উপর আরো চ'টে যায়।

সেদিন বেলা গড়িয়ে গেছে, সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ ক'রে ভাত বেড়ে তনু খেতে বসেছে। কার ক্ষেত থেকে গোটা দুই ভুট্টা তুলে এনে আদেশের সুরে ওরা দিদিকে সেগুলো পুড়িয়ে দিতে বলে।

উনুনে আঁচ নেই, বিকেলে উনুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেবে আশ্বাস দিয়ে তনু তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করে।

'না—ঘুঁটে ধরিয়ে এক্ষুণি পুড়িয়ে দিতে হবে।' জেদ করে ওরা। তনুও রেগে যায়, মুখ ভেংচিয়ে বলে, 'এক্ষুনি পুড়িয়ে দিতে হবে, কেন আমি কি তোদের হুকুমের চাকর না কি? লেখা নেই, পড়া নেই, কেবল গুণ্ডামি, দাদা এলে সব কথা আজ ব'লে দেব।'

'বলাটা বের করছি তোমার',—তনুর সাম্‌নে থেকে ভাতের থালা নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দেয় দু'ভাই।

ক্ষিদের সময় মুখের গ্রাসের এই দুর্গতি দেখে রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলে তনু, আর দাদা বাড়ী

ফিরে এলে সালংকারে তার কাছে অভিযোগ জানায়। বেত মেরে রুণু ওদের পিঠ ফুলিয়ে দেয়, ওদের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তনুও কাঁদে, আর ভাইদের নামে দাদার কাছে কোনোদিন নালিশ করবে না ব'লে মনে মনে সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করে।

এর পর বেণু আর ভানু প্রতি পদে পদে দিদিকে অপদস্থ করে। উনুনে আঁচ দিলে জল ঢেলে উনুন নিভিয়ে রাখে; সময়মত ভাত না পেয়ে তনুকে তিরস্কার ক'রে না খেয়ে রুণু অফিসে চলে যায়, চোখের জল ফেলে তনুও উপবাসী থাকে। তনু ঘুমিয়ে থাকলে কাঁচি দিয়ে তার চুলের বিনুনির খানিকটে কেটে দেয়, চিরুণী লুকিয়ে রাখে, শাড়ী ছিঁড়ে দেয় গোপনে। ছোট মেয়ে তনু একেবারে

অস্থির হয়ে উঠল। কোনোদিন নিজেকে সংযত করতে পারে, কোনোদিন পারে না, দাদার কাছে ব'লে দিয়ে ভাইদের মার খাওয়ায়। শাস্তি পেয়ে ওরা দমে না, দিন দিন ওদের অত্যাচার বেড়েই চলে।

তনু বেশ বড় হয়ে উঠেছে। মাথার উপরে কোনো অভিভাবক নেই ব'লে ওদের মামা অল্প বয়সেই ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক করলেন। বিয়ের দিন এগিয়ে এল। নিকট-আত্মীয় যাঁরা ছিলেন শুভকার্য্য নির্ব্বাহ করবার জন্য তাঁরা সকলে এসে সমবেত হলেন তাদের বাড়ীতে। পাড়াপড়শীরাও এগিয়ে এল। সকলেই বেণু আর ভানুর সঙ্গিন অবস্থার কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এতদিন দিদিকে তারা যত দুঃখ দিয়েছে, এখন তার ফলভোগ করবে। বিয়ের পর দিদি তো পরের বাড়ী চ'লে যাবে, তখন টের পাবে। ক্ষিদের সময় কে সামনে দুটি ভাত বেড়ে দেবে, দাদা মেরে খুন ক'রে ফেললেও ধরবার কেউ থাকবে না। যেমন ওরা দুর্বিনীত তেমনি শাস্তি হবে। বেশ হবে।

প্রথমটা গায়ে না মাখ্‌লেও আস্তে আস্তে কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে ওরা ম্লান হয়ে আসে, কিন্তু তার পরেই মাথা নেড়ে বলে, 'বিয়ে হলেই পরের বাড়ী যাবে, বাঙ্গালকে তোমরা হাইকোর্ট দেখাতে এসেছ! কেন, ঐ যে ওদের বাড়ীর কামিনীর সেদিন বিয়ে হ'ল, সে তো শ্বশুরবাড়ী যায় নি, বরকে নিয়ে ওর মায়ের কাছেই আছে।'

ওরা বলে, 'কী বোকা তোরা! কামিনী তার মায়ের একটি মাত্র মেয়ে, তাই ওর বর ঘরজামাই হয়ে আছে। তোর দিদির বর তো আর ঘরজামাই থাকবে না, শ্বশুরবাড়ী যেতেই হবে তার।'

তবু নিরুৎসাহ হয় না দু'ভাই—'আর ক্ষুদী? ক্ষুদীও তো শ্বশুরবাড়ী যায় না, সে-ও তো ওর ভাইদের কাছেই থাকে!'

'ছেলের বুদ্ধি দেখ! ক্ষুদীর বর ওকে খেতে দিতে পারে না, রোজগার নেই ওর! তাই ক্ষুদী তার ভাইদের কাছে থাকে। তোর দিদির বরের তো দোকান আছে, তাতে তার ভাল আয় হয়, তোর দিদি ভাইদের কাছে থাকবে কোন্ দুঃখে?'

দু'ভাই তবু হাল ছাড়ে না। দিদিও তো মা বাবার একই মেয়ে, কাজেই তার বরই বা 'ঘর-জামাই' থাকবে না কেন? ক্ষুদীর বরের মত দিদির বরও হয়তো দিদিকে খেতে দিতে পারবে না। দোকান আছে তো বয়েই গেছে! দোকান তো ভেঙ্গেও যেতে পারে, পুড়ে যাওয়াও তো অসম্ভব নয়। যে ক'রেই হোক্ ক্ষুদীর বরের মত দিদির বরকেও নিশ্চয়ই অকর্ম্মণ্য হতে হবে। আল্‌বৎ! দিদিকে এখানেই থাকতে হবে।...নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ঘুড়ির সুতার তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে মনোযোগ দেয়।

বিয়ে হয়ে গেল তনুশ্রীর। বেণু আর ভানু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দিদির যাত্রার আয়োজন দেখে। সকলে দিদির চুল বেঁধে আল্‌তা পরিয়ে দেয়, চন্দন দিয়ে কপাল চিত্রিত করে, তার মাঝখানে দেয় সিন্দূরের টিপ। দিদিকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত, এত যত্ন কেউ কখনো তাকে করে নি।

বেনারসী শাড়ী আর গহনা দিয়ে সবাই দিদিকে কী সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দিল, এ যেন তাদের সে দিদিই নয়!

ওদের বাড়ীর কাছেই নদী। নদীর ওপাড়ে তনুর শ্বশুরবাড়ী। ঘাটে খানকতক নৌকা বাঁধা ছিল। উলু দিয়ে আর শাঁখ বাজিয়ে ওরা দিদিকে নদীর ঘাটে নিয়ে গেল। বেণু ভানুও ওদের পেছনে পেছনে গিয়ে নিঃশব্দে দিদির কাছে দাঁড়াল। ভাই দুটিকে জড়িয়ে ধ'রে তনু যখন চীৎকার
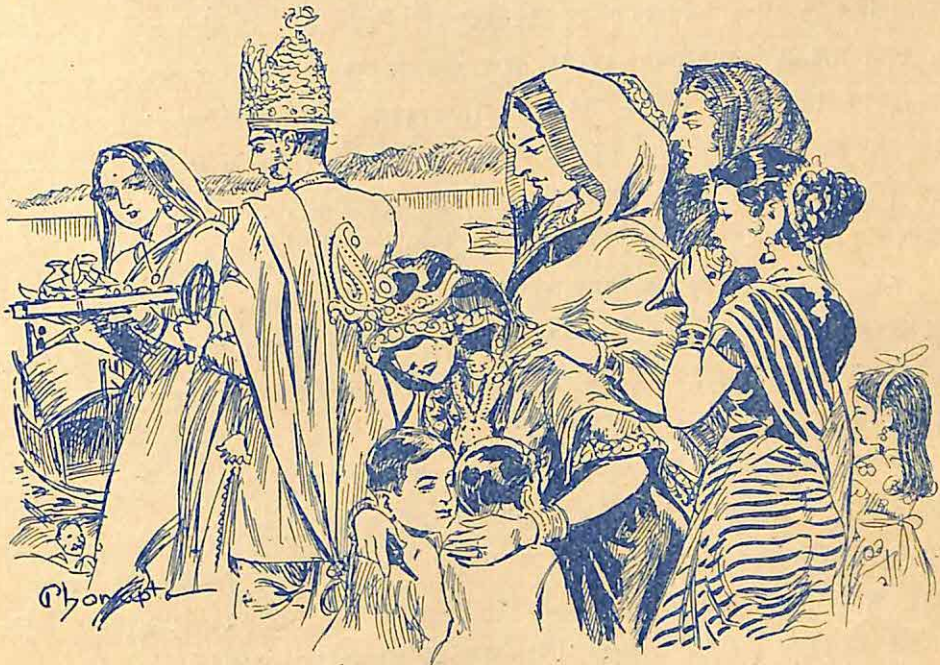
ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, তখন ওরা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রইল, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়্‌তে দিল না। ক্ষুদীর বরের মত দিদির বরের অক্ষমতার সম্ভাবনাকে ওরা আঁকড়ে ধ'রে রইল।

ধীরে ধীরে নৌকাগুলো পাড় থেকে দূরে স'রে যেতে লাগ্‌ল, নৌকার পেছনে আঁকা হতে লাগ্‌ল জলের আল্পনা। সূর্য্যের বিদায় বেলার সোনালি কিরণ নদীর ঢেউএর মাথায় মাথায় নেচে বেড়ায় দুরন্ত শিশুর মত।

আরো এগিয়ে যায় নৌকাগুলো, আরো—আরো। বর্ষার নদীর স্ফীত প্রশান্ত বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ক'রে নৌকাগুলো এগিয়ে যায়। যে নৌকাখানায় ওদের দিদি আছে, অন্য নৌকাগুলোর সঙ্গে সেখানা তারা মিশিয়ে ফেলে। ওরি মধ্যে, কোন্‌খানায় ওরা জানে না, দিদি ব'সে ব'সে ওদের জন্য কাঁদ্‌ছে। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই কাঁদ্‌ছে! এ পৃথিবীতে দিদির মত তো আর কেউ তাদের ভালবাসে না! তারাও দিদিকে কত ভালবাসে!

সঙ্গোপনে তাদের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। ছোট হতে হতে নৌকাগুলো একসময় আকাশের শেষ প্রান্তে মিশিয়ে যায়, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। ধনুকের মত বাঁকা চাঁদ উঠে আসে আকাশে। তারা ওঠে অনেকগুলো, গাছের পাতা কাঁপিয়ে বাতাস বইতে থাকে,·· কিন্তু ওদের দিদি? নৌকাগুলো দিদিকে নিয়ে চ'লে গেছে,—কোথায়?—কতদূরে?

সকলেই বাড়ী ফিরে গেছে, নদীতীরে বসেছিল শুধু সেই দুরন্ত দুটি ছেলে। যেদিক দিয়ে ওদের দিদি চ'লে গেছে, নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে ওরা স্থির হয়ে ব'সে আছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কুল্‌-কুল্‌ করে নদী কি বলে ওরা বুঝ্‌তে পারে না। অনেক রাতে রুণু এসে ওদের ডেকে নিয়ে যায়। ওদের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে কেউ একবার 'আহা' বলে না, একটু সান্ত্বনা দেয় না, সহানুভূতি ক'রে কেউ একবার কাছে ডাকে না। দিদির প্রতি ওদের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ ক'রে প্রত্যেকেই ওদের অন্তরের গভীর ক্ষতস্থানকে দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে যায়। উদ্বেলিত ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসকে সংযত ক'রে তবু ওরা ঠোঁট চেপে রাখে।

অল্প আয়ে তনুর শ্বশুরের সম্পূর্ণ দাবী মেটাতে পারে নি রুণু। তাই নিয়ে তনুর শ্বশুরের সঙ্গে তার মনান্তর হয়। বিয়ের পর শ্বশুর নিস্ফল আক্রোশে বউকে আর ভাইদের কাছে আসৃতে দেয় না! মা-বাপহারা এই ভাইবোন ক'টির এই আকস্মিক বিচ্ছেদ যে কত মর্ম্মান্তিক, দু'-এক ভরি সোনার লোভে সে কথা তারা ভুলে যায়!

তারপর একদিন একদিন ক'রে চ'লে গেছে অনেক দিন। বেণু-ভানুর দিদি আর ফিরে আসে নি। এখনো বিকেল হলে দু'ভাই নিঃশব্দে সেই নদীর তীরে এসে বসে, তাদের দিদিকে নিয়ে নৌকাগুলো যেদিক দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই দিকে। ক্ষুদীর বরের মত দিদির বর যে দিদিকে খেতে দিতে অক্ষম হয় নি, এতদিনে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে তারা। সায়াহ্নের রশ্মি-মণ্ডিত উচ্ছ্বসিত নদীর সীমারেখার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে নিঃশব্দে তারা ব'সে থাকে। ওদের সারা অন্তর শতকণ্ঠ খুলে বলে, 'দিদি, তুই ফিরে আয়, ফিরে আয়! আমরা তোকে আর কোনো দুঃখু দেব না!'

নদীর ওপাড়ের গ্রামে অপরাহ্ণ বেলায় জল নিতে এসে যেদিক্‌ দিয়ে তার নৌকা এসে ঘাটে ভিড়েছিল, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে তনুও তার ওপাড়ের ভাই দুটিকে দেখ্‌তে চায়। নদীর জলে কলসী ভাসিয়ে দিয়ে, নদীর অশান্ত বুকের উপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বলে, 'বেণু-ভানু ভাইরা আমার! দিদিকে কি তোরা ভুলে গেছিস্? দাদার কাছে নালিশ ক'রে আর কখ্‌খনো তোদের আমি মার খাওয়াব'না ভাই!'

নদী এপাড়ের চোখের জল ব'য়ে নিয়ে যায় ওপাড়ে, ওপাড়ের পাখী উড়ে আসে এপাড়ে···

স্বর্গ ও নরক

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গ কোথায়! কেউ কি দেখেছে, জানো?
নরক কি কেউ দেখিয়াছে রসাতলে?
তবুও সবাই, কথায় কথায় শুনি,
স্বর্গ নরক, আরও কত কিছু বলে!
শুনেছি সেকালে রাবণ রাজার ভয়ে,
দেবতারা সব কাঁপিয়া উঠিত নাকি!
স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধেছিল বাহুবলে;
মরণের আগে গোটা কয় ছিল বাকি!
দশমাথা আর কুড়িখানা হাত নিয়ে,
যুঝিয়া করিত দেবতারে জড়সড়।
দানব-শক্তি দেখিয়া কাঁপিত সবে,
মানবের চেয়ে বাহুবলে সে যে বড়!
শক্তি যাহার করতল-গত সদা,
ইচ্ছা করিলে শাস্তি যে দিতে পারে;
দেবতারে হানি নির্মম কষাঘাতে,
স্বর্গের রথ সেই বেঁধে রাখে দ্বারে।
যত পায় হাতে, নিতি যায় তত বেড়ে,
শক্তি-সাহস-শৌর্য্য সহায় তার।
সোনার পাহাড়ে স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধে;
জয়গানে হয় মুখরিত চারিধার।

মাটির রাজ্যে স্বর্ণলঙ্কা গড়ি,
স্বর্গরাজ্যে করে সে যে উপহাস!
নরকের ভয়ে জড়সড় যারা সবে,
নিরালায় বসি রচে তার ইতিহাস।
সহসা দানব অন্ধ গর্ব্বভরে
হানে যে আঘাত মানুষের চেতনায়,
ফিন্‌কি তাহার অলক্ষ্য অবসরে
সোনার লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছাই!
স্বর্গের সিঁড়ি বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়ে,
শাণিত কৃপাণ মরিচায় হয় ক্ষীণ;
হীরক কিরীট লুটায় ধূলার 'পরে,
ধ্বংসের স্রোতে ধীরে হয় সব লীন।
শতেক যজ্ঞ সমাপন করি যে বা
ক্রয় করি' লয় স্বর্গের অধিকার,
মানুষের ক্ষীণ বেদনার অভিশাপে
নরক-যাতনা সহি করে হাহাকার!
নিশীথ প্রহরে প্রাসাদের বাতায়নে,
ক্রন্দন শুনি যযাতি সহসা জাগে;
স্বর্গ-পিয়াসী রাজার মুক্তি লাগি,
রিক্তের দ্বারে করুণা ভিক্ষা মাগে!

স্বর্গ নরক দূরে নয় ওরে শোন,
নয় মেঘলোকে, নয় তো সে রসাতলে।
এই তো স্বর্গ, এইখানে ঘরে ঘরে
স্নেহ-প্রীতিভরা কুটীরের ছায়াতলে।
গর্ব্বে যেথায় নাই কোন হানাহনি,
নাই কানাকানি গোপন ঈর্ষা যেথা ;
অন্তর দিয়া অন্তর করি জয়,
মানুষে মানুষে মিতালি গড়িল সেথা।
সেখানেতে ওই ছাতিম ছায়ায় বসি,
নিদাঘ দুপুরে বৃদ্ধ কৃষক ধীরে
বাঁধিছে যতনে মাথালি টোপর-ছাতা,
পল্লী বালিকা বসেছে তাহারে ঘিরে।
বুনে চলে কোন রাখাল শিশুর লাগি
তালের পাতার ছাতাটি আপন মনে,
সূতার বাঁধনে স্নেহের বাঁধন বাঁধে
নিবিড় মমতা মিশায়ে সংগোপনে!
মহুয়ার বনে বাতাস খুঁজিয়া ফেরে
দুরন্ত শিশু শ্রান্ত আতপ তাপে,
আমের বাগিচা মুখরিত করি যেথা
চপল কিশোর নিদাঘ প্রহর যাপে।
শরতে যেথায় পথের দু'পাশ ছেয়ে
সবুজ ঘাসের গালিচায় থরে থরে,
হলুদ বরণ কেশরে কল্কা আঁকি,
বৈঁচি-পিয়াল-বাব্লার ফুল ঝরে।
আলো করে দীঘি শাপলা-কমল-দল,
আমন ধানের সৌরভে ভরে মাঠ ;
শাদা পাল তুলে সারি সারি ডিঙা চলে,
গ্রামে গ্রামে বসে নব বেসাতির হাট।

প্রাচীন বটের স্নেহ-সুশীতল ছায়ে
যেথা ব'সে ওই রামায়ণ পড়ে মাঝি,
ষষ্ঠীতলায় অশথের পাদ-মূলে
আসে শত বধূ জননীর বেশে সাজি ;
তারি আশেপাশে পাতার ছাউনি ঘেরা
লতা-গুল্মের গুণ্ঠন-আবরিত,
স্নিগ্ধ শ্যামল ছোট ভিটেখানি ওই
স্নেহ অনাবিল হাসি গান মুখরিত ;
সেই তো স্বর্গ! দেবতার নিকেতন!
মাটি দিয়ে গড়া সোনার লঙ্কাপুর!
আকাশেতে নয়, স্বপন রাজ্য সেই ;
কল্পলোকের জল্পনা বহু দূর!
ওই চেয়ে দেখ মাটির উঠানখানি!
আল্পনা দিয়া গ্রামের বধূরা তায়,
ইন্দ্রপুরীর স্বপন রচিয়া যেন
হাতছানি দিয়া চাঁদেরে ডাকিতে চায়।
স্বর্গ তো নয় বহুদূর গ্রহলোকে,
স্বর্গ যে তোর মনের কিনারে ভাসে।
আঁচলে বাঁধিয়া রেখেছিস কাঞ্চন ;
মিছে কেন তবে খুঁজিস্ হতাশ্বাসে?
নরক কোথায়? পাতালে অন্ধকারে?
ভুল কথা ওরে! স্বর্গের আশে পাশে
বাসা বাঁধে যত বিষধর সাপ চুপে,
ফেনিল তাদের বিষাক্ত নিশ্বাসে
শুকাইয়া যায় নন্দন-মন্দার,
গরলে ভরিয়া ওঠে অমৃত ধারা।
দিকে দিকে জাগে মরণের কলরব,
স্বর্গের বুকে নরক গড়ে যে তারা!

যোগাসন

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

সর্বজনীনতলার কর্মকর্তাদের এবার, ভাই, খুব সুখ্যেত হয়েছে। আর আর বছরের মত পাড়ার দলের থেটার, বেপাড়ার দলের যাত্রা, এসব ছাড়াও একদিনকের সন্ধেয় তাঁরা যোগীগুরুর খেল্‌এর ব্যবস্থা করেছিলেন। একরাশ টাকার বায়না হয়েছে, টাকার অঙ্ক শুনে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছে উঠেছিল; তারপর শুনি, সেও নাকি কম টাকা! কার যেন খাতিরে গুরুদেব ওই টাকাতেই খেল্‌ দেখাতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু ওসব দেখে কী যে মুণ্ডু হবে তোমার··· যাক্‌গে! আমার কী!

ছেলেবেলার থেকেই, ভায়া, ও সবের বিরোধী আমি। বাবা বলতেন, "ভদ্দরলোকের ছেলে, মাস্‌ল তুলে, চোয়াড় সেজে, ওসব কী গুণ্ডামি! ওতে মগজ খারাপ হয়। ভদ্দরলোকের মূলধনই হোলো মগজ। মগজের জোরেই তো সাহেব-সুবোর আপিসে ভদ্দরবাবুদের অত আদর-কদর।"

বাবার কড়া শাসন ছিল তেমনি আমার মগজের ওপর। রোজ ভোরবেলার থেকে আর রাতের দশটা অবধি শুধ্‌ধু পড়ো, আর ইস্‌কুলে গিয়ে পড়ো, আর বাড়িতে ব'সে পড়ো। একদিন ইস্‌কুলের দলের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম মাঠে, বাড়ি ফিরতে, ভাই, সন্ধে উত্‌রে গিছ্‌ল। কী ঠ্যাঙানই ঠ্যাঙালেন বাবা, ইস্‌স্‌! আর একদিন ইস্‌কুল থেকে ফিরছি আখড়ার পাশ দিয়ে। উঁচু খুঁটির মাথায় আড়া ফিট্‌ ক'রে তাতে লোহার আংটা ঝুলিয়ে, সেই আংটা ধ'রে শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে গুণ্ডাগুলো, পাঁচিলের এদিক থেকে তাই দেখছিলাম, ভাই, দাঁড়িয়ে। বাবা ফিরছিলেন আপিস থেকে, কানে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এলেন বাড়ি অবধি। বোঝো!

ফলও হয়েছিল নিগ্‌ঘাত। ফি বছর অঙ্কে গোটা একশো পেয়ে ফাস্ট হয়েছি, আর অঙ্কের লম্বা নম্বরের দরুন আর সবাইকে ডিঙিয়ে ক্লাসেও হয়েছি ফাস্ট। ম্যাটরিকে বড়-ছোট দু অঙ্কতেই 'লেটার' পেয়েছি। অঙ্কের মাস্টার যোগেনবাবু তো আমার অঙ্কের কেরামতি দেখে কথায় কথায় আশীর্বাদ

করতেন, "বাবা, তুমি জজ-ম্যাজেস্টর হবে।" অঙ্কে গাড্ডুশ-মারা হনুমানের দল তাই আমার নামই দিয়েছিল গিয়ে 'ম্যাজেস্টর'।

আর গুণ্ডামির যে কী ফল, তারও একেবারে জাজ্জল্যি প্রমাণ ছিল হনুমান। হনুমান তার নাম নয় অবিশ্যি। কিন্তু সে আমার মুখের ওপরই বরাবর ম্যাজেস্টর ব'লে ডাকত কিনা। আমি যদিও তাকে সামনাসামনি হনুমান ব'লে ডাকতাম না, পেছনে কিন্তু, ভাই, তাকে হনুমান ছাড়া আর কিছুই বলতাম না, ঘেন্নায়। গুণ্ডার সঙ্গে মারপিট করার সাহস আমার কোনকালেই নেই, ভাই, কোন্ ভদ্দরলোকেরই বা তা থাকে? কিন্তু তা নেই বলেই তো আর ক্লাসের ফার্স্ট বয় গাড্ডুশ-মারা হনুমানের চেয়ে ছোট হয়ে গেল না? কী বলো!

যোগেনবাবু বলতেন, "অঙ্কের পেত্থম কথাই হচ্ছে, বাবা 'যোগ'। কেন, 'যোগ' কেন? আর কিছুও তো হতে পারত। কিন্তু না, তা নয়। 'যোগ'ই হচ্ছে অঙ্কের পেত্থম কথা। তার মানে কী? যোগসাধনা। অঙ্কের সাধনা হচ্ছে, তোমার যোগসাধনা—কি না—তপিস্যে। সেই সাধনপথ থেকে মতি টলেছে কি, ব্যস্ হয়ে গেল। ওই ছ্যাখোনা হনুমানের দশা। মোট বয়েও যদি ভাত জোটে ওর।" বেহায়া হনুমানটা বলত, "তাই তো শরিলটাকে শক্তপোক্ত করে নিচ্ছি স্যর, মোট বইবার যুগ্যি করছি; দেখি যদি ভাত জোটে।"

হনুমানটা বছর বছর ফেল্ মারত। দু বছর তিন বছর ক'রে থাকত তোমার এক এক ক্লাসে। তাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোতো না শুধু তার খেলার জন্যে। খেলায় ধুলোয় আর যত্তো রকমের ডানপিটেমিতে ছিল ওটা, ওই যাকে বলে, মূর্তিমান হনুমান। অঙ্কে সত্যি, যোগে অবধি ভুল করত। আমিও তার সঙ্গে এক বছর পড়েছিলাম, ভায়া! কী সাজাই না দিতেন যোগেনবাবু তাকে! বেন্‌চিটা যে বসবার জায়গা, তা বোধ হয় জানাই ছিল না হতভাগার। সব ঘণ্টাতেই বেন্‌চির ওপর তাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হোতো। যোগেনবাবু বলতেন, "উঁহুঃ, ও তো ওর অব্যেশ হয়ে গ্যাছে, অত সহজে আমি ছাড়ছি নে।" নানান কায়দায় শাস্তি দিতেন তিনি। কোনদিন দেখা যেত, দু'পা কাঁচি ক'রে ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়ে, দু' হাতে দু' কান ধ'রে শুয়ে আছে মেজের ওপর। পা ফাঁক করার সাজাই ভারি মজার হোতো ভাই! যোগেনবাবু হুকুম করতেন, "এদিকে আয়। পা ফাঁক ক'রে দাঁড়া। আরো ফাঁক কর—আরো—আরো—আরো—"

আরো আরো, তার চেয়েও আরো ফাঁক করতে করতে শেষটায় সটান সরল দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে মেজের ওপর ব'সে পড়ত হনু, দাঁত দেখিয়ে বলত, "আর ফাঁক নেই, স্যর!"

দশ-পনরো মিনিট ওভাবে থাকার পরেই, বুঝলে, থর্থর ক'রে তার সারা গা কাঁপত, গল্‌গল্ ক'রে ঘাম দিত গা দিয়ে। শেষে আমরা সবাই মিলে, ভাই, মাফ চেয়ে নিতাম স্যরের কাছে, তবে সে ছাড়া পেত।

হাঁটুভাঙা 'দ'এর মত 'চেআর' হয়ে থাকা তো ছিল সবচেয়ে সহজ সাজা তার।

একদিন, হয়েছে কী, অঙ্কের ঘণ্টার, তোমার গিয়ে, আগের ঘণ্টায় বেন্‌চির ওপর দাঁড়িয়েছিল হনু, তারপর অঙ্কের ঘণ্টা শুরু হতেও বেন্‌চির ওপর থেকে নামতে ভুলে গেছে। যোগেনবাবু ক্লাসে ঢুকেই দেখে বললেন, "ও তো তোমার জলযোগের সামিল হয়ে গেছে। কী সাজা দিলে ঠিক হয় বল তো ?"

হনু চট্‌ ক'রে ব'লে বসল, "সোজা দাঁড় করিয়ে যদি সুখ না পান, তো উল্‌টো দাঁড় করিয়ে দিন্‌, স্যর !"

ভুরু কুঁচকিয়ে স্যর্‌ বললেন, "কী রকম ?"

হতভাগা বেন্‌চির ওপর থেকে নেমে এল। মেজের ওপর মাথার তালুর ভর রেখে, আর দু' হাতে মেজেতে ঠ্যাক্‌না রেখে, সোজা ওপর দিকে জোড়া পা তুলে দিয়ে, সিধে একেবারে অনড় হয়ে রইল।

সোজা খাড়া হয়েই, ভাই, পাঁচ মিনিট থাকতে পারি নে, ওল্‌ট্‌ খাড়া হয়ে ও কতক্ষণ থাকবে, বলো ? হাজারই হোক্‌-না হনুমান। খানিক পরেই তো থর্‌থর কাঁপুনি আর গল্‌গল্‌ ঘামুনি শুরু হয়ে গেল, দু' চোখ হয়ে উঠল লাল যেন জবাফুল। তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলাম, "নাবিয়ে দিন্‌, স্যর, নাবিয়ে দিন্‌, এক্ষুনি রক্ত মাথায় উঠে বেমক্কা কাণ্ড ঘটে যাবে।"

নাববার হুকুম দিলেন, তবে রক্ষে।

ছোঁড়ার সাহসও ছিল, ভাই, বলিহারি। একদিন মুখের ওপর যোগেনবাবুকে জিগ্‌গেস ক'রে বসল, "স্যর, আপনি নিজে এত অঙ্ক জেনেও জজ্‌-ম্যাজেস্টর হলেন না যে ?"

দু' চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল যোগেনবাবুর ; কিন্তু, অঙ্কের মাথা তো, অমন কথায়ও গরম হোলো না। একেবারে মুখের মতই জবাব দিলেন, "সবাই যদি জজ-ম্যাজেস্টর হবে, তা হলে জজ-ম্যাজেস্টর তৈরি করবে কে, হনুমান ?" তারপরেই বুঝলে, হুকুম দিলেন, "নেমে আয় ! দু'পা জোড় ক'রে দাঁড়া। হাঁটুতে কপাল ঠেকিয়ে দে—হ্যাঁ, ঠেকিয়ে রাখ। হাঁটু ভেঙেছে কি বেতিয়ে লাল ক'রে দেবো। দাঁড়িয়ে থাক ওইভাবে। রস তোর নিংড়ে বেরোক।"
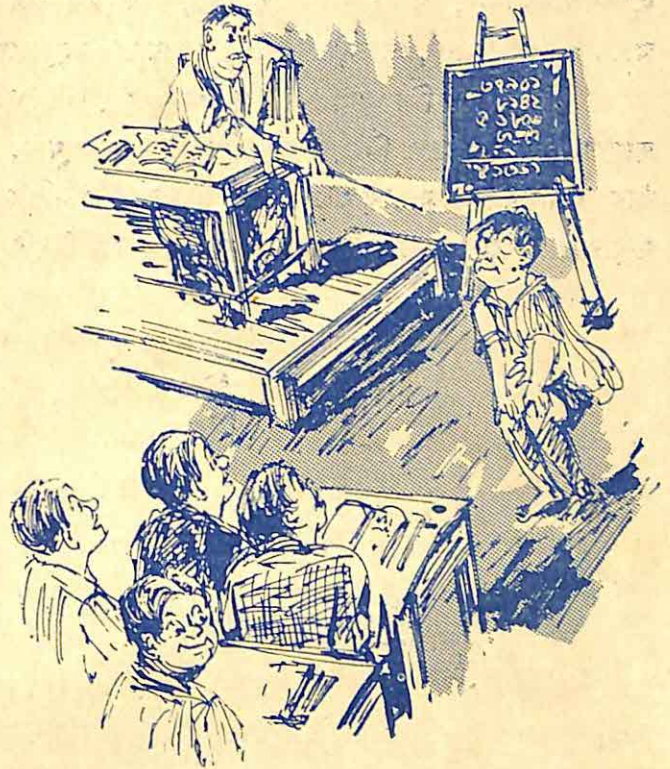
কিন্তু হনু তো না হয় হনুমান হোলো, আমিও তো, ভাই, জজ-ম্যাজেস্টর হতে পারলাম না। অঙ্ক নিয়ে আই-এ পাস করলাম, তোমার, ফার্স্ট ডিভিসনে ; 'বি-এ'তে ফার্স্ট ক্লাস্ পেলাম ওই অঙ্কে 'অনার্স' নিয়ে। সরকারী মহলে ধরাধরি ক'রে, ভাই, বাবা আমার সাগরপাড়ি দেবার ব্যবস্থাও একরকম, তোমার, পাকা ক'রে ফেললেন, কিন্তু সব কেঁচে গেল, ভায়া, হনুমানজির অভিশাপে। স্বাস্থ্যের অবস্থা, মানে, শোচনীয় ব'লে বিলেত যাবার মঞ্জুরি পেলাম না। বোঝো বরাতের ঠ্যালা।

তারপর চাকরির বাজার। যে আপিসেই যাই, ওই এক কথা—"মেরিট্ তো ভাল, কিন্তু স্বাস্থ্যটি যে একেবারে পাকিয়ে তুলেছ, বাবা!" কোত্থাও, ভাই, কিছু জুটল না। শেষে বাবাই তাঁর আপিসের বড়বাবুকে ধ'রে ঢুকিয়ে দিলেন কেরানিগিরিতে। তারপর আমারও চাকরির শুরু, বাবারও জীবনের শেষ। আশাভঙ্গে হার্টফেল্ ক'রেই বুঝি মারা গেলেন। সেই থেকে চলেছে, ভায়া, আজ সতেরো বছর—সেই একই আপিসে।

আর, এ সতেরোটি বছর ধ'রে দেখলাম, ভাই, সব মিছে। অত যে অঙ্ক কষেছি—ঐকিক, ত্রৈরাশিক, দশমিক, পৌনঃপুনিক, বীজগণিতের আখরে আখরে আঁক, সেইসব বিঘেজোড়া সমীকরণ—সব ঝুট্ হ্যায়, সব মিছে। সত্যি শুধু যোগ। সতেরো বচ্ছর ধ'রে আপিসের আধমণী খাতায় চলছে শুধু টাকা-আনার যোগ ; শুধধু অ্যাতোয় অ্যাতোয় অ্যাতো আর হাতে রইল অ্যাতো। আর চলছে বিয়োগ—খাতায়ও, দেহেও।

কিন্তু সে যোগও আর চলছে না, ভাই, সব মুছে ঘুচে আজ বিয়োগে এসে ঠেকতে চলেছে।

সেদিন আপিসের সারাদিনের যোগের ফল খাতাবন্দী ক'রে বড়বাবুর টেবিলে সমর্পণ ক'রে, হাজ্‌রিখাতায় '৫টা' লিখে সাতটায় বেরিয়ে এসেছি। পরদিন, ভাই, আবার আপিসে গিয়ে বেশ নিশ্চিন্দি মনেই যোগ ক'রে চলেছি, এমন সময় বড়বাবুর টেবিলে তলব হোলো। গিয়ে দেখি, মারমুখো ভাব। আগের দিনের জমা-দেওয়া খাতাটি খুলে, লাল পেন্‌সিলে কুরুক্ষেত্তোর করা জায়গাটি দেখিয়ে তিরিক্ষি গলায় বললেন, "টাকা-আনার যোগ, তাতেও যদি পাকাখাতায় এমন ভুল করেন, চাকরি তা হলে ছেড়ে দিন্, মশাই!"

বলতে আর তা হলে কী বাকি রাখলেন, বলো। যা বললেন, তাই যদি, ভাই, একদিন লিখে দেন, তা হলেই তো হয়ে গেল খতম। মনে মনে শুধু বলতে লাগলাম, "ধরণী, তুমি দ্বিধে হও, মা, আমি তোমার ফাটলে ঢুকে প'ড়ে লজ্জা জুড়োই, জননী!"

ক্লাসে ক্লাসে ফার্স্ট, ম্যাট্রিকে 'লেটার', 'আই-এ'তে ফার্স্ট ডিভিশন, 'বি-এ'তে অনার্স—কিসে? না, অঙ্কে! সেই আমাকে কিনা শুনতে হোলো, চোখ মেলে লাল দাগের মধ্যে দেখতে হোলো যে, যোগ অঙ্ক কষতে ভুল করি! সেই আমার কিনা যোগে ভুল!

আর তাও হবে না কেন, বলো, ভাই! অঙ্কের কারখানা হচ্ছে মাথা, সেই মাথা অষ্টপ্রহর ঘুরছে। চব্বিশ ঘণ্টা পায়ের তলায় ধরণী টলমলো, চোখের সামনে সরষেফুল, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ, শির দপ্‌দপ্‌। এ বয়সেই মাথায় টাক পড়েছে ওই জন্যেই না?

চোখের চশমার কাঁচ তো যেন, তোমার, আতসী কাঁচ, সূর্যের আলোয় তা দিয়ে টিকে ধরানো যায়। ভয়ে কোনদিন টিকে ধরিয়ে অবিশ্যি দেখি নি—পাছে সত্যি ধ'রে যায়।

চোখের সঙ্গে নাকি দাঁতেরও সম্পর্ক। দাঁত, ভাই, নড়ে হালে দোলে, কথা বলতে গেলে দাঁতের ডগায় কথা কাঁপে, কথা ফস্‌কে যায়। দাঁত অনড় থাকবেই বা কিসের জোরে? মাড়িতে যে, তোমার, পাইওরিআ! নিজের মুখের গন্ধে—মানে, 'আপন গন্ধে মম' নিজেই 'আকুল' হয়ে থাকি। কফো রোগীদের নাকি মুখে গন্ধ—মানে, দুর্গন্ধ—এমনিতেও হয়।

মুখকেই যদি, ভায়া, নাকের কাজ করতে হয়, তারই আর অপরাধ কী? শ্বাস নিতেও হয় মুখ দিয়ে, ছাড়তেও হয় মুখ দিয়ে। নাক তো সর্দিতে সর্বক্ষণই বোজা। সর্দি মুছে মুছে নাকের ডগায় কড়া পড়ে গেছে। গলার ভেতর তো, ভাই, সর্বক্ষণই ঘড়ঘড় করছে আর সাঁই-সাঁই করছে।

গলার নালীই তো ফুস্‌ফুসে নেমেছে, কফে কফে ফুস্‌ফুসের বারোটা বেজে গেছে। হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি তো মাঝে মাঝেই থেমে যায়, এখন, ভাই, বরাবরের জন্যে থেমে গেলেই নিশ্চিন্দি। সেদিন তো বড়বাবুর হাঁচির শব্দে এমন খানিকক্ষণ ধ'রেই থেমে রইল যে, ভাবলাম বুঝি হয়েই গেল।

পেট গরমের ফলেই নাকি কফের আক্রমণ। মানুষের পেটে নাকি খিদের আগুন জ্বলে; আমার কিন্তু, ভাই, ঠিক তার উল্‌টো। নিখিদের গরমে আমার সারা পেট ছাড়িয়ে বুক, বুক ছাড়িয়ে গলা অবধি জ্বলছেই। খেলেও জ্বলছে, না খেলেও জ্বলছে। লিভারটা যে একেবারে জখমী লিভার কিনা, পেটের আর দোষ কী? আর পেট তো, তোমার, পীলেতে জুড়ে আছে, খিদে পাবার জায়গাই বা কোথায়? ওদিকে কোমর-টন্‌টন আর পিঠ-কন্‌কন তো, মানে, জন্মজোড়া হয়েই উঠল। পিঠ রয়েছে পেছন দিকে বেঁকে, কোমর ঠেলে রয়েছে সামনের দিকে, পায়ের ওপর দেহটা একটা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভায়া!

কোমর থেকে মাথা অবধি যে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—সেই ঢের। কোমরের দু'পাশে, মানে হচ্ছে, দু'পা যেখানে জোড়া লেগেছে, সেখানে তো, তোমার গিয়ে, দু'দিকেই সারাক্ষণ খটর-

মটর লেগেই আছে; আর কী ব্যথা রে, ভাই! কী-সব গড়বড় হয়ে গেছে ওইখানটাতে, ভাই, পেটের বায়ু বোধ করি দুই উরুতের ভেতরকার হাড়ের চোঙের মধ্যি দিয়ে ওঠানামা করে—তা নইলে উরুতের ভেতর কেন, তোমার গিয়ে, সবসময় শিরশিরানি লেগেই আছে?

আর, সেটা যে হাঁটু ছাড়িয়েও নিচের দিকে নামতে চায়, তাও টের পাই; তা নয় তো দু' হাঁটুতে দিবারাত্র মারামারি কাটাকাটির কেন বিরাম নেই, বলো। হাঁটু ভেঙে কোন্‌দিন 'দ'এর মত একেবারে ব'সে পড়ব চির তরে। হাঁটু থেকে আর পায়ের পাতা অবধি অতটুকু পা-ই তো আসলে বইছে দেহটা। ক'দিন বইবে আর? হয়ে এল। পায়ের গোছা উঠেছে দড়ি পাকিয়ে। দড়ি-পাকানো মোচড়টা রীতিমত টেরই পাই কিনা। পায়ের গাঁটের সঙ্গেই তো বাঁধা আছে দড়ির আর দিকটা। তাই পাকের তোড়ে গাঁট্ একবার এদিকে ঘুরছে—কট্, আবার ওদিকে ঘুরছে—মট্। তারই ব্যথা আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে একেবারে পাঁচ আঙুলের নখের ডগা অবধি।

ওই হাড় কট্‌মটে পায়ের পাতা আবার ফোলে! বোঝো ভাই! পা ঝুলিয়ে বসেছি কি—মানে, আপিসে পা ঝুলিয়ে বসতেই হয়—অমনি পা ফুলতে শুরু করল। জুতো যদি খুলে রেখেছি পা থেকে, খানিক পরে, ভাই, পা আর ঢোকাতে পারিনে জুতোয়। পায়ে নাকি রস নামে! কোত্থেকে যে নামে, তা তো বুঝিনে, ভায়া! তারপর আধঘণ্টা ধ'রে পা টান ক'রে রাখতে হয় ওপরদিকে—মানে, টেবিলের তলায় আর কি—কেউ না দেখতে পায়। পা টান ক'রে, দু'হাতে পা টিপে টিপে, তবে গিয়ে সেই পা জুতোয় ঢোকাবার জুগ্যি করতে হয়। বোঝো গেরো।

হাত দিয়ে যে টিপব, তারই কি জো আছে? গায়ের এক জায়গা টিপেছি কি বাকি সব জায়গা ডাক ছেড়ে ওঠে—আমায় টেপো—আমায় টেপো—ব'লে। কাকে টিপব? কোন্ জায়গা টিপব? কয় জায়গা টিপব? আর টিপব কী দিয়ে? হাতে কি আর জোর-বলের বালাই আছে? হাতেরও তো, তোমার গিয়ে, গোড়ার বলো, কনুইএর বলো, কব্জির বলো—ইস্ক্রুপ কব্জা সবই গেছে আলগা হয়ে। লিখতে গেলে হাত কাঁপে, ভাই, আঙুল কাঁপে। যোগ যে কষব, তার ফল লিখব কী ক'রে? যাবে, চাকরি বাকরি আর থাকবে না। হুড়মুড় ক'রে ক'রে আমি ভেঙেচুরে প'ড়ে যাব। গুষ্টিসুদ্দু না খেতে পেয়ে মরবে তখন, দেখো!

ওই আর-এক রোগ দাঁড়িয়েছে, ভায়া—মস্তিষ্কের রোগ আর কি—একটা কথা যদি শুরু করলাম তো তার ডালপালা ফ্যাকড়া জট্ বের ক'রে ক'রে শেষটায় আসল মূলকাণ্ডই হারিয়ে ফেলি। বলছিলাম সর্বজনীনতলার কথা, তার থেকে কিনা ছেলেবেলার ইস্কুল-কলেজ ঘুরে, আপিস ঘুরে, নিজের সংসার কোটরে এসে পৌঁছে গেছি! ভাগ্যিস্ আর কোন দিকে যাই নি। তবু ভাল। বাসার কাছে ব'লেই সর্বজনীনতলাটাতে, তোমার, আবার এসে পৌঁছনো গেল। গোলাকার ব্যাপার আর কি, তাতেই গোলযোগ, মানে, গোলেও যোগ।

যাকৃগে। যোগীগুরুর খেল্ দেখতে চাই নি, ভাই; কিন্তু সবাই ধ'রে নিয়ে গেল। বললাম, "কাহিল-মানুষ, ভিড়ের চাপে চিড়ে হয়ে যা'ব যে!" তা, ওরা খাতিরযত্ন ক'রে ভিড় বাঁচিয়ে, আগের দিকেই বসিয়ে দিল, ফাঁকায়। শিষ্য-শিষ্যা প্রভৃতি সমেত গুরুজি যখন মঞ্চারূঢ় হলেন, আমার তো দেখেই, ভায়া, ভিরমি লেগে গেল! প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম—নির্ভুলভাবেই চিনতে পারলাম যে, গুরুজি হচ্ছেন আমার ছেলেবেলার ইস্কুলের একটি বছরের সহপাঠী সেই হনুমান। যোগ কষতেও পারত না ব'লে যার ওপর যোগেনবাবুর অত মাস্টুরেপনা, সে-ই কিনা আজ দেশবিখ্যাত যোগী গুরু! মানে, ওর নাম হচ্ছে গুরুনাথ। অতগুলো চেলাচামুণ্ডা নিয়ে সে আজ সত্য গুরু হয়ে বসেছে! গুরু তো সে নামেই ছিল, এখন বলা যায়, গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিনতে একটুও ভুল হোলো না। সেই কালো রঙের চেহারাটি, কানের গোড়ায়, তোমার, গালের পাশে সেই বড় তিলটি—আমরা বলতাম, 'কালোর উপরে কালো'। মুখে, ওপর পাটির মাঝখানে. একটি দাঁতের ওপর আর একটি দাঁত টেরচে আছে। হাসিটি, ভাই, আজও তেমনি প্রাণ-খোলা, মানে, তেমনি আমুদে। ছাত্রদের খেলা-দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ও বক্তিতে করছে—কথায় কথায় হাসিয়ে মারছে সভাসুদ্ধ লোককে! চেহারাটা কী বানিয়েছে রে ভাই! পা থেকে মাথা অবধি যেন, তোমার, ছবিতে দেখা গ্রীস্ রোমের মূর্তি—কালো পাথরে খোদাই করা একেবারে।

কত রকমের যে কস্রত দেখাল, ভাই, তার দলের ছেলেমেয়েগুলো! সবকটাই নাকি তারই আখড়ায় তার নিজের হাতে তৈরি। বুকের ওপর রোলার নেয়া, কণ্ঠা দিয়ে রড বাঁকানো, বুকের ওপর হাতুড়ি ঠোকা, পেটের ওপর পাথর ভাঙা—তাজ্জব ব্যাপার সব! ছেলেমেয়েগুলোর চেহারাও যেন চা'লের বাজারের খবর রাখে না, ভায়া,—অ্যায়্সা, তোমার, তাগড়াই!

সবশেষে স্বয়ং গুরুনাথ তার যোগ-আসনের খেলা দেখাল। হায়, যোগেনবাবু, গুরুনাথ নাকি যোগ জানে না! উল্টে পাল্টে, বেঁকে, কুঁকড়ে, উর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ডে—বিদ্ঘুটে কাণ্ড জুড়ে দিলে ভাই! সভাসুদ্দ্ লোক চক্ষুস্থির ক'রে রইল, আমার তো, মানে, হার্টফেল হবার জো। এক একটা আসন করছে আর তার শিষ্য একজন বুঝিয়ে দিচ্ছে—এতে হ্যান্ উপকার, ওতে ত্যান্ উপকার। দেখলাম, আমার সব ব্যাধির ওষুধ রয়েছে ওই হনুমানটার যোগের ঝুলিতে। চুলের উপকার, মস্তিষ্কের উপকার, মানে, চোখের, কানের, দাঁতের, গলার, হার্টএর, ফুস্ফুসের, লিভারের, পিলের, পাকযন্ত্রের, হাতের, পায়ের, কোমরের, কাঁকালের—তোমার সর্বদেহের সর্বঅঙ্গের উপকারের দাওয়াই আসনে দেখিয়ে দিলে গুরুনাথ। সবচেয়ে বড় কথা, ভাই, পয়সা খরচ নেই, ওষুধ খেতে হবে না, শুধু নিত্য নিয়মিত একটু ওলট্-পালট খাওয়া।

খেল্ দেখানো শেষ হলে আমি, ভাই, ভিড় গলতে শুরু করলাম; মানে, আমার মত সূক্ষ্ম ব্যক্তির ভিড় ঠেলতে হয় না, গ'লে-গ'লেই উতরে যেতে পারে। সামনে গিয়ে বললাম, "চিনতে পারো, গুরুনাথ?"

চিনতে পারলে না। পারা তো সম্ভব নয়। ছাত্রদশায় হাড়ের ওপর মাংস যেটুকু ছিল, আমার যোগের টানে তাও লোপ পেয়েছে তো! অগত্যা পরিচয় দিলাম। একেবারে, ভায়া, দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল। সরে যাবারও সময় পেলাম না, ভয়ে ভয়ে বললাম, "চাপ দিও না যেন!

হেসে উঠল, বলল, "কিন্তু, এ কী চেহারা বানিয়েছ তুমি, ম্যাজেস্টর?"

অত অনুরাগ নিয়ে যে এসেছি, ভায়া, তারও মধ্যে রাগের উদয় হোলো—ওই 'ম্যাজেস্টর' কথায়। আমিও পালটা খোঁচাটি মারতে ছাড়লাম না। জানি, আজ আর ও ঠ্যাঙাবে না। বললাম, "এমন সব তাজ্জব কেরামতি কী করে শিখলে, হনুমান?"

বলল, "ওই যে—হনুমানের দয়ায়। তিনিই এ-সবের দেবতা যে হে!"—হেসে উঠল।

বললাম, "এত সব যোগযাগ শিখলে কবে, বলো দেখি?"

বলল, "তোমার সঙ্গেই তো শেখার শুরু হোলো, মনে নেই?"

অবাক কথা! "আমার সঙ্গে!—কোথায়?"

বলল, "সেই যে হে, পাঠশালে, যোগেন-মাস্টারের যোগের কেলাসে। যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি। যোগের কর্তা ভগবান তাঁর যোগ ঠিকই কষে যাচ্ছেন কিনা।"

বুঝতে পারলাম না কথাটা—তা বুঝতে পেরে সে বুঝিয়ে বলল, "সেই যে, তোমাদের যোগে আমার মাথা খেলত না ব'লে, যোগেনবাবু আমায় নানান কসরতি সাজা দিতেন, তাতে ক'রেই আমার যোগ শেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে! তাঁর সেই সাজাগুলোই তো আসন হে। সেই যে 'চেয়ার' হতাম, সেটা একটা আসন, ঘাড়ের ওপর পা তুলে চিত্‌পাত—তাও একটা আসন, হাঁটুতে নাক ঠ্যাকানো—তাও আসন। সেই যে আকাশে পা তুলে দিয়ে মাথার ভরে দাঁড়িয়ে থাকা—সেটা তো সবার সেরা আসন।"—হা হা ক'রে একেবারে, ভাই, বুক চিতিয়ে হাত ছড়িয়ে হেসে উঠল।

আমি বুক কুঁজিয়ে, হাত গুটিয়ে, তোমার, হাঁ করে রইলাম!

কার জয়

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী

আমি বড়, আমি বড়, সবার চেয়ে আমিই বড়!

মুখ বলে, আমিই বড়। কান বলে, আমিই বড়। চোখ বলে, আমিই বড়। মন বলে, সবার চেয়ে আমিই বড়!

নিজে কেউই ছোট নয়, ছোট হ'ল অন্যে। মুখ কান চোখ মন প্রত্যেকেই হামবড়া। কেউই হার মানবে না, ছোট হবে না।

শুরু হ'ল গলাবাজি। মুখ বলছে, জীবনটাই হ'ল মুখসর্বস্ব, মুখের কথাই যদি চলে গেল তো রইল কী আর? কান বলছে, কানের শোনাই যদি বন্ধ হ'ল তো রইল কী আর? চোখ বলছে, চোখের দেখাই যদি না রইল তো কী রইল আর? মন বলছে, মনের ভাবনাই যদি না রইল তো কী হবে আর? চোখ মুখ কান মন সবাই সবার চেয়ে বড়, কেউই কারো চেয়ে ছোট নয়।

গলাবাজির চোটে মুখের হ'ল মুখ ব্যথা, কানের হ'ল কান কামড়ানো, চোখের হ'ল চোখ টাটানো, আর মনের হ'ল মনের যন্ত্রণা। শুধু মিটমাটটাই যা হ'ল না! উপায় না দেখে সবাই গেল সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে, তিনিই বলে দিন্ কে বড়।

"আমাদের মধ্যে কে বড় বলে দিন্ পিতামহ। চোখ বড় না মুখ বড়, কান বড় না মন বড়—বলে দিন্ পিতামহ!"—চোখ মুখ কান মন সবাই এসে ঘিরে ধরল পিতামহ ব্রহ্মাকে।

কিন্তু কাকেই বা ব্রহ্মা মুখ ফুটে বড় বলবেন, এককে বড় করে অন্যকে ছোট করবেন! চোখ মুখ কান সকলই তো তাঁর সৃষ্টি। জল বায়ু-আকাশ, গাছপালা-মাটি, পাহাড়-প্রান্তর-মরু সবই

তাঁর সৃষ্টি। এই দেহ-মন-প্রাণ জন্তু-জানোয়ার দেব-দৈত্য-নর সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি জানেন, সৃষ্টির মধ্যে বড় কি, তিনি জানেন জীবের মধ্যে বড় কি, চোখ না মুখ, কান না মন? খাঁটি কথা মুখের উপর বলে কাকে তুষ্ট আর কাকেই বা রুষ্ট করবেন! তাই ভাবলেন, পরীক্ষা দিয়ে ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিক কে বড়। ব্রহ্মা তাই বললেন—"শোনো চোখ, শোনো মুখ, শোনো কান, শোনো মন, যে দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহ সব চেয়ে কাহিল হয়ে পড়ে, সে-ই সবার চেয়ে বড়।"

যেই বলা মুখ উঠল মুখ করে—"বেশ আমি চললাম, দেখিয়ে দিচ্ছি কে বড়! কানে টান মেরে দেখিয়ে দিচ্ছি কে বড়? চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কে বড়? মনকে মনমরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি কে বড়? কে না জানে সারা দুনিয়াটাই হ'ল মুখসর্বস্ব,—মুখের কথাই যদি বন্ধ হয় তবে আর রইল কী? বুঝবে এবার বুঝবে, ঠেকে তবে শিখবে।"

এই বলে মুখ ছেড়ে গেল দেহকে। দেহের এবার সবই আছে, নাই শুধু মুখের কথাটি। খায় দায় দেখে শোনে ভাবনা চিন্তা করে। যখন যেমন। দেহের চলছে এমন মন্দ কি, মুখের মুখখানাই শুধু মূক হয়ে আছে। তাই বা এমন মন্দ কি!

একমাস দু'মাস যায়, মাসে মাসে বছর যায়। তবু তো মুখের ডাক পড়ে না, কথার অভাবে কান্নাকাটির রোল ওঠে না। মুখ তাই ফিরে এল নিজেই। এসেই শুরু করল বকবকানি—"ফিরে এলাম, তা আমার অভাবটা যে কেমন বুঝেছ তো এবার?"

"কই টের পাইনি তো! কানে শুনেছি, চোখে দেখেছি, মনে ভেবেছি। বেঁচে ছিলাম সুখেই, মুখেই শুধু বলতে পারিনি।"

কথা শুনে মুখসর্বস্ব মুখ একেবারে মূক হয়ে গেল, আস্তে আস্তে দেহে গিয়ে চুপ করে রইল।

এবার চোখের পালা। চোখ এবার নাচতে লাগল—"আচ্ছা জব্দ! এবার বুঝবে আমিই সবার চেয়ে বড়। আমি না থাকলে বেঁচে থাকারই মানে হয় না। এই যে চললাম, বুঝবে এবার বুঝবে, ঠেকে তবে শিখবে।"—এই না বলে সদর্পে চলে গেল চোখ, চলে গেল চোখের দৃষ্টি।

একমাস দু'মাস যায়, মাসে মাসে বছর যায়। তবেই চোখ ফিরে এল। এসেই জিজ্ঞেস করল সবাইকে—"কি হে, আমাকে ছাড়া জীবন অন্ধকার, এবারে তোমরা বুঝেছ তো?"

"কেন, কেন! কানে শুনেছি, মুখে বলেছি, মনে ভেবেছি। হাঁ', চোখেই শুধু কানা ছিলাম। তা মন্দ ছিলাম কি আর!"

কথা শুনে চোখ তো ছানাবড়া! চোখ লজ্জায় চোখ বুজে যথাস্থানে এসে চুপটি করে রইল,—তার সব নাচুনি এক নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল।

চোখের দশা দেখেও কিন্তু কানের কানে জল ঢুকল না। ভাবল, এবার সে নিজেকে বড় বলে জাহির করতে পারবে। তাই সে দেহ ছেড়ে চলে গেল বীরদর্পে।

দেহ আর কানে শুনতে পায় না ; চোখে দেখে, মুখে বলে, মনে ভাবে। যখন যেমন।

একমাস দু'মাস যায়, মাসে মাসে বছর যায়। কান তবে কান খাড়া করে এসে হাজির—"কি হে, খবর কি তোমাদের ? এতদিন কানকাটা হয়ে কেমন ছিলে ?"

"ছিলাম আর মন্দ কি! চোখে দেখেছি, মুখে বলেছি, মনে ভেবেছি। কোনো কিছুরই বালাই ছিল না, কানেই শুধু কালা ছিলাম, এই যা। ছিলাম আর মন্দ কি!"

অমনি খাড়া কান হঠাৎ যেন কানে খাটো হয়ে গেল—"কি, কি বললে ?"

"বলছিলাম যে ছিলাম আর মন্দ কি! এই, কানেই যা শুনতে পাইনি, দিব্যি ছিলাম দেখতেই পাচ্ছো।"

কানের এবার কানে জল ঢুকল, কানের এবার সত্যিই কান কাটা গেল। যথাস্থানে ঠাঁই নিল, আর সাড়াশব্দ নেই!

এবার মন। মনের কিছু জোর দাপট, সেই বড়—সবার চাইতে বড়। যত ভাবনা সব তো তারই, সে ছাড়া ভাববে কে, ভাবতে পারে বা কে ? চোখ মুখ কান সবই তো তার ভাবনার বাহন, ওরা তো তারই কাজের চাকর। মন তাই মহামানীর মতো হেলে দুলে সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—"এবার টনক নড়বে, বুঝবে এবার.বুঝবে!"

দেহের কিন্তু টনক একটুও নড়ল না। দেহ আছে এমন মন্দ কি! খায় দায় নাচে গায়, হাসে কাঁদে আপন-ভোলা ; চোখে দেখে, কানে শোনে, মুখে বলে। ভাবনা-চিন্তার নেই বালাই, শিশুর মতোই হৃদয়-খোলা।

একমাস যায়, দু'মাস যায়, মাসে মাসে বছর যায়। মন এবার ফিরে এল হাসতে হাসতে। এসে দেখেই তো মনের মন ভেঙ্গে গেল। শিশুর মতো কেমন নবীন রয়েছে দেহখানি। হাসিকান্নায় হীরাপান্নায় রোদে জলে কেমন সুন্দর রয়েছে দেহখানি। আর মন কিনা ভেবেছিল মন ছাড়া দেহ বুঝি মরেই গেছে। মন তবু জানতে চাইল—"কেমন ছিলে ?"

"ভালই! হেসেছি খেলেছি, গেয়েছি নেচেছি—শিশুর মতোই খুশিতে বেঁচেছি। চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি, মুখে বলেছি—ছিল না মন, ছিল না মনের ভাবনা।"

মন তখন মনমরা হয়ে মগজের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

তবে কে বড় ? চোখ নয়, কান নয়, মুখ নয়, মন নয়! সবাই ভাবছে, তবে কে বড়! সবার চাইতে কে বড় ?

দেহের ভিতরে মর্মমূলে প্রাণ বসেছিল আপন মনে। সেও ভাবছিল। নিশ্বাসে নিশ্বাসে সে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বদেহে, দেহের সকল কোঠায়। ছড়িয়ে দিয়েছে সে চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মুখের বলায়, মনের ভাবনায়—তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে শিরায় শিরায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে,

সকল কাজে, সকল চেষ্টায়। সকলের সঙ্গেই তো। সে নাড়ীর টানে বাঁধা! এবার সে চলে যাবে সকলকে ছেড়ে—সে-ই বড় কিনা দেখা যাক্!

প্রাণ যেই বুকের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে—অমনি সর্বাঙ্গে পড়ল সে কী দারুণ টান। দেহের সব কিছু বুঝি ছিঁড়ে খান-খান হয়ে গেল। কানে লাগল টান—কর্ণপটহ ছিঁড়ে যায়! চোখে লাগল টান—দর-দর করে অশ্রুর বান ছোটে! মুখে লাগল টান—জিভ খসে পড়ে আর কি! মনে লাগল টান—মন ভেঙ্গে গেল বুঝি! সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে শুধু গেল গেল রব, আর্তনাদ, প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—হাহাকার!

প্রাণকে আর দেহ ছেড়ে যেতে হ'ল না। এবারে চোখ মুখ কান মন—দেহের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় করজোড়ে স্তুতি করতে লাগল—

"হে প্রাণ-দেবতা, তুমি বড়, তুমিই বড়, তুমিই সবার চেয়ে বড়! তোমাকে প্রণাম করি।

"করুণা করো তুমি, মুখ তুলে চাও তুমি! তোমার সঙ্গে জন্ম থেকে নাড়ীর টানে বাঁধা থেকেও বুঝি নি তুমি এত বড়! তুমি আমাদের ক্ষমা করো। সদয় হও তুমি, তুমি গেলে আমরা কেউই আর বাঁচব না।

"হে করুণাময় মর্মদেবতা, তুমি আমাদের বুকের মধ্যে চিরদিনের মতো বিরাজ করো!"

প্রাণ হাসিমুখে বসল এসে বুকের গোপনে প্রাণের মণি-কোঠাটিতে।

চোখ মুখ কান মন সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—"জয়, প্রাণের জয়! সবার বড় প্রাণের জয়!"

উপনিষদের গল্প

রঙীন রাজ্য

—শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ধানক্ষেত হ'তে সবুজ গন্ধ এলো :
বটছায়া ছুঁয়ে বাঁশির ছন্দ এলো।
এলো তাই মনে খুসি-খেয়ালের খেলা,
এসে গেছে আজ নরম রোদের বেলা।
এলো উড়ে ঐ সোনায় বাঁধানো
আকাশ-পথের বাঁকে;
নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যত ডানা-
ঝাপটানো পাখী
দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে।

এলো রং রূপ পরাগ-ঝরানো ফুলে :
মৌমাছি এলো গুণ-গুণ ধ্বনি তুলে ;
কিশলয়ে হাওয়া করতালি দিল দুলে।
এসেছে শিশির কিশোর দুর্ব্বাদলে :
মুক্ত হাসিতে মুকুতারই মত ঝলে।
রূপকাহিনীর রঙীন রাজ্য
আশ্বিন এলো আজ :
মন হ'ল যেন রাজকুমারের
পাগোল পক্ষীরাজ ॥

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী

নানা জাতির দেশ এই ভারতবর্ষ। এই দেশে আর্য্যরা প্রথম আসেন নি—আর্য্যদের আগে এসেছে দ্রাবিড় জাতি। এ দেশের যারা আদি অধিবাসী, আর্য্যরা তাদের পরাজিত করেন। যারা পরাজয় স্বাকার করে বশ্যতা স্বীকার করলো, তারা আর্য্য-সমাজে থেকে গেল। কিন্তু সবাই অমন বশ্যতা স্বীকার করে নি—অনেকেই আশ্রয় গ্রহণ করলো জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে। এই কারণেই ভারতের উপজাতি ও আদিবাসীদের বাস প্রধানতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে—বন-জঙ্গল-সমাকীর্ণ স্থানে।

ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়ে উপজাতি ও আদিবাসীদের সংখ্যা ৩ কোটী ৫৪ লক্ষের কাছাকাছি। এরা ছড়িয়ে আছে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে: আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে; বিহারের ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণার পার্ব্বত্য অঞ্চল ও বিন্ধ্যগিরির পার্ব্বত্য অঞ্চলে; হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলের পাদদেশসমূহে।

এই বাঙলাদেশে কত রকমের উপজাতি ও আদি অধিবাসী আছে, তা শুনলে তোমরা অবাক হবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙলায় যে ২৬ লক্ষাধিক এই শ্রেণীর লোক আছে, তাদের মধ্যে রয়েছে ভেতিয়া, চাকমা, দামাই, গুরুঙ্গা, হাড়ী, কামী, খারিয়া, খান, কুকি, লেপচা, লিমু, মছের, মেছ, মিরু, মুণ্ডা, নেওয়ার, ওঁরাওন, সাঁওতাল, সড়কি, স্নুওয়ার, টিপরা, হাজং, কোচ প্রভৃতি।

আসামে উপজাতির সংখ্যা বাঙলাদেশের চেয়ে ৪ লক্ষ বেশী। তাদের মধ্যে আছে অহোম, আও, কাচারী, কোন্যাক, লালঙ্গ, অঙ্গামী, গারো, খাসী, কুকি, লোহিতা, লুশাই, খিরি, খাভা, সামা, মিকির, নাগা, রেঙ্গমা, সিনতেঙ্গ প্রভৃতি।

উড়িষ্যায় আদিবাসীর সংখ্যা কম নয়—১৭ লক্ষের ওপরে। তাদের মধ্যে বাগতা, ভরিয়া, ভুমা, ডোম্বো, গডবা, গেণ্ডি, জাতপা, জুয়াঙ্গ, খারিয়া, কোণ্ড, কোণ্ডদোরা, কোয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও, পানো, পরজা, সাঁওতাল, সাওয়া প্রভৃতি।

আসামের উপজাতি—কাঠ কাটা এদের পেশা

বিহারের উপজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী—সংখ্যা ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার। তাদের মধ্যে আছে আগারিয়া, অসুর, বৈজা, বংজারা, বেদিয়া, ভোক্তা, ভুইহার, ভুইজি, বিনঝিয়া, বিরহার, চেরো, ধনওয়ার, খাসী, গোণ্ড, গরেৎ, গুলগুলিয়া, হো, কর্ম্মালি, কাওয়ার, খাঙ্গার, খরিয়া, খরওয়ার, খাস, কোরা, লোহরা, মহলি, মলার, মল, পাহারিয়া, মাঙ্গর, মৌলিক, মুণ্ডা, নাগেসিয়া, ওঁরাও, কান্, পরধান, পরহৈয়া, সাঁওতাল, সউন্তা, সউরিয়া, সাওয়া, খারা, তূরী প্রভৃতি।

মাদ্রাজে যে প্রায় ৬ লক্ষ উপজাতি আছে তাদের মধ্যে রয়েছে চেঞ্চু, বো-ডাগা, মালয়ালি প্রভৃতি। যুক্তপ্রদেশে কিছু সংখ্যক আদিবাসী আছে—তাদের মধ্যে কোঁলারিয়া জাতি বেশী পরিচিত। আলমোড়া জেলায় 'বনমানুষ' নামে এক জাতি আছে। বোম্বাই প্রদেশে কাতকারী, ঠাকুর, ভীল, ওয়ার্লি প্রভৃতি এবং

মধ্যপ্রদেশে গোণ্ড, কোরকু, ভরিসভূমিয়া, ভীল, ভুঞ্জিয়া, হলবা, কোল, কোনি, মুরিয়া, পরধান প্রভৃতি উপজাতি রয়েছে। এ সব ছাড়া ভারত-পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে আফ্রিদি, শিনওয়ারী, শিলমনি, হুল্লাগিরি, মাস্থদ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ উপজাতি রয়েছে।

আর্য্যদের অভিযানের সময়ে এই সব জাতি বনজঙ্গল কেটে এদেশে দুর্গম স্থানগুলিতে বসবাস স্থরু করেছিল। সেই সব নূতন আবাসে তারা দলবদ্ধভাবেই রয়ে গেল এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে রইলো। আর্য্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রার যে পরিবর্ত্তন ঘটলো, তা খুবই সামান্য। মুসলমান রাজত্বের সময়ও তাদের জীবনযাত্রার তেমন কিছু রূপান্তর ঘটেনি।

বৃটিশ যুগে সত্যি সত্যিই এদের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটলো এবং সে পরিবর্ত্তন মারাত্মক। যে জমি এরা সকলে মিলে পাহাড়-জঙ্গল কেটে তৈরী করেছিল, এক কলমের খোঁচায় বৃটিশরা এদের রাজা, জায়গীরদারদের সেই জমির মালিক করে দিল। সেই সঙ্গে তাদের টেনে আনলো কয়লার খনিতে, চা-বাগানে। জমি যারা হারালো, সেই সব ভূমিহীন কৃষক এই ভাবেই রুজি-রোজগার করতে বাধ্য হলো। এর পরে কিছু সংখ্যক লোক সহরেও এসেছে। সহরের রিক্সা টেনে তারা পয়সা উপায় করে, মোট বয় বা বাড়ী পাহারা দেয়। সর্ব্বশেষ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এদের অনেককে পুলিশ বিভাগে ভর্ত্তি করেছেন।

বৃটিশ আমলে এই সব আদিবাসীর দুঃখে বৃটিশ শাসকদের ঘুম ছিল না! তাদের পক্ষ থেকে কোনও কথা বলবার লোক নেই—এই অছিলায় শাসন পরিষদে তাদের স্থান দানের ব্যবস্থা তারা করেছে। কিন্তু এই প্রীতির কারণ পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে তারা কাজে লাগিয়েছে, ঠিক তেমনি আদিবাসীদের সঙ্গে হিন্দুদের ঝগড়া বাধাবার চেষ্টাও তারা করেছে। এই জন্য আসামে উপজাতিদের দিয়ে স্বতন্ত্র অঞ্চল গড়বার দাবীও তারা তুলিয়েছে। শুধু আসামের কথাই বা কেন? তোমরা উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের আফ্রিদি, মাস্থদ প্রভৃতি জাতির নাম শুনে থাকবে। এই উপজাতিদের নেতা ইপির ফকিরের নাম কে-ই বা না জানে! ইংরেজরা এদের বশে আনবার জন্যে গ্রামের পর গ্রাম বোমা ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু তবুও এরা বশ্যতা স্বীকার করেনি। তবে হ্যাঁ, কিছু সংখ্যক লোককে যে বৃটিশরা কিনতে না পেরেছিল তা নয়। রীতিমত নিয়মিত মাসহারা দিয়ে ইংরেজরা কিছু কিছু লোককে বশে রাখতো এবং জীর্গা (ওদের জমায়েতকে জীর্গা বলে) বসাতো। শুধু তাই নয়, উপজাতীয় ছেলেদের সভ্য করার জন্য পেশোয়ারে ওরা বোর্ডিং ও স্কুলে বৃত্তি দিয়ে পড়াশুনা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করলেও আশ্চর্য্য এদের জাতীয় চরিত্র। জনৈক প্রত্যক্ষ দর্শীর মুখে শুনেছি—বোর্ডিং-এ উপজাতি ছেলেদের জন্য কৌটা ভর্ত্তি সিগারেটের টীন রেখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা ভুলেও স্পর্শ করেনি। এদের অধিকাংশই বৃটিশের ওপর চটা। ভারতের বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কোন কোন নেতা এদের কাছ থেকে ভারত সীমান্ত অতিক্রমের স্থবিধা পেয়েছেন।

ভারতের উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই সরল প্রকৃতির। এই সরলতার সুযোগ নিয়ে বহু লোক এদের ঠকিয়েছে। আজও চা-বাগান, কয়লার খনিতে সস্তায় এদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয়। এদের ছেলে মেয়ে প্রায় সকলে একভাবে কাজ করতে পারে। চা-বাগানে দেখবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ করে পরিণতবয়স্ক পুরুষ ও মেয়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে চা-এর পাতা তুলছে।

দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্যে থেকে এদের যেমন কিছুটা রূপান্তর ঘটেছিল, তেমনি ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে তারা জ্ঞানও লাভ করেছিল। তাই দেখা যায়, বহু বার বহু উপজাতি অঞ্চলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটেছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ওদের বিদ্রোহের সুরু। এই বিদ্রোহ থামাতে ছয় বৎসর লেগেছিল।

তারপর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঠিকাদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে 'কোল বিদ্রোহ' ঘটে। এই বিদ্রোহে মুণ্ডা, হোস, সাঁওতাল প্রভৃতি যোগ দিয়েছিল। এদের সেই আদিম যুগের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বৃটিশের গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এরা এগিয়ে গিয়েছিল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের 'বীরশা বিদ্রোহ' বিখ্যাত। বীরশা মুণ্ডা নামে জার্মান মিশন স্কুলে (চাঁইবাসা) শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক যুবকের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ হয়। রাঁচি সহরে প্রথম আগুন জ্বলে, তারপর সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সিংভূমে। থানা লুট হয়, পুলিশ আক্রান্ত হয়, শেষে বীরশার সৈন্যদলের সঙ্গে সরকারী সৈন্যদলের সম্মুখ-যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বীরশা বন্দী হয় এবং সরকারী প্রচারপত্র অনুসারে রাঁচি জেলে কলেরা রোগে তার মৃত্যু ঘটে।

তারপর ছোটনাগপুরে এক বিদ্রোহ হয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে পনর সহস্রাধিক ওয়ার্লি কৃষকের ধর্ম্মঘট, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় হাজংদের অভ্যুত্থান স্মরণীয় ঘটনা।

এইভাবে তারা আজ ভারতের অন্যান্য দরিদ্র ও বঞ্চিত অধিবাসীদের মতই সংগ্রাম করে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছে। আগে যা সম্ভব ছিল, আজ ইচ্ছা করলেই তাদের ওপরে বেআইনী ভাবে তা চাপিয়ে দেওয়া চলছে না।
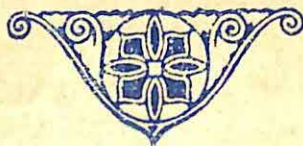
শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

বায়না রাখা অল্প নয়!
আমার কথাও গল্প নয়—

ভেণ্টু আমার বাচ্ছা খুব,
বায়না যত চায় বেকুব।
এই দেখ না এমন গোঁড়া
ঘুমচোখে চায় চড়তে ঘোড়া!
হুমড়ি খেয়ে যতই বকি—
'না' করে আর করব কি?
ঘোড়ায় চেপে কানটি মলে,
বলব কি সে কেমন জ্বলে!
ঘোড়া ছেড়েই চাইল ঘুড়ি,
নইলে রাগে ছুঁড়বে মুড়ি।
কি করি ভাই, আনন্থ কিনে
একটি ডজন চিনে চিনে—

সুতো বেঁধে যতই তোলে,
ঘুড়ি ততই পড়ছে ঢলে।
জামা ছেড়ে লাগনু আমি,
গলদ্‌ঘর্ম যাচ্ছি ঘামি।
ছাদে উঠেও নেইকো পার,
গাছে চড়েও মানন্থ হার।
যতই টানি ততই ঘুড়ি
টানছে নীচে হামাগুড়ি।
কিছুই কিছু হয় না দেখে,
ভেণ্টু বসে ডুক্‌রে বেঁকে।
বায়না ধরে জোর গলায়
চীৎকারে তার কানটি যায়!

তখনই ত এই প্লেনে—
দু'জনেতেই যাই টেনে,
কান্নে নেই গোঁত্তা নেই—
ফুর ফুর ফুর উড়ছে এই।
খোস মেজাজে ভেণ্টু রয়,
বায়না রাখা অল্প নয়!

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বছর আষ্টেক আগের এক ঘটনা।

মনে হলে এখনও তপেনের গা ছম-ছম করে। যুক্তি দিয়ে তাকে মানতেও পারে না, কিন্তু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা ঘটনাকে একেবারে অস্বীকার করতেও পারে না। সময় সময় মানুষ কি ভাবে দেখা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে অদেখাকে মিশিয়ে ফেলে একটা রহস্যপূর্ণ আবহাওয়া রচনা করে, সেদিনকার ঘটনাটা তার একটা মস্ত নজীর হয়ে রয়েছে তার কাছে।

জলোচ্ছ্বাসে আর ঝড়ে সে বছর মেদিনীপুরে প্রকৃতি যে খেয়াল মেটালেন, তাতে কত মানুষ প্রাণ হারাল, কত সংসার তছনছ হয়ে গেল। গ্রামের পর গ্রামে হাহাকার। মানুষের সেই চরম দুর্দিনে আর্তের সেবার জন্য বাংলার সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো ছুটে গেছল সেখানে। প্রাণ দিয়ে সেবা করে স্বেচ্ছাসেবকরা সেদিন কত মুমূর্ষুর যে প্রাণরক্ষা করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁদের কথা মনে হলে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নুয়ে পড়ে।

এমনি এক প্রতিষ্ঠানের হয়ে তপেনকেও যেতে হয়েছিল সেখানে এবং সঙ্ঘের নির্দেশে দীর্ঘকাল থাকতেও হয়েছিল। বন্যা-বাত্যায় যত না লোক মরেছিল, তার চেয়ে বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছিল মড়কে। দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষ মরার দৃশ্য দেখে মনটা যেন বিষিয়ে উঠেছে তপেনের, একটা ক্লান্তিও এসেছে। কিন্তু সেবাধর্মীর কাছে কর্তব্যে শৈথিল্য মহাপাপ। তাই

এ সমস্তকে জয় করে কর্তব্য করে চলেছে সে। রোগ, শোক, দুঃখ, ভয়কে আয়ত্ত করে ফেলেছে বলে মনে মনে তার একটা অহংকারও না জন্মেছে তা নয়।

তপেন তখন গোবিন্দপুরে। রিলিফ কাজের বিলি-ব্যবস্থা তখনও শেষ হয়নি। আরও দু'একদিন গোবিন্দপুরেই তার থাকবার কথা। রাত্রি প্রায় আটটার সময় মেদিনীপুরে তাদের সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র থেকে একজন লোকের মারফৎ চিঠি এল—পরের দিন সকাল আটটার মধ্যে তাকে নতুনগাঁয়ে উপস্থিত হতে হবে। রিলিফ-পরিচালক ঐ সময়টাতে সেদিন তমলুক থেকে নতুনগাঁয়ে এসে পৌছাবেন এবং ঘণ্টাখানেক মাত্র থাকবেন। তপেনের সঙ্গে তাঁর কতকগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা প্রয়োজন। কাজেই ঐ সময় তপেনকে থাকতেই হবে সেখানে। এত অল্প সময়ের নোটিশে তৈরী হতে হবে বলে খুবই অসুবিধে বোধ করলেও ঠিকঠাক করে নিতেই হবে তাকে। গোবিন্দপুর থেকে নতুনগাঁয়ের দূরত্ব প্রায় পনেরো মাইল। সকালে সেখানে পৌছাতে হলে রাত্রি থাকতে থাকতেই যাত্রা করতে হবে। রাস্তা ভাল নয় বলে একটু বেশি সময় নেবে, নইলে দশ-পনেরো মাইল রাস্তা আর এমন কি! স্থির হ'ল একঘুম ঘুমিয়ে উঠে রাত্রি তিনটে আন্দাজ যাত্রা করলেই চলবে।

রাত্রের আহারটা তাড়াতাড়ি সেরে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করল সে। ঘুম আর আসে না। নানা চিন্তা এসে জড়ো হয় মাথায়। এখানের কাজগুলোর এখনও বিলি-ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু যেতেই হবে নতুনগাঁয়ে। সেখানে আবার কি কাজ পড়ে কে জানে। দিকে দিকে মরণের মহোৎসবে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। মড়ক আর মহামারীতে যে লোক মরছে বিজ্ঞানের পক্ষে তা প্রতিরোধ করা কিছুই নয়। কিন্তু এ দরিদ্র দেশে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর মত ক্ষমতা নেই। কবে যে এ দুর্দশা ঘুচবে, মানুষ কবে মানুষের মত বাঁচতে পারবে?—এমনি নানা চিন্তার জের আর মিটতে চায় না যেন। তারপর কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙতেই আলোটা জেলে চোখ রগড়ে ঘড়ির দিকে চাইল সে। তাই তো চারটে বেজে গেছে যে! দেরী হয়ে গেল ভেবে তাড়াহুড়া করে জামাটা গায়ে দিয়ে টর্চ ও লাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। ঘরের সামনে বারান্দায় চাকরটা ঘুমোচ্ছিল। তাকে ডেকে তুলে সকালে কাকে কি বলতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে নতুনগাঁয়ের পথে যাত্রা করে তপেন।

ঘণ্টাখানেক পথ চলার পরও রাত্রের অন্ধকার যখন হাল্কা না হয়ে গাঢ় হতে লাগল, তখন তার মনে হ'ল 'ঘড়িটা দেখতে ভুল হয়নি তো।' চারটার সময় বেরোলে এতক্ষণে রাস্তাঘাট ভোরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠত। যাই হোক রাত্রি থাকলেই এখন আর কি হবে, না হয় সকাল সকাল পৌছান যাবে। চলতে থাকে সে। বিপদ কিন্তু একটা নয়। দেখতে দেখতে আকাশ ঘনকালো মেঘে ছেয়ে গেল, বৃষ্টি নামল মুষলধারে। একেবারে তেপান্তরের মাঠ বেয়ে পথ, চারদিকে ঘর-বাড়ীর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বৃষ্টির জলে আর ঝড়ের ঝাপটায় বেশ ভিজে উঠল সে। শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপতে

থাকে তার সারা দেহ। আশ্রয় না হলে আর চলে না। হন-হন করে এগিয়ে চলে আর দু-পাশে চায়। তারপর কতকগুলো ঝোপ-জঙ্গল কাটিয়ে এগোবার মুখে একটা ছোট্ট বাংলো ধরনের বাড়ী দেখতে পায় সে। বাড়ীটার সামনে ছোট্ট একটা বাগানের মতও রয়েছে। আম আর জাম গাছগুলোর পাতা থেকে অবিরাম বর্ষণের টুপুর-টাপুর শব্দ জায়গাটাকে বেশ রহস্যময় করে তুলেছে। তখন আর অত দেখবার সময় নেই, একটা আশ্রয় চাই। হাতের টর্চটা জ্বালাতে গিয়েও ব্যর্থ হয় সে। এমনি ভিজে গেছে যে তার আর জ্বলবার ক্ষমতা নেই। যাই হোক অন্ধকারে চোখ তখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাংলোটা খোলার চালের। বারান্দার চালটা ভেঙে পড়েছে। তা হলে কি হয়, এদিকে ঘরের দরজায় তালা লাগান। কয়েকটা জোর ধাক্কা মারতেই তালাটা আপনি খুলে গেল। একটু আশ্বস্ত হ'ল সে, শুকনো আশ্রয় পাওয়া যাবে এবার।

ঘরে ঢোকবার আগে একবার দেখা দরকার। টর্চটাও জ্বলছে না। সঙ্গে একটা দিয়াশলাই ছিল, ফতুয়ার পকেটে। সে কি আর শুকনো আছে যে জ্বলবে? পকেটে কতকগুলো কাগজ থাকায় সেটা ভিজে একেবারে নষ্ট হয়নি। খানিকক্ষণ ঘষে ঘষে গরম করে জ্বালানো গেল। ঘরটি ভালই আছে, মাত্র এক কোণাতে জল পড়ছে। শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপছে সে। একটু আগুন হলে ভাল হ'ত। ঘরের এক পাশে কতকগুলো খড়কুটো, শুকনো পাতা, বাঁশের ভাঙা বাখারি প্রভৃতি জড়ো করা। সেইগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দিল সে। জামাটা খুলে নিংড়ে একটা জায়গায় শুকোতে দিয়ে কাপড়ের এক দিকটা পরে আর এক দিকটা আগুনের তাতে শুকিয়ে নিতে লাগল। কাঁপুনিটা খানিকটা থামল। ওদিকে আর এক পশলা চেপে বৃষ্টি এল। কাজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আগুনের তাতে বসে দুর্যোগের কথা ভাবতে লাগল সে। তার মনে হ'ল, কে যেন মড় মড় করে ভাঙা খোলা মাড়িয়ে দরজার কাছে এল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সে। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তপেন আবার হাত-পা সেঁকতে থাকে। আবার সেই শব্দ। শুধু তাই নয়, কে যেন দরজায় ঘা দিচ্ছে। এত রাত্রে এই নির্জন প্রান্তরে কে আসতে পারে, কেনই বা আসবে?

আবার সেই শব্দ। কেমন অদ্ভুত লাগল। যাই হোক দুর্গা নাম নিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে এক পাশে আড়াল হয়ে থাকে সে।

আপাদমস্তক বৃষ্টিতে ভিজে একটি লোক ঘরে ঢুকল। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা আগুনের পাশে বসে হাত-পা সেঁকতে লাগল। তার সমস্ত গা দিয়ে তখনও জল ঝরছে। বৃষ্টিতে আজ তপেনও কম ভেজেনি, কিন্তু এই লোকটির মত অবস্থা হয়নি তার। এ যেন একেবারে পুকুর থেকে উঠে আসছে। তার পরনের ছেঁড়া ও নোংরা জামা-কাপড় থেকে টপ-টপ করে জল ঝরে মেজেতে গড়িয়ে যেতে লাগল। ভুরু ও গোঁপের অস্বাভাবিক লম্বা চুল থেকে আগুনের উপর জল পড়ে সেঁা-সোঁ শব্দ করতে লাগল।

তপেন তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লোকটিকে নমস্কার করলে। লোকটি আজকের এই বৃষ্টির ও শীতের কথা বলতে বলতে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল। লোকটাকে তার মোটেই ভাল

লাগছিল না। কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। একেবারে নীরব থাকাও যায় না। তাই সে বললে—"যা বলেছেন মশায়, এমন আকস্মিকভাবে আজকের বৃষ্টিটা এসেছে যে, কারুর রক্ষে নেই আজ। আপনি এই রাত্রে কোথা যাচ্ছিলেন?"

বাইরে একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়া গাছগুলোকে যেন শপাং করে একটা চাবুক লাগিয়ে গেল।

তপেন আবার বললে—"এই নির্জন প্রান্তরে এমন একখানা সুন্দর বাড়ীর এমন দুরবস্থা কেন?"

এবার উত্তর এল—"এখন কি দেখছেন মশায়! এমন একদিন ছিল যখন এই বাংলোর মত বাংলো, আর এই বাগানের মত এত চমৎকার বাগান এই তল্লাটে ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, আজ এ বাড়ীতে কেউ আর আসে না। কেউ আসতেই চায় না।"

তপেন প্রশ্নপূর্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে লোকটি আবার বলতে লাগল—"ওই যে ওখানে একগাদা ছেঁড়া কাপড় জামা, খাবারের টুকরো ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছেন তো। ওগুলো কি জানেন? তা আপনি আর জানবেন কি করে? এখনো তো টের পাননি। ওগুলো হচ্ছে এমনি নির্জন নিশীথে এখানে যারা এসেছিল তাদেরই স্মৃতিচিহ্ন।"

"স্মৃতিচিহ্ন? মানে?"—আপনা থেকেই তপেনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে এবং লোকটার এই অস্বাভাবিক ধরনের কথাবার্তায় তার মনেও কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হতে থাকে।

সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে লোকটা বলতে থাকে—"মানে খুবই সোজা। এখানে যারা এসেছে তারা আর ফিরে যায়নি। তবে সে এক দুঃখের ইতিহাস। এ বাড়ীর মালিক কোন কারণে পাশের ঐ পুকুরটায় ডুবে মারা যান। অনেকে বলে, তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন। যাকগে সে কথা। কারণ লোকে এখন তা ভুলেই গেছে। তবে সকলে বিশ্বাস করে যে, সে ভদ্রলোক এখনো নাকি এই বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ান। প্রথম প্রথম আশে পাশের গ্রামের লোকেরাও রাত্রে ঘুমাতে পারত না। ভদ্রলোকের নাম ছিল রসিকবাবু। রসিকবাবুর নৈশ ভ্রমণের পদধ্বনি নাকি সকলকে সচকিত করে রাখত। এখন আর সে ভাবটি নেই। তবে এখনও যে রসিকবাবু এই বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ান সে সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নেই।"

তপেন মনে মনে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, বলে—"যাকগে মশায়, ও সব কথায় কাজ নেই। আর আমাদের এই সব কুসংস্কারের কথা শুনে ভয় পেলে চলবে না। আজ এখানে, কাল সেখানে, এই করে তো আমাদের কাটাতে হয়। কত জায়গায় নির্জন ঘরে একলা রাতের পর রাত কাটিয়েছি, ভয় কাকে বলে জানি না। এই দেখুন না, যে জোর বৃষ্টি পড়ছে, তাতে বাইরে বেরোনও মুশকিল।"

"আহা, এই জলঝড়ে বেরোবেন কেন? হ্যাঁ দেখুন, আপনি যা বলছিলেন—আমিও বিশ্বাস করি না ও সব। ও সব ঘুরে বেড়ানোর কথাটথা কি আজকালকার দিনে বিশ্বাস করে কেউ?"

"আমি তো করিই না।"—বলে তপেন। "এ সমস্তই গল্প কথা। শুনলে তো আমার হাসি পায়। যত সব আজগুবী কাহিনী, অলস মস্তিষ্কের কল্পনা!"

লোকটা উদাসভাবে বলতে থাকে—"তা হবে। অনেকেই তাই মনে করে। তাতে কি-ই বা এসে যায়। যে যার ধারণা নিয়ে সুখে থাকলেই হ'ল।"

কথায় কথায় তার জামা-কাপড়ের দিকে নজর পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠে তপেনের, কেমন একটা খটকা লাগে তার মনে। এখনও তার জামা-কাপড় থেকে জল ঝরে মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে। চুপ করে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে তাকে—"অনেকক্ষণ তো এসেছেন আপনি। আমার কাপড়ের আঁচলটা শুকিয়ে গেল, আর আপনার এখনও জল ঝরা বন্ধ হ'ল না! কাপড়-জামাটা খুলে না হয় নিংড়ে নিন। আপনার কি শুকনো থাকতে ভাল লাগে না নাকি?"

"শুকনো! সে কি কথা মশায়, শুকনো।"—এই বলে একটা অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল লোকটা।—"আরে মশায়, আমাদের শরীর কখনও শুকোয় না। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত আর কি বসন্ত। একভাবে চলে আমাদের, বুঝলেন। এই দেখুন না!" বলে লোকটা তার কাদামাখা নোংরা হাত দুটো জলন্ত আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। তখনও তার জামার হাতা থেকে তেমনই জল ঝরছে!

নিজের চোখকে যেন আর বিশ্বাস করতে পারছে না তপেন। চোখ দুটো রগড়ে নিয়েও সেই একই দৃশ্য তার চোখের সামনে! ভয়ে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। লোকটাও হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করে হেসে উঠল। সেরকম হাসি তপেন কখনও শোনেনি। হাসির শব্দটা যেন ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলে তাকে। প্রাণপণে ছুটতে লাগল সে। কতক্ষণ এমনি করে ছুটছে তার খেয়াল নেই। তার কেবলই মনে হতে থাকে লোকটা যেন তার পেছনে পেছনে ছুটে আসছে। যতই সে ছুটে, ততই "ওই, হুই, হুইও" শব্দ ক্রমাগত তার কানে আসতে থাকে।

একটা বিরাট নদীর বালুচরে চোখ মেলে চাইলে তপেন। উষার স্নিগ্ধ আলো নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। এখনও তার কানে সেই "হুইও, হুইওর" শব্দ এবং এখন আরও জোরালো ভাবে। কোথায় এসেছে সে! উঠে বসে বেশ করে চারদিকটা দেখে নিয়ে, নদীর জলে নেমে চোখমুখ ধুয়ে অঞ্জলি পূর্ণ করে জলপান করে সুস্থ বোধ করলে সে। এখানে নদীটা ডানদিকে একটা পাক খেয়ে

ঘুরে পড়েছে যেন। সেখানে কতকগুলো নৌকো রয়েছে তীরের কাছাকাছি, আর কতকগুলো রয়েছে নদীর মাঝখানে। মাঝিরা তীর থেকে নৌকো ঠেলে তাড়াহুড়া করে উঠে পড়েছে। অস্পষ্ট আলোতে

তাদের দেহগুলোকে ছায়ামূর্তির মতই মনে হচ্ছিল। জেলেরা চলেছে মাছ ধরতে। পরস্পরকে আহ্বান ও সঙ্কেত জানাবার জন্য তারা ঐ রকম অদ্ভুত শব্দ করে।

এখন রাত্রের ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তবে সে যে নতুনগাঁয়ে না যেয়ে একটা অজানা নদীতীরে এসে পড়েছে সেটাও সত্য। সমস্তটাই তার কাছে রহস্যপূর্ণ মনে হ'ল।

*   *   *   *

সেদিন নতুনগাঁয়ে পৌছতে বেলা দশটা বাজল তপেনের। তাদের সঙ্ঘ-পরিচালক তপেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নতুনগাঁয়ের লোক রাত্রের ঘটনা শুনে বলাবলি করতে লাগল, রসিক-বাবুর বাংলো থেকে কেউ জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারে না। তপেন কি ভাবে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল ভেবে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

সঙ্ঘ-পরিচালক স্বামীজী সমস্ত শুনে হাসতে লাগলেন। তপেনকে বললেন—"এই বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক যুগেও যে তুমি ভূতের ভয় কর, এটা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগল।"

তপেন বললে—"কোন দিনই আমি এসবে বিশ্বাস করিনি এবং এখনও করি না। তবে গতরাত্রের ঘটনাটা আমার কাছে খুবই রহস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে।"

"ওটা আর কিছু নয়। আতঙ্কে লোক অনেক কিছু আজগুবী দেখে ও শোনে। তুমি ঘটনাটা

যে ভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছ, তাতে প্রথম দিকটাতে তোমার মনে ভয়ের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। লোকটা যখন থেকে রসিকবাবুর জলে ডুবে মারা যাওয়া ও তার ঘুরে বেড়ানোর কথা বলেছে, তখন থেকেই একটা ভয় তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং তারপর তোমার সমস্ত আচরণই হয়েছে অস্বাভাবিক। আসলে ঐ লোকটা কোন ভবঘুরে বা দস্যু। ঐ পড়ো বাড়ীটাই তার আস্তানা। যদি কেউ দৈবক্রমে ওখানে এসে পড়ে তা হলে তার যথাসর্বস্ব লুঠ করবার জন্য সে এই ভূতের কাহিনীর অবতারণা করে এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেলে সে সহজেই তার জিনিসপত্রগুলো পায়। ভবঘুরে ও খেয়ালী লোক হলে কৌতুক করে রগড় দেখবার জন্য এরূপ করাটাও অস্বাভাবিক নয়। যাই হোক বসিকবাবুর বাংলোতে যাকে দেখেছ সেটি আস্ত একটি মানুষ। তারপর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাবার সময় তুমি যে সব শব্দ শুনেছ সেগুলো ঐ নদীতীরের জেলেদেরই শব্দ। মাছ ধরবার সময় তারা একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ করে। অপরিচিত লোকের কাছে সেটা অনেক সময় ভৌতিক শব্দ বলে মনে হয়।”

তপেনের কাছে এখন সমস্ত ঘটনাটাই অতি সহজ ও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। মনে মনে সে বলে—“আমরা কত অসংলগ্ন।”

তোমার কবিতা

—শ্রীঅতীন কুমার

বলত বন্ধু কি দেবে স্বদেশভূমিকে
যার আলো আর যার এই বাতাসে
তুমি পেলে প্রাণ, জীবনের মহাগান।
তোমারি জন্যে মাঠে-মাঠে দিকে-দিকে
ঘাসে-ঘাসে যার অগাধ স্বপ্ন হাসে ঃ
হাজারো তারারা কথা কয় আকাশে!

শিশিরে শিশিরে ঝল-মল তরুশাখা
দো-দুল দো-দুল দোলায় তোমার মন
পাখিদের গানে, ধূধূ ধলাকার পাখা
খুশীতে ভরায় তোমার নিঝুম্ ক্ষণ!
যার রোদ্দুর ঝিকি-মিকি নদী-জলে
বন্ধু তোমাকে বলে রূপকথা বলে!

বলত বন্ধু কি দেবে স্বদেশভূমিকে
যার মানুষেরা হাটে-বাটে দিকে-দিকে
তোমারি জন্যে তোমারি জন্যে মরে’—
এনেছে মুক্তি রক্তের স্বাক্ষরে!

ভাই বোন

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

পিতৃহীন ভাইটিকে একটু চুমো দিয়ে দিদি ঘুম হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিল। আধফোটা কমলের মত ভাইটি দিদির দিকে তাকাইয়া একটু মিষ্টি হাসি হাসিল। দিদি ভাইটিকে দিল—আর একটি চুমো, আর একটি চুমো, আর খুব ধীরে ধীরে বলিল, "এমন সুন্দর কেউ না, এমন সুন্দর!"

ভাইটির ঘুম এতক্ষণ ভাঙ্গিয়া গেল। দুষ্টুমি-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কো—ন্ সময় থেকে জেগে রয়েছি—তোমার ঘুম ভাঙ্গে না—তাই চুপ করে ছিলাম।"

দিদি বলে, "তবে রে দুষ্টু, এই তবে তোকে শাস্তি দিচ্ছি—"

ভাই দিদির কাছ হইতে দূরে সরিয়া যায়। আরম্ভ হয় ভাইবোনে ভোরবেলার লড়াই।

মা পাশের ঘরে ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত—সাড়া পান। ডাক দেন, "হাঁরে—সকালবেলা রোজ রোজ এই কি কাণ্ড! তোরা উঠবিনে—হাতমুখ ধুবিনে? ওঠ, ওঠ।"

নেহাৎ গোবেচারা কিছুই জানে না—দুইটি পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া—হাতমুখ ধুইতে বাহির হয়।

এবার পড়ার সময়।

ভাইটির এখনও পড়া আরম্ভ হয় নাই—দিদি পড়ে—তাই তাহাকেও পড়িতে হয়।

দিদি পড়িতেছে—

"শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন॥
পিতামাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে॥

লক্ষ্মণ বলেন, আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর॥
যেই তুমি সেই আমি বিধাতা তা জানে,
যদি হেথা থাকি একা কি করিবে বনে॥"

ভাই শুনিল, মন দিয়া দুই-তিনবার শুনিল—তারপর নিজের হাতের বইখানা ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"শ্রিরাম বলেন শুন অনুজ লকমন, পিতামাতা কাতর হবেন শোকে,
দেশেতে থাকি কর সবার পালন। শান্ত হবেন তোমার মুখ দেখে।

আঃ, তারপর কি দিদি বল্ না! আমার কি পড়াশুনা নাই? আমার যে পরীক্ষা আছে—শীগগির বল্!"

দিদি আবার পড়ে—ভাই আবার শুনে।

সকালের খাবার প্রস্তুত—মা খোকনকে ডাক দেন—"এস সোনা—খেয়ে যাও।"

খোকন বলে, "আঃ মা, বিরক্ত করো না। আমি এখন যেতে পারব না—দিদি পড়বে আর আমি বুঝি পড়ব না? আমার বুঝি পরীক্ষা নেই?"

দিদি ভাইকে মার কাছে লইয়া যায়। ভাই যাইতে যাইতে বলে, "আচ্ছা দিদি, রামের ভাই তো লক্ষ্মণ ছিল—সীতার ভাই কে ছিল?"

দিদি বলে, "কেন ভাই, আমি সীতা—তুমি আমার ভাই।"

ভাই খুব খুসী। তাই তো, এতক্ষণ মনে হয় নাই। দিদির নাম তো সীতা। খোকনটি তো তার ভাই! কি মজা!

দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া যায়। দিদির স্কুলের সময় হয়। দিদি স্নান করিয়া ভাত খাইতে বসে।

খোকন আবদার ধরে—"মা, আমিও দিদির সঙ্গে খাব, স্কুলে যাব।"

মা বারণ করেন—কে তাহা গ্রাহ্য করে? দিদির সঙ্গে খোকন যাবেই যাবে।

মা বলেন, "কী যে হতভাগা ছেলে হয়েছে—কেবল আবদার, জ্বালিয়ে খেলে।"

দিদির চোখে জল আসে। বলে—"মা, তুমি ওকে গাল দিলে! আচ্ছা, বাড়ীর ঝি তো আমার সঙ্গে যাবেই—চলুক না ও ওর সঙ্গে—আবার ফিরে আসবে।"

খোকনের মুখ হাসিতে ভরিয়া যায়!

* * * *

দিদি স্কুলে—দুপুরটা যেন খোকনের আর কাটে না। বারবার মাকে জিজ্ঞাসা করে—"দিদি কখন আসবে মা?"

দিদি ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে খোকন দিদির কোলে ঝাপাইয়া পড়ে। আদরে দিদি ভাইটিকে কোলে তুলিয়া নেয়—বারবার চুমো দিতে থাকে। ভাই জিজ্ঞাসা করে—"দিদি, তুমি পরীক্ষা দিয়েছ? তাই তো তোমার হাতে কালি লেগে রয়েছে!"

দিদি বলে, "হাঁ এই তো দেখ না।"

সন্ধ্যায়—দিদি ঠাকুরের কাছে প্রদীপ দিয়া প্রণাম করে। ভাইটিও প্রণাম করে—"ঠাকুর, আমার মার ভাল কর, আমার দিদির ভাল কর।"

দিদি দাঁড়াইয়া হাসে। ভাইএর রাগ হইয়া যায়—"তুমি কেন হাসলে? তুমি মন্দ, তুমি হাসলে কেন?" সঙ্গে সঙ্গে দিদিকে মারিতে আরম্ভ করে, চুল ধরিয়া টানিতে থাকে।

দিদি বলে, "উঃ লাগে, লাগে, ছাড়—ছাড়।"

ভাইর সেই এক কথা—"তুমি হাসলে কেন?" আবার মার!

মা বলেন, "মুখপুড়ি, তোর কি হাত নেই? ওর বড় বাড় হয়েছে—দাঁড়া আমি মজা দেখাচ্ছি। এই খোকন—আমি আসছি।"

খোকন এবার একেবারে "ভ্যা"!

দিদি আদর করিয়া চুমো দেয়—ভাইকে কোলে তুলিয়া মার কাছে লইয়া যায়!

দীর্ঘ বিশ বছর পর।—

দিদি এখন নিজের ঘর-সংসার সামলাইতেছেন।

বড় ছেলেটি কলেজে পড়ে—হাতে একখানা চিঠি লইয়া মার কাছে আসে—"মা, এই দেখ মামা আসছেন আজই—হাঁ মা, মামা এতদিন আসেন নি কেন?"

মা চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়েন—"হাঁরে সত্যি তো আসছে! তাই তো কি করা যায়? যা না তুই, একটু বাজারে যা না।"

"কেন মা, বাবাই তো বাজারে গেছেন!"

"আঃ, যা বলছি তাই কর না! খোকন বড় মুড়িঘণ্ট ভালবাসত—মাছের মুড়ো আনতে হবে, আর—আর ভালবাসত বাঁধা কফি।"

"কিন্তু মা, এ সময় কফির তো খুব দাম—পাওয়া যাবে কিনা তাও সন্দেহ।"

"আঃ, যা বলছি তাই কর না! আমি বলছি পাবি—এই যে টাকা—যা শীগগীর বাজারে যা।"

দিদি ভাবিতে থাকেন—ভাই আর কি কি ভালবাসিত? হঠাৎ মনে পড়ে—ভাইটি ভয়ানক সৌন্দর্যপ্রিয়! বড় মেয়েকে ডাক দিয়া বলেন, "এই খুকি, সমস্ত ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রেখে দে। গাছের ফুল দিয়ে একটা তোড়া করে ফুলদানিতে বসিয়ে দে। আর সব বইটই সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে দিস্। তোদের মামা কিন্তু ভয়ানক খুঁতখুতে লোক!"

সমস্ত বাড়ীটায় একটা সাড়া পড়িয়া যায়।

দুপুরবেলা সবাই যার যার কাজের জায়গায় বা স্কুলে কলেজে চলিয়া যায়।

রান্না শেষ করিয়া দিদি দুপুরে বিশ্রাম করিতে বসেন বারান্দার এক কোণে—সদর দরজার দিকে মুখ করিয়া।

আসার সময় প্রায় চলিয়া গেল—ভাইটি তবুও আসিল না। ও কি সত্যি আসিবে না ?

কত বছর ওর সঙ্গে দেখা হয় নাই। কত কথাই মনে পড়ে!

সেবার দিদির খুব জর হয়—প্রায় অজ্ঞানের মত হইয়া থাকিত। যখনই জ্ঞান হইত, তাকাইয়া দেখিত, খোকন শিয়রের কাছে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। ওদের মা বলিতেন, "দ্যাখ্ দ্যাখ—হতভাগাটা একটি বারের জন্যও তোর কাছ থেকে যেতে চায় না! বসেই আছে—বসেই আছে! ওকে খাওয়ান যে কি কষ্ট হয়েছে আজকাল!"

রোগশয্যায় দুর্ব্বল শরীরে—সহজে চোখে জল আসে। দিদি চোখ বন্ধ করিয়া থাকে—ভাইটি কাঁদিয়া উঠে—"মা, দেখ দেখ দিদি বুঝি মরে গেল—মরে গেল!"

পরম আদরে দিদি ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হাতখানা ভাইয়ের দিকে বাড়াইয়া দেয়।

আবার মনে পড়ে—আর একটি দিনের কথা। খোকন তখন খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগছে—বমিতে বমিতে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে। দিদি তাই পরিষ্কার করিয়া হাতমুখ ধুইয়া ভাইটির পাশে আনিয়া বাতাস করিতেছে। ভাইটি বড় হইয়াছে, বুঝিতে শিখিয়াছে—বলে—"দিদি, তোমাকে বড় কষ্ট দিলাম—না!"

দিদি উত্তর দেয়—"কি যে বলিস্।"

আরও কত কথা মনে পড়ে। খোকনকে যদি কেহ একটুকরা আম দিয়াছে—খোকন অমনি জিজ্ঞাসা করিয়াছে—'দিদিরটা দেও' এবং যে পর্য্যন্ত দিদিকে না দেওয়া হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত আমটুকু হাতে করিয়া রাখিয়াছে।

সেই খোকন এখন কত বড় হইয়াছে—কতদিন দেখা হয় নাই—দেখিতে কেমন হইয়াছে কে জানে!

দুষ্টুমিও ওর কম ছিল না। ভাইফোঁটার খাবার তৈরী করিয়া রাখিয়া একটু এদিক ওদিক হইলেই খাবার সব উধাও হইয়া যাইত। ফোঁটা দেওয়া হইল তো কিছুতেই দিদিকে প্রণাম করিবে না! যদিই বা প্রণাম করার মন হইল—প্রণামের নামে দিদির পায়ে চিমটি কাটিয়াই ভোঁ দৌড়! তারপর আরম্ভ হইল ছুটাছুটি—দিদি দৌড়ায় তো ভাই পালায়। সেই খোকন।

বৈকাল হইয়া গেল, ছেলেমেয়েরা আসিয়াই জিজ্ঞাসা করে—"মামা এসেছেন, মা ?"

দিদি কোনও উত্তর দেন না—তাঁহার বুক ঠেলিয়া কান্না আসে। সমস্ত দিনের পরিশ্রম—বাছিয়া বাছিয়া খোকন কি ভালবাসিত রান্না করিয়া রাখিয়াছেন—অথচ খোকন আসিল না!

সন্ধ্যা হইয়া যায়। ছেলেমেয়েরা পড়িতে বসে।

বাড়ীর কর্ত্তা ফিরিয়া আসেন—বলেন, "তা দুঃখু করে কি হবে ? নেহাৎ খাওয়াটা আমাদেরই কপালে আছে। খাওয়ার কপাল তো সবাই লইয়া আসে না!"

দিদি রাগিয়া বলেন, "এ খাবার আমি কাউকে দিতে পারব না! খোকন এল না—কেন

এল না? ওরা বড় হলে কি এমনি করেই সব ভুলে যায়? আমি এখন ওদের কেউ না! ওরা এখন এমনি করে আমাকে পর করে দিল!"—দিদির চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিদি যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না! দিদি কি এতই পর হইয়া গেলেন?

ছেলেমেয়েরা পড়িতে থাকে—রাত্রি বাড়িতে থাকে, দিদির দুঃখের বিভাবরী অবসান হইবে না।

হঠাৎ দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ শোনা যায়। দিদি পাগলের মত দরজার দিকে ছুটিয়া যান—"খোকন এলি! খোকন!"—

দরজা খুলিয়া দিদি দাঁড়ান। তাঁহার সম্মুখে চব্বিশ বৎসরের যুবক—মুখে একটু মৃদু হাসি—বাঁ হাতে একটি ছোট ব্যাগ। ডান হাতে প্রণাম করিয়া যুবক বলেন, "হাঁ দিদি, তুমি কি এখনও আমাকে খোকন বলে ডাকবে? আমি যে এখন মিঃ রয়। আমার কি সম্মান নেই—তোমার ছেলেমেয়েদের সামনেও আমি খোকন!"

দীর্ঘ দশ বছর পরে ভাই ও বোনের মিলন।

বাড়ীর কর্ত্তা একটু গম্ভীর প্রকৃতির ভাবুক মানুষ—বাড়ীর কাছেই একটা বড় আমগাছের দিকে তাকাইয়া আছেন।

শ্যালক আসিয়া ভগ্নীপতিকে প্রণাম করিয়া বলেন, "কি, কাব্য হচ্ছে নাকি?"

ভগ্নীপতি মৃদু হাসিয়া বলেন, "না, ঠিক কাব্য নয়। দেখছি, একটা বড় আমগাছ থেকে একটি স্বর্ণলতা বেরিয়ে গিয়ে—বাইরে ঝুলে পড়েছিল। কে যেন সেই লতাটিকে ঐ গাছেরই পাশে ওরই একটা ছোট চারার গায়ে মিশিয়ে দিয়েছে।"

জয়তু জিতু
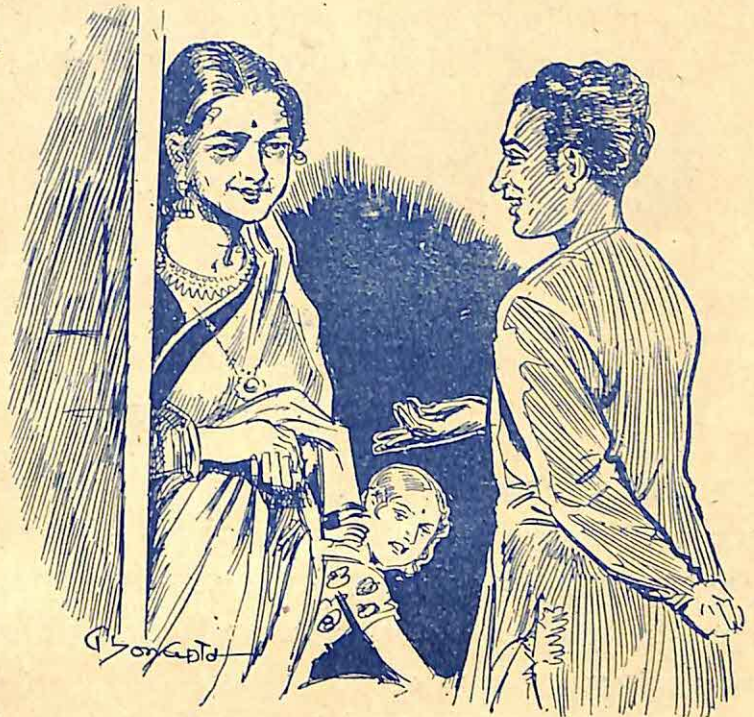
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

দেশের মুক্তি-যজ্ঞে রক্ত যারা দিল অথবা রক্ত যারা নিল, তাদের বিস্তৃত বিবরণ কে রেখেছে? তা রাখতে যাওয়া তখন নিরাপদও ছিল না, সম্ভবও ছিল না। কখনও দেখা যায়, বিভিন্ন দিক থেকে মুক্তি-যজ্ঞের পূজারী এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যু-বেদীর 'পরে—তাদের নাম এক, উদ্দেশ্যও এক। আবার কারও দেখি, ছদ্মনামেই তার শেষ পরিচয় রেখে গেল রক্তের অক্ষরে, কেউ বা অজ্ঞাতই থেকে গেল নাম-গোত্রহীন ফুলের মত সুগন্ধ ছড়িয়ে।

নাম এরা চায়নি, দেশের মুক্তিই এরা চেয়েছিল নিজেকে বিসর্জন দিয়ে। মা যদি সন্তানের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিতে পারেন, নিজের প্রাণের বিনিময়ে সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নিতে পারেন দেবতার কাছে,—সন্তানই বা কেন তা পারবে না?

'জিতু, তুই সরে যা এখান থেকে, তোর ভালর জন্যই বলছি।'—বলল সত্যেনদা।

—এক হাঁড়ী রসগোল্লা দাও ত যেতে পারি।

—রসগোল্লা হজম করার ক্ষমতা তোর হয়নি এখনও।

—না, হয়নি;—দিয়েই দেখ না।

—দিলে কি করবি?

—দেবতাদের ধূপ-ধুনো দিয়ে রসগোল্লার ভোগ দেবো।

ঠিক এর আগেই হয়ে গেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। গ্রামের ছোট ছেলে আমরা তখন। 'রসগোল্লা' বলতে বুঝি ময়রার দোকানের খাবার, আর দেবতা বলতে বুঝি—কার্তিক, গণেশ, শিব, দুর্গা এদের।

কিন্তু এই জিতুর হাতেই তখন দেওয়া ছিল—ভাঁড়ারের চাবি। টিন বোঝাই 'রসগোল্লা' সে আগলে থাকত, অথচ একটা রসগোল্লাও তার ব্যবহার করবার অধিকার ছিল না।

ময়রা ছিল কে?—চেহারা মনে আছে অনেকের, কিন্তু নাম সব মনে নেই। একজনের নাম ছিল শৈলেন। অতবড় পালোয়ান জোয়ান ছেলে আমি দেখিনি। সে রোজ ডন-বৈঠক করত আমাদের মণ্ডপঘরের পিছনের ফাঁকা জায়গাটায়। যতদূর মনে হয়, এদের পরিচালক ছিলেন 'সুনামি' অর্থাৎ সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ইনি।

ইংরেজের অখণ্ড প্রতাপের যুগ ছিল সেটা; কিন্তু তাদেরই নৃশংস অত্যাচার ও অহঙ্কারের ফলে একটা আত্ম-চেতনা এসে গিয়েছিল মানুষের মনে। স্বদেশী আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। মুকুন্দ দাস গান ধরেছে:

'বিদেশী, আর কি দেখাও ভয়?
হাত বাঁধিবে পা বাঁধিবে,—ধরে না হয় জেলে দেবে
মনকে কি বাঁধিতে পার এমনি শক্তি রয়?'

চারিদিকে যখন ধর-পাকড়ের ধুম, জিতেন তখন তার ভাঁড়ার ঘর করল-কোথায়?

আমাদেরই গ্রামে—রাজা সীতারামের রাজধানী মামুদপুরে। কেবল উপন্যাস রচনায় নয়, বোমা তৈরী, গোপন ষড়যন্ত্র এবং নিষিদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্র রাখার পক্ষে সীতারামের রাজধানীটির ছিল একটি চমৎকার পরিবেশ। চারদিকে গড়, তার মধ্যে দুর্গম-অরণ্য-সমাচ্ছন্ন রাজার সুবিস্তৃত বাসভবন। চারদিকে শত্রুর মধ্যে বাস করতে হ'ত বলে রাজার বাসভবনে ছিল আত্মরক্ষার বিবিধ কৌশল। তা ছাড়া, সেখানে বুনো শুয়োর ছিল, সাপ ছিল এবং দিনের বেলাতেও সেখানে কখনও কখনও বাঘ ডাকত। অথচ তারই মধ্যে রাজার কাছারী ছিল, মন্দিরে পূজারী ছিল আর ছিল অতিথি-অভ্যাগত এবং সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা।

'ধন-পুকুরের' উপরেই ছিল কণ্টকবন-সমাচ্ছন্ন লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টপল দ্বিতল মন্দির। মন্দিরের এই উপরের ঘরে চলত ভাঁড়ারের কাজ—'রসগোল্লা' অর্থাৎ বোমা তৈরী। মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না, সেখানে ছিল চামচিকার রাজ্য। দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ান যেত না। দরজা দিয়ে উঁকি মারলে উপরে উঠবার একটা ভাঙ্গা সিঁড়ি দেখা যেত। তার উপর বড় বড় সাপের খোলস এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হ'ত যে, অতি বড় দুঃসাহসীও সেখানে যেতে ভরসা পেত না।

দিনের বেলায় দড়ির উপর দিয়ে বাজিকরদের যেতে দেখে অবাক হয়েছ তোমরা; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে অরণ্য মধ্যে রেল-স্টেশনের বেড়ায় যে সীসার পাকানো তার থাকে, ঐ তারের উপর দিয়ে যেতে দেখেছ কাউকে?

দেখেছে দশভুজা-মন্দিরের পুরোহিতের স্ত্রী। চারখানি হাত, মাথায় মুকুট, স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ শূন্যের উপর দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছেন—আলো-অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য ইনি তা দেখেছেন কখনও কখনও।

সত্যেনদা অবাক হয়ে শুনে বলতেন: দেবতার দর্শন মহাপুণ্যের ফল; কিন্তু কাউকে তা কখনও বলতে নেই। বললে, এমনও দেখা গেছে—তার বংশ থাকে না।

পুরোহিতের স্ত্রী চোখ বুজে, হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতেন।

গোলাগুলির রক্ষক জিতেন—কয়েকটি গাছের উপর দিয়ে এসে, মাথায় কাপড় জড়িয়ে ও দুই হাতে একখানা লাঠি নিয়ে ভারকেন্দ্র ঠিক রেখে, একটা গাছের ডাল ও মন্দিরের দোতালার সঙ্গে বাঁধা তারের উপর দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে রাত্রে আসা-যাওয়া করত।

'তুই সরে যা জিতু, বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস্'—বলতেন সত্যেনদা। কিন্তু 'রসগোল্লা' না পেলে জিতু নড়বে না। তার ধারণা, সে একজন একনিষ্ঠ পূজারী, অথচ তাকে একটা খুব কঠিন, বড় রকমের পূজোর ভার না দিয়ে তার উপর অবিচার করা হচ্ছে।

ধরা পড়ল একদিন জিতু পুলিসের হাতে—কোন্ একটা ডাকাতির ব্যাপারে।

—পা ভাঙ্গল কি করে?

—আছাড় খেয়ে পড়ে।

—আছাড় খেলে কেন?

—পালাতে গিয়ে।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—ডাকাতের ভয়ে।

—অত রাত্রে তুমি ওখানে গেলে কি কাজে?

—পথ দিয়ে আসছিলাম, অনেক রাত হয়ে গেল। পথ চলতে সাহস হ'ল না। দোকানের সম্মুখে বাঁশের মাচানে শুয়ে পড়লাম। চেঁচামিচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি, চারদিকে আলো আর জোয়ান জোয়ান লোক—ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। তারপরেই ডাকাতেরা আমায় মেরে ফেলবে ভেবে দিলাম ছুট্—আর পড়ে গেলাম একটা খানার মধ্যে। অনেক রকম পীড়ন করা সত্ত্বেও এর বেশি কিছু বেরোল না তার কাছ থেকে। খালাস পেয়ে গেল জিতেন।

শ্রাবণ মাস। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিকে। বৃষ্টি নেমেছে সন্ধ্যা থেকেই। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে ঘূর্ণি পল্লী থেকে ফিরছি একা। নদীর ধারের সুরকি কলের কাছে এসে ছাতিতে ছাতিতে লেগে গেল ধাক্কা আর একজনের সঙ্গে।

—কে?

—আমি।

—মাস্টার মশায়?

—হাঁ।

—এই অন্ধকারের মধ্যে আপনি—

—হাঁ, একটি লোকের খুব অসুখ, তাকে একবার দেখতে যাচ্ছি।

অধ্যাপক ঘোষকে জানতাম। ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক—রামেন্দ্র ঘোষ। তাঁর মত পরদুঃখকাতর, সরল, অমায়িক ও মহৎ হৃদয়ের লোক খুব কমই দেখা যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম: আমি সঙ্গে যাব স্যার!

—না-না। তুমি যাও। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব—কোনও অসুবিধা হবে না আমার।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা: আমি আপনার সঙ্গে যাবই। অন্ধকারে একা আপনাকে এই জল-কাদায় পেছল রাস্তায়—

রামেন্দ্রবাবু আমাকে সঙ্গে নেবেন না—আমিও তাঁর সঙ্গ ছাড়ব না! অবশেষে রফা হ'ল: তারা খুব গরীব; এমন কি, বসতে দেওয়ার জায়গাটা পর্যন্ত তাদের নেই। তুমি যদি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পার—তা'হলে হতে পারে।

আমি তাতেই রাজী।

সরু গলির মধ্যে জঙ্গলের পাশে একটা জীর্ণ বাড়ীর নিকটে এলে মাস্টার মহাশয় আমাকে দাঁড়াতে বললেন। তাঁর হাতে কাগজে জড়ান কিছু ফল।

দাঁড়ালাম সেখানে। টিম-টিম করে একটা প্রদীপ জলছে—ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে তা দেখা যাচ্ছে।

ঔৎসুক্য জাগল—কে এই রোগী?

জানালার নিকটে গিয়ে দাড়ালাম। ছায়ার মত দুই-একটি মানুষ চলাফেরা করছে। সবই যেন রহস্যময়। শুনতে পেলাম, ডাক্তার, ওষুধ এবং কয়েক বার কানে এল শুধু—জিতেন নামটি।

কে এই জিতেন? অধ্যাপক ঘোষের কাছ থেকে ওদের সম্বন্ধে কোন কথাই জানতে পারিনি পরে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ বাংলার বিপ্লবীদের স্মরণীয় দিন। এই বছরই 'বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের দমন' আইন পাস হয়। এই বছরেই ঢাকার কামাক্ষ্যা সেন নিহত হয়েছিল, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-সম্পাদক ওয়াটসনকেও দুই দুইবার হত্যার চেষ্টা হয় এই বছরই। ৬ই ফেব্রুয়ারী বীণা দাস কনভোকেন সভায় জ্যাকসনকে গুলি করেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী বক্‌সা বন্দী-নিবাস থেকে অদ্ভুত উপায়ে পালিয়ে এলেন জিতেন গুপ্ত। ইনি কোন্ জিতেন?

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় না থাকলেও এঁদের নাম লুপ্ত হবে না কখনও।

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

অ-আ ক-খ শেষ হয়েছে কবে,—
এখন খোকা লিখ্‌তে পারে কতো !
বাবাকে তার লিখ্‌তে চিঠি হবে,
কলম নিয়ে লিখ্‌বে দাদার মতো !

লিখ্‌লো খোকা—**'আস ন কন বব**
আর কটদন পজর আছ বক
আসব নয় জত আমর কব
পণম জন ইত তমর থক ॥'

আস্‌তে বাবা বল্‌লো খোকা তাঁকে—
'পেয়েছ ঠিক আমার চিঠিখানা !
দিয়েছিলাম ছুঁড়ে হাওয়ার ডাকে,
পেয়েই চিঠি আস্‌বে ছিল জানা ॥

এনেছো, কই, দেও না জুতো মোরে,
মায়ের কাছে বের কোরো না যেনো !
বল্‌বে—"দিলাম সেদিন কিনে ওরে,
নতুন জুতো ফের এনেছো কেনো ?" '

ভুতুড়ে বাংলো

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছে অনেক দিন আগেই। কিন্তু তখনো যুদ্ধের বিভীষিকা যেন ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে। মানুষের মনে তখনো অবসাদ, দেহে অবসন্নতা।

মিঃ কাইচিয়া ভাবলেন, সিঙ্গাপুরের ওপর দিয়ে যে তাণ্ডব বয়ে গেছে কয় বছর ধরে, মানসিক দিক থেকে তার জের কাটিয়ে উঠতে হলে কিছুদিনের জন্যে বাইরে ঘুরে না এলেই আর নয়। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শও হ'ল। কর্তার কথায় গৃহিণী তেমন গুরুত্ব না দিলেও স্থির হয়ে গেল, এবার গরমের ছুটিতে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়া হবে।

এ আলোচনায় মিসেস্ কাইচিয়ার যে মনের যোগ ছিল না, তা লক্ষ্য করেছেন মিঃ কাইচিয়া।

অবশ্যি গৃহিণীর এ মনোভাবের যে সঙ্গত কারণও রয়েছে, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। আগের দু'বছরও সব ঠিকঠাক করে জরুরী কাজের অজুহাতে শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করা হয়েছে। তাই অন্তত বেড়ানোর ব্যাপারে পরামর্শ বা পরিকল্পনায় যে কোন আস্থা নেই আর মিসেস্ কাইচিয়ার, তা' আবিষ্কারে আর বেগ পেতে হয় নি। সারা ঘরময় কালো মেঘের কারণই তাই। শেষে এই নিয়ে বেঁধে যাবে একটা ঘরোয়া যুদ্ধ! বেচারা নিজেকে নিরুপায় ভেবে একেবারে প্রতিশ্রুতিই দিয়ে বসলেন, এবার আর কথার নড়চড় নয়—এবার ব্যবস্থা একেবারে পাকা।

সত্যিই কাজের মানুষ মিঃ কাইচিয়া। সিঙ্গাপুরের অনেকদিনের সম্পন্ন অধিবাসী এই চীনা পরিবার। নিজে একজন নামকরা ইঞ্জিনিয়ার। মস্ত বড় একটা বৃটিশ ফার্মের চীফ ইঞ্জিনিয়ার তিনি। এক একটা অতিকায় বাড়ি যখন গড়ে ওঠে তাঁর পরিচালনায়, বিরাট বিরাট এক একটা পরিকল্পনা যখন সফল রূপ নেয় তাঁর ব্যবস্থাপনায়, সাফল্যের আনন্দে—সুনামের গৌরবে যেন ফেটে

পড়েন মিঃ কাইচিয়া। নিজেকে স্বয়ং বিশ্বকর্মার সঙ্গে তুলনা করে ফেলেন মনে মনে। বিশ্রামের কথা তখন কি আর মনে আসে কাজের নেশায়?

মহাযুদ্ধের অবসানে সিঙ্গাপুর পুনর্গঠনের কাজে অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছিল মিঃ কাইচিয়ার ওপর। তাই গত দু'বছর তাঁর পক্ষে গ্রীষ্মাবকাশ ভোগ করা কোন রকমেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই বড় সাহেব তাঁর ছুটি মঞ্জুর করে রেখেছেন আগে থেকেই। মানুষের জীবনে অবকাশ তো চাই-ই! কাজের প্রেরণার জন্যেই তার প্রয়োজন। এক বছর, দু'বছর, তিন বছরেও যদি বিশ্রামের অবসর না মেলে, তা'হলে সে কাজ ছেড়ে দেওয়াই ভাল, সেদিন কথায় কথায় মিসেস্ কাইচিয়া স্বামীকে শুনিয়েও দিয়েছেন এই কঠোর সত্য কথাটি।

এদিকে ছুটির দিন ঘনিয়ে আসে। উদ্যোগ দেখে বুঝতে দেরী হয় না যে, এবার বায়ু-পরিবর্তনে বেরুব'র ব্যবস্থা সত্যি পাকা! এটা-ওটা দেখে শুনে গুছিয়ে নেবার তাগিদ আসে গৃহিণীর ওপর। তাগিদের মাত্রা যতটা বাড়ে মিসেস্ কাইচিয়ার উল্লাসের মাত্রাও বেড়ে চলে সেই পরিমাণে। শেষে পর্যন্ত সত্যি তাঁরা পা বাড়ালেন পেনাঙ-এর পথে। সমুদ্র-যাত্রার সে কী উন্মাদনা!

ক্ষুদ্র সমুদ্র-ভূমি পেনাঙ। সিঙ্গাপুরেরই প্রতিবেশী দ্বীপখণ্ড। রাজধানীও সিঙ্গাপুরেই। তবু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পেনাঙ আকর্ষণ করে আশপাশের লোকদের। প্রতি বছর তাই অসংখ্য স্বাস্থ্যকামী ও সৌন্দর্যপিপাসুর ভিড় জমে এই দ্বীপরাজ্যে। বৃটিশ উপনিবেশ ষ্ট্রেইটস্ সেটেলমেণ্টের অংশবিশেষ পেনাঙ। বৃটিশ সভ্যতার নানা প্রতীক তাই ছড়িয়ে রয়েছে সারা দ্বীপ জুড়ে। শহরের ঠিক পিছনেই তীরভূমির দূরে দাঁড়িয়ে আড়াই হাজার ফুট উঁচু পেনাঙ পাহাড়। পাহাড় আর সাগরে যেন কোলাকোলি।

পাহাড়ের ওপর বড় বড় সাহেব-সুবোদের আড্ডা। বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী বাংলো। একটি উঁচু দরের হোটেলখানাও রয়েছে সেখানে। দু'চার দিনের জন্যে কোন ধনী লোক এলেন বেড়ানোর শখ মেটাতে কিংবা কোন বড় অফিসার বা ব্যবসায়ী রাজধানী সিঙ্গাপুর থেকে এলেন পেনাঙে বিশেষ কোন কাজে, তাঁরা সাধারণত এই পাহাড়ী হোটেলেই আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সাময়িক আস্তানা হিসেবে এই হোটেলটির কদরই এখানে সব চেয়ে বেশি। তাই লোকজনের আনাগোনাও এখানে সর্বক্ষণ, ভিড়ের আর শেষ নেই।

সেদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাইচিয়া পরিবারও এসে উঠলেন এই পাহাড়ী হোটেলেই। মিসেস্ কাইচিয়া একেবারে প্রথম হলেও কাইচিয়া সাহেব নিজে কিন্তু আর একবার এসেছিলেন পেনাঙে মাত্র এক রাত্রির জন্যে। যুদ্ধের হৈ-হল্লার সময় জরুরী কাজে এসে ঘুরে-ফিরে কিছু আর দেখবার অবসর ছিল না তখন। এই হোটেলেই এসে এক রাত্রির মধ্যে সব কাজ মিটিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন সেবার। সেই পরিচয়েই এবারও সস্ত্রীক এখানেই এসে উঠেছেন মিঃ কাইচিয়া। কিন্তু মিসেসের পছন্দ নয় হোটেলে থাকা। হোটেলের হট্টগোলে তাঁর বিতৃষ্ণা ছোটবেলা থেকেই।

তাই এসে অবধিই তিনি বায়না ধরেছেন, নিরিবিলি একটা বাংলো ভাড়া নিতে হবে সেদিনই, তাঁর মন হাফিয়ে ওঠে হোটেলে।

মিঃ কাইচিয়া অগত্যা বেরিয়ে পড়েন বাংলোর খোঁজে। কিন্তু খোঁজাই সার। কোথাও খালি বাংলো চোখে পড়ল না তাঁর। দু'চারজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেও তিনি নিরাশ হয়েছেন। একজন তো পরিষ্কার বলেই দিলেন, "মশাই, এখন সন্ধান করছেন এ অঞ্চলে বাংলোর? ছুটির এক মাস আগে থেকেই এখানকার বাংলো-বাড়ী সব আগাম ভাড়া হয়ে থাকে।"

গিন্নীকে আর খুশি করার উপায় নেই ধরে নিয়েই ভাবতে ভাবতে হোটেল ফিরতি নতুন একটা পথ ধরে মোড় ঘুরতেই 'টু লেট' মার্কা বেশ একটা ফিটফাট সাহেবী ধরনের বাংলো চোখে পড়ল মিঃ কাইচিয়ার। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। কী ব্যাপার! যেখানে একমাস আগে থেকেই সব বাড়ী আগাম ভাড়া হয়ে আছে, সেখানে এমনি একখানি বাংলো পড়ে থাকার মানে কী? তেমন পুরানোও তো নয়, যুদ্ধের কিছু আগের তৈরী হবে হয়তো!

মাথায় এ ধরনের নানা কথার জট-পাকানো শুরু হতেই মিঃ কাইচিয়া ঐ বাংলোর সামনেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, 'ঠিক জায়গামত বাড়িটা যখন মিলেই গেল, তখন আর অতো ভাবাভাবি কিসের? আগে তো উঠে আসা যাক্ গিন্নীকে নিয়ে হোটেল থেকে, তারপর না হয় গবেষণা করা যাবে। একটা বাড়ি ঠিক না করে মিসেস্‌কে মুখ দেখানোই যে যাবে না। আগে আত্ম-সম্মান, তারপর অন্য কথা।'

যেমনি এই ভাবা হঠাৎ বাংলোর ভেতর থেকে কে যেন সুর করে বলে উঠলো:

বাংলো চাই, এ্যাংলো মালিক আছেন পাশের বাড়ি,
এমনটি আর মিলবে নাকো—ভাড়ায় সস্তা ভারি।

অভিনব কণ্ঠে আওড়ানো এই ছড়া শুনে আৎকে ওঠেন কাইচিয়া সাহেব। কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে সমস্ত ব্যাপারটা! আবার সেই আওয়াজ:

ভাবনা কিসের, বাংলো পেলেন পরাণ খুলে হাসুন;
ভয় কিছু নেই—সাহস করে সটান চলে আসুন।

কোথা থেকে আসছে এই অজ্ঞাত কণ্ঠস্বর?

জামার নীচে লুকানো পিস্তলের খাপটা বাঁ হাতে চেপে ধরে সরাসরি ঐ বাংলোর বারান্দায় যেয়ে ওঠেন মিঃ কাইচিয়া এবং দরজায় কড়া নাড়তেই আবার নির্দেশ আসে:

এখানে নয় বলছি তবুও কেন কড়া নাড়া?
পাশের বাড়ি আছেন মালিক দিয়ে আসুন ভাড়া।

ঠিক আছে। দেখাই যাক্ না কি দাঁড়ায়। কাইচিয়া সাহেব আর কোন চিন্তা না করে চলে গেলেন পাশের বাড়িতে মালিকের সন্ধানে। বাড়ির গেটে নেমপ্লেটে লেখা—জুলিয়ান হ্যারি।

প্রথমবারেই মালিকের সঙ্গে দেখা। তাঁর নিজের বাংলোর সামনের প্রকাণ্ড হল-ঘরে বসে তিনি একা একাই নিরিবিলি পাইপ টানছিলেন আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন—'সিঙ্গাপুর টাইমস্'। অতিবৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক। বয়স নব্বইয়ের কোঠায়। কাইচিয়া সাহেব ঘরে ঢুকতেই তাঁকে তিনি সবিনয়ে আসন গ্রহণে অনুরোধ জানালেন এবং অতি মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী তাঁর প্রয়োজন।

প্রয়োজনের কথা মিটে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। তারপর অনেকক্ষণ ধরে হ'ল নানা রকমের গল্পসল্প। তাতে অনেক কথাই জানা গেল বৃদ্ধ ভদ্রলোক সম্বন্ধে। পেনাঙ পাহাড়ের উপরকার এই এক সারির সমস্ত বাংলোর মালিকই তিনি। শহরের মধ্যেও আছে আরো খানকয় বাড়ি। শুধু তাই নয়, প্রকাণ্ড এক রবারের কারখানা রয়েছে তাঁর মালয়ে। তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের মূলই ঐ রবারের কারখানা। এখন ঐ কারখানা পরিচালনা করেন তাঁর দুই ছেলে। প্রয়োজনমত ছেলেরা প্রায়ই আসেন বুড়ো বাপের পরামর্শ নিতে। দূর তো আর খুব বেশি নয়—মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল পেনাঙ বন্দর থেকে মাত্র আড়াই মাইল। বুড়ো নিজেও বছরে অন্তত একবার কারখানার কাজকর্ম দেখতে মালয় ঘুরে আসেন। বছরের বাকি সময়টা তাঁর কাটে রেসকোর্স নিয়ে। পেনাঙ্ রেসকোর্স সাহেব মহলে খুবই বিখ্যাত। ঘোড়দৌড়ের মাঠও বুড়োর বাংলোর কাছাকাছিই। গত কয় বছর ধরে এই ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার নিয়েই মেতে আছেন তিনি। 'সিঙ্গাপুর টাইমস্'এর ঘোড়দৌড়ের পাতাটাতেই তাঁর চোখ নিবদ্ধ থাকে অধিকাংশ সময়।

যাক্, নির্ধারিত ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিয়ে কাইচিয়া সাহেব চাবি নিয়ে চলে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন মালিককে, "আচ্ছা, আপনার এই বাংলোর ভাড়া এত কম হবার কারণ কি?"

"ও, সে কথা জিজ্ঞেস করছেন! আসলে এ বাংলোটা বাইরের লোকদের কাছে ভাড়া দেওয়াই হয় না। এটা রিজার্ভ রাখা হয় আমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে। প্রতি বছরই কোন না কোন পরিজন আসেন পেনাঙ্ বেড়াতে। স্বভাবতই তাঁরা সবাই এসে প্রথমে আমার কাছেই ওঠেন। নামমাত্র ভাড়ায় তাঁদেরকেই আমি এ বাংলো দিয়ে থাকি। এই ব্যাপার!"—হ্যারি সাহেবের এই সহজ উত্তরে মোটামুটি সন্তুষ্টই হলেন মিঃ কাইচিয়া। হতেও বা পারে!—এই ভাব।

"আচ্ছা, আজই বিকেলে আসছি তা'হলে।"—এই বলে বিদায় নিলেন কাইচিয়া সাহেব।

সন্ধ্যার তখনো বাকি। সমুদ্র-তীরের নারকেলকুঞ্জের ওপর ঢলে পড়েছে অপরাহ্ণের সূর্য। আর সারি-বাঁধা সব নারকেলগাছের বিলম্বিত ছায়া ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে সাগরতরঙ্গে ভেসে চলেছে যেন। সূর্য-বিদায়ের রক্তিমাভা ধূসর পাহাড়কে গৈরিক আবরণে অপূর্ব করে তুলেছে।

এমনি পরিবেশে মিঃ কাইচিয়া সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলেন হোটেল থেকে বাংলোতে। তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সম্বর্ধনার ভাষণ শোনা গেল সেই অপরিচিত কণ্ঠ থেকে :

আসুন আসুন, কি চাই বলুন, সব তৈরী ঘরে;
দেখে শুনে নিন গুছিয়ে কথা হবে পরে।

"কে বলছে এই কথা ?"—মিসেস্ কাইচিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন স্বামীকে।

"দেখোই না কী ব্যাপার !"—পকেটে পিস্তলের গায় হাত রেখে স্ত্রীকে নিয়ে এক এক করে সব ঘরগুলো ঘুরে দেখেন মিঃ কাইচিয়া। বেশ ফিটফাট চারদিক। ঘরে ঘরে নানা রকমের ফার্নিচার সাজানো গোছানো। নিজেদের জিনিসপত্র ভৃত্যকে দিয়ে সব ঠিক ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে দক্ষিণের ঘরের বড় জানালা খুলে গিয়ে দাঁড়ালেন গৃহিণী বাইরের দৃশ্য দেখতে। একটু দূর দিয়েই চলে গেছে ছোট্ট পাহাড়ী রেলপথ যেন একজোড়া পাহাড়ী সাপের খোলস পড়ে আছে পাথর-কাটা রাস্তার ওপর। সন্ধ্যাপূর্ব আবছা-আলোয় চক্‌চক্ করছে সেই আঁকাবাঁকা খোলস জোড়া।

হঠাৎ ট্রেনের হুইসিল বেজে উঠে। কালো কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপর দিকে ওঠে ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। মিসেস্ কাইচিয়া অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অগ্রসরমান ট্রেনের দিকে। ট্রেনখানি আস্তে আস্তে চলে যায় তাঁর সম্মুখ দিয়ে। কাছের স্টেশন থেকে ছেড়ে এসেছে বলেই এই ধীরগতি গাড়িখানার। হঠাৎ একটা কামরায় আট-দশ বছরের একটি ছেলের কচিমুখ চোখে পড়ল মিসেস্ কাইচিয়ার। তাঁর মনে হ'ল যেন তাঁরই ছেলে তাই-চু ফিরে আসছে স্কুল থেকে। একটা বিকট চিৎকার করে তিনি ছুটে গেলেন স্বামীর কাছে, বললেন, "ঐ যে খোকা আসছে।"

ঘরের ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বগুলো সব ঠিক আছে কিনা তাই এক এক করে পরীক্ষা করে দেখছিলেন তখন মিঃ কাইচিয়া। স্ত্রীর এ অবস্থা নতুন কিছু নয় তাঁর কাছে। বৃটিশের বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছিল তাই-চুদের স্কুল। সেই সময় আট বছরের ছেলে তাই-চুও ছিল তার ক্লাসে। অন্যান্য অনেক ছাত্রের সঙ্গে তারও শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটে সেই ঘটনায়। সেদিন তাই-চু স্কুলে গিয়েছে আর ফেরেনি। সে কথাই মায়ের মনে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আর যেন মনে হয়, ঐ খোকা ফিরেছে। আবার একটু পরেই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন—তাই-চু আর ফিরে আসবে না। কিন্তু কেনই বা আসবে না ? ঐ যে খোকার মতোই আর একটি ছেলে ট্রেনে করে তার মায়ের কোলে ফিরে গেল হয়ত কোন্ দূর দেশ থেকে, তবে খোকাই বা আসবে না কেন তার মায়ের কাছে যত দূরই সে যাক না কেন সেখান থেকেই,—এমনি প্রশ্ন আলোড়িত করে তোলে মিসেস্ কাইচিয়াকে সময় সময়।

সেদিনের ঘটনাও তাই। অবস্থা বুঝে কাইচিয়া সাহেব একটু বেরিয়ে পড়েন সান্ধ্য ভ্রমণে। ভৃত্য মুনিয়াকে রেখে যান বাড়ি পাহারায়। মুনিয়া সিঙ্গাপুরের এক তামিলী শ্রমিকের ছেলে। শিশু বয়সে বাপ মারা যাবার পর থেকেই কাইচিয়া পরিবারভুক্ত হয়ে আছে সে। সিঙ্গাপুরে ও পেনাঙে তামিলীদের (মাদ্রাজের তামিল অঞ্চলের অধিবাসী) সংখ্যা বিস্তর। তাদের মধ্যে অনেকে মাতৃভূমির কোন সংবাদই রাখে না। মুনিয়া তেমনি সিঙ্গাপুরের একজন প্রবাসী তামিলী।

পাহাড়ী পথে সন্ধ্যার অপূর্ব পরিবেশে বেড়াতে বেড়াতে একথা সে-কথায় মিসেস্ কাইচিয়ার মন যখন অনেকটা সরে গেছে তাই-চুর বেদনাময় স্মৃতি থেকে, সেই সময় হঠাৎ কাইচিয়া সাহেবের

ঠিক মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন মিঃ সু-চেন। কর্মজীবনের শুরুতে এই সু-চেনেরই সহকারী ছিলেন কাইচিয়া। আজ তিনি রিটায়ার্ড, অবসর জীবন যাপন করছেন পেনাঙে। কাইচিয়া দম্পতীকে অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে মন খুশিতে যেন ভরে ওঠে তাঁর। তাঁদের নিয়ে যান তিনি নিজের বাড়িতে। চলে প্রচুর আদর আপ্যায়ন যত্ন জিজ্ঞাসা। তাঁরা কবে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন, এসব প্রশ্নের উত্তরে যেই জানতে পারলেন যে, 'বুড়ো সাহেবের ছাড়া বাংলোতে' এসে আশ্রয় নিয়েছেন ওরা, অমনি একেবারে শিউরে উঠলেন মিঃ সু চেন : "সর্বনাশ!"

"কেন, কী ব্যাপার বলুন তো।"

"না, ও বাংলোয় তোমাদের কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। যে ক'দিন থাকার আমার এখানেই থাকবে তোমরা।"

"সে কি, বুড়ো সাহেবকে যে আজই এক মাসের ভাড়া দিয়ে এসেছি।"

"তা' যাক ও এক মাসের ভাড়ার টাকা। প্রাণের চেয়ে তো আর টাকার মায়া বেশি হতে পারে না। ঐ ভূতুড়ে বাংলোয় এই সেদিনও একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেল। উরে বাপ্‌!"

"ভূতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে আসব, সে আমি পারব না। লোকেই বা কী বলবে? দেখাই যাক না ভূত কেমন!"

"এ সাহসের কোন মানে নেই মিঃ কাইচিয়া! কোন বাহাদুরীই খাটবে না এখানে বলে দিচ্ছি। বুড়ো সাহেব নিজেই ছিলেন ও বাংলোতে এতকাল ধরে। কিন্তু তাঁকেও ও বাংলো ছেড়ে এসে নতুন বাড়ি করে নিতে হয়েছে তিন বছর আগে। নেহাৎ বাধ্য না হলে টাকা খরচ করে নতুন বাড়ি করার পাত্র যে নন বুড়ো সাহেব, সে কথা পেনাঙ শহরে কে না জানে? বেচারা টাকার শোকে আধপাগলা হয়ে আছেন। কিন্তু আর উপায়ই বা ছিল কি? চার বছর আগে বুড়ো সাহেবের স্ত্রী কি এক অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছেন রিভলবারের গুলীতে। তারপর থেকে প্রায় প্রতি রাত্রেই একটা না একটা ঘটনা ঘটত বুড়ো সাহেবের বাংলোতে, আর তার হৈ-চৈতে পাড়ার লোকেরা অস্থির হয়ে উঠত। শেষে নতুন বাংলোতে উঠে এসে বুড়ো সাহেব নিজেও বেঁচেছেন, পাড়ার লোকেরাও রক্ষা পেয়েছে।"

ভয়ে মিসেস্ কাইচিয়ার গলা শুকিয়ে আসে যেন এই কাহিনী শুনে। কি বলতে যেয়ে যেন তিনি থেমে গেলেন শুরুতেই। মুখ দিয়ে কোন কথাই ফুটল না। তবে হাবভাবে বুঝা গেল, ও বাড়িতে তিনি যেতে পারবেন না।

মিঃ কাইচিয়া কিন্তু নাছোড়বান্দা একেবারে। "আচ্ছা, তা'হলে এখানেই থেকে যাও তুমি।... অল্ রাইট মিঃ সু-চেন, গুড্ ইভ্‌নিং!"—এই বলে পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে একবার সবাইকে দেখিয়ে হন্‌-হন্ করে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। তারপর সটান সেই 'বুড়ো সাহেবের ছাড়া বাংলোয়' যেয়ে উঠলেন তিনি।

"মুনিয়া!" বারান্দা থেকে চাকরকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আলোগুলো হঠাৎ নিভে গেল একসঙ্গে, আর মুনিয়াও ভীষণ এক চীৎকার করে বেরিয়ে এল এক লাফে হল-ঘরের ভিতর থেকে।

মিঃ কাইচিয়া ডানহাতে পিস্তল উঁচিয়ে আর বাঁ হাতে টর্চের আলো জ্বালিয়ে সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখে এলেন একবার মুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। মুনিয়া ভয়ে থর্থর্ করে কাঁপছে। প্রভুর লক্ষ্য পড়ে সে দিকে : "খুব ভয় লাগছে তোর, না রে?"

"হ্যাঁ, সাব! আপনারা চলে যাবার পর এঘর ওঘর থেকে কার যেন পায়ের শব্দ ক্রমাগত ভেসে আসছিল আমার কানে। আমি জড়সড় হয়েছিলাম একেবারে, কী যে করব কিছুই ঠিক পাচ্ছিলাম না। এমনি সময় আপনি এলেন। আর আপনার ডাক শুনে আমি যেই বেরুতে যাব ঘর থেকে, অমনি সব আলো গেল নিভে। কী অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো!"

"বুঝেছি, খুব ভয় পেয়ে গেছিস্ তুই। যা তোর মা'র কাছে চলে যা। এই সামনের বাড়ির পরের বাড়িতেই আছেন তিনি।"

সাহেবের কথায় যেন প্রাণে জল এল মুনিয়ার। সে চলে গেল সু-চেন সাহেবের বাংলোয়। "বাঁচা গেল, উরে বাপ্!"—এই বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে।

মিঃ কাইচিয়ার জন্যে উদ্বেগের অন্ত নেই মিসেস্ কাইচিয়ার, মিঃ সু-চেনেরও। মুনিয়া সে বাংলোয় ছিল বলে তবু খানিকটা ভরসা ছিল। কিন্তু সেও চলে আসায় অস্থির হয়ে পড়লেন মিসেস্ কাইচিয়া। কী উপায় এখন? এই রাত্রি করে ও বাংলোয় যায় এমন সাহস কারুর নেই এ পাড়ায়। এক বুড়ো সাহেবের বাড়িতে যেয়ে একটা খবর নেওয়া চলে। বুড়ো সাহেবের সঙ্গে কারুর তেমন বাক্যালাপ নেই আশপাশের লোকদের। তবু মিসেস্ কাইচিয়াকে খানিক আশ্বস্ত করার জন্যে মিঃ সু-চেন রওনা হলেন মুনিয়াকে নিয়ে বুড়ো সাহেবের নয়া বাংলোর দিকে। মিসেস্ কাইচিয়াও পিছু নিলেন ওদের, সু-চেন সাহেবের কোন বাধাই মানলেন না।

বুড়ো সাহেব তো অবাক—রাত্রিবেলা তাঁর বাংলোয় এতগুলো লোকজনের আবির্ভাবে। সব কথা শুনে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ভয় নেই কিছু—যদি ঘুমিয়ে না পড়ে থাকেন, তা'হলে ডাকলে উত্তরও পাবেন হয়ত।"

এ কথায় মুনিয়া সজোরে ডাকল তার প্রভুকে, তাঁকে জিজ্ঞেস করল তিনি ঘুমুচ্ছেন কিনা।

উত্তর এল, তিনি শুয়ে পড়েছেন—এখুনি ঘুমুবেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনি মিসেস্ কাইচিয়া এবং মুনিয়াকেও যেয়ে শুয়ে পড়তে বললেন।

মিঃ কাইচিয়ার কণ্ঠস্বরে একটা পরিবর্তন যেন অনুভব করলেন শ্রীমতী কাইচিয়া। তবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরলেন সু-চেন সাহেবের বাংলোয়।

মুনিয়া চলে যাবার পর আরো কয়টি ঘটনায় মিঃ কাইচিয়ার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, 'জাকুন'দের ইন্দ্রজাল ছাড়া এ আর কিছুই নয়। নানা রকম ভৌতিক উপদ্রব সৃষ্টি করে মানুষকে

ভড়কিয়ে দেওয়াই এসব ডাকুনের কাজ। তাঁর সন্দেহ হ'ল, রান্নাঘর থেকেই এসব গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই প্রথমেই তিনি গেলেন রান্নাঘর তল্লাসে টর্চের আলোটা জ্বালিয়ে। কই, কোথাও তো কিছু নেই!

পাশের টুলটা টেনে নিয়ে মিঃ কাইচিয়া লেগে গেলেন বাল্‌বটা ঠিক আছে কিনা দেখতে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল কে যেন পেছন থেকে তাঁর গলাটা সজোরে চেপে ধরেছে। টুল থেকে লাফিয়ে পড়ে খুব জোরে একটা ঝাপ্টা দিতেই ধপাস করে একটা শব্দ হ'ল এবং বাল্‌বটাও ছিটকে পড়ে গিয়ে খান্ খান্ হয়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখা গেল বিকলাঙ্গ মূর্তির মত কী যেন একটা হল-ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে!

"গুড়ুম!"—সেই চলন্ত মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লেন মিঃ কাইচিয়া কালবিলম্ব না করে। টোটা-ভর্তিই ছিল পিস্তলটা। চিঁ চিঁ করতে করতে মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের নিমেষে।

সহসা অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করলেন কাইচিয়া সাহেব। সমস্ত শরীর যেন তাঁর অবশ হয়ে আসছে। তিনি অতি কষ্টে তাঁর পা দুটোকে একটু চালিয়ে নিয়ে পাশের ঘরের ক্যাম্প-বেডের ওপর শুয়ে পড়লেন। তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি মুহূর্তের মধ্যে। ঘুমের মধ্যে একবার যেন তাঁর মনে হ'ল, কারা সব তাঁর ঘরের কোণে ফিস্‌ফাস্ করছে। তিনি যেন আরো টের পেলেন, তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে কয়েকজন মিলে—তারপর তাঁর ক্যাম্প-বেডটাকে গড়-গড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় কে জানে! ঘরময় ক্লোরোফরমের গন্ধ। প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর শিথিলতায় অবশ। উঠে যে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করবেন এমন সাধ্য তাঁর নেই। তবু তাঁর কানে গেল রাত দুটো বাজার ঢং ঢং শব্দ। কিন্তু তারপরে আর নয়—তারপরে একেবারেই অচৈতন্য।

ভোর হতেই মিসেস্ কাইচিয়া মিঃ সু-চেন ও মুনিয়াকে নিয়ে 'বুড়ো সাহেবের ছাড়া বাংলোয়'

এসে উপস্থিত মিঃ কাইচিয়ার খোঁজে। দুশ্চিন্তায় সারারাত না ঘুমিয়ে ছটফট করেই কাটিয়েছেন মিসেস্ কাইচিয়া। সু-চেন এবং মুনিয়ার চোখেও ঘুম ছিল না আদৌ। 'ছাড়া বাংলো'র বারান্দায় রক্তের দাগ চোখে পড়ে সু-চেন সাহেবের। রক্তের দাগের ওপর কয়টা পায়ের ছাপও রয়েছে বলে মনে হ'ল তাঁর। তিনি হলের ডান-বাঁয়ের ঘরগুলোতে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যখন কোথাও দেখতে পেলেন না মিঃ কাইচিয়াকে, তখন আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে গেলেন থানায় খবর দিতে।

এদিকে মুনিয়াকে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগুতেই মিসেস্ কাইচিয়া শুনতে পেলেন শাওয়ার থেকে অবিশ্রান্ত জল পড়ার শব্দ। বাথরুমের দরজা খুলতেই কল্পনাতীত দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁদের। শাওয়ার ট্যাপের তলায় পড়ে রয়েছে ক্যাম্প-বেডখানা এবং তারই ওপর উপুড় হয়ে আছে মিঃ কাইচিয়ার সংজ্ঞাহীন অর্ধনগ্ন দেহ আর সে অসাড় দেহের ওপর পড়ছে অবিশ্রাম জলধারা। মিঃ কাইচিয়ার ঘড়ি, কলম, টর্চ, পিস্তল কিছুই নেই তাঁর সঙ্গে। সুটকেশ, বাক্স, বেডিংও উধাও।

মুনিয়া টেনে নিয়ে আসে ক্যাম্পখাটখানা বাথরুম থেকে শাওয়ার ট্যাপ বন্ধ করে দিয়ে। ইতিমধ্যে মিঃ সু-চেন একদল পুলিস নিয়ে এসে হাজির। পুলিসের দলে একজন ইয়োরোপীয় অফিসার এবং কয়জন মালয়ী কনেস্টবল। অফিসার বাংলোর বারান্দায় রক্তের দাগ ও পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। একটা কনেস্টবলের ব্যাগ থেকে একখানি ফটো, কতগুলো কাগজপত্র, এক জোড়া স্যাণ্ডেল বার করেও কি সব মিলিয়ে দেখলেন তিনি। কেমন একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। মনে হ'ল, কী একটা মস্ত বড় ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন অনেক চেষ্টার পর। কাজ শেষ করে চলে যাবার সময় তাঁকে বলতে শোনা গেল :

"It is definitely Jangu, the scoundrel and his gang in collaboration with..."

সিঙ্গাপুরের সেরা দস্যু জঙ্গুর নাম শুনে শিউরে ওঠে সবাই। গত দশ বছর ধরে সন্ধান করে সিঙ্গাপুরের পুলিস আর গোয়েন্দারা কোন হদিসই করতে পারে নি এই জঙ্গু ডাকাতের।

বুড়ো সাহেবের 'ছাড়া বাংলোয়' তিন-চার বছর ধরে যে হামলা চলেছে এ তবে জঙ্গুর দল-বলেরই কারবার!—দেখতে দেখতে এ রব ছড়িয়ে পড়ে পেনাঙের পথে পথে।

জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর একটু সুস্থ হয়ে চোখ খুলেই মিঃ কাইচিয়া দেখতে পেলেন যে, সংবাদপত্র-প্রতিনিধিরা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর অভিনব অভিজ্ঞতার বর্ণনা নেবার জন্যে। পরদিনের বিভিন্ন কাগজে সে বিবরণ পড়ে পাঠকমহল যথার্থই চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু তার চেয়েও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হ'ল সকালবেলা বুড়ো সাহেব জুলিয়ান হ্যারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,—এ সংবাদ রটনার সঙ্গে সঙ্গে। বুড়ো সাহেবের সম্মান ও প্রতিপত্তির বিষয় বিবেচনায় পেনাঙের পুলিস সাহেব নাকি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁকে গ্রেপ্তারের সময়।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কের কথা আশা করি তোমরা সবাই শুনেছো। প্রায় আট মাইল ব্যাপী বনজঙ্গল, পাহাড় ও নদী বেষ্টিত জায়গাকে ঘিরে এই পার্ক তৈরী করা হয়েছে, এবং এখানে হাতী, গণ্ডার, উট, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, সিংহ, জাগোয়ার, পুমা প্রভৃতি আফ্রিকার বন্য জন্তুদের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে ও স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে, আফ্রিকার যে সব বন্য জন্তু ক্ষয় হয়ে আসছিল, যেমন সিংহ, শিম্পাঞ্জী জাতের বানর, জিরাফ,—তারা আবার বেশ বেড়ে উঠছে। তা'ছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট গণ্ডীর ভেতর অনেক রকমের প্রাণী একত্র বসবাস করায়, সমধর্ম্মী প্রাণীদের মধ্যে মিশ্রণ হতে হতে নূতন ধরনের প্রাণীও জন্ম লাভ করছে কিছু কিছু। নানা জাতীয় হরিণ ও বানরের মধ্যেই মিশ্রণটা হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। জাগোয়ার জাতীয় বাঘ এবং সিংহের মধ্যে মিশ্রণ হয়ে জন্মেছে 'লাইগার', যার গা বাঘের মতো, অথচ কেশর আছে সিংহের মতো।

এই ক্রুগার পার্ক সমস্তটা তন্ন-তন্ন করে দেখতে লাগে প্রায় এক সপ্তাহ এবং তা দেখার উপায় হ'ল, মোটরকার ভাড়া করে পার্কের বাঁধানো পথগুলো দিয়ে ঘোরা। হয়ত কোথাও দেখা যাবে, দল বেঁধে হরিণেরা জল খাচ্ছে, কোথাও সিংহী তার ছেলেপুলে নিয়ে ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম

করছে—কোথাও হাতী মড়মড় করে গাছের ডাল ভাঙছে, কোথাও বা বাঘের তাড়া খেয়ে জেব্রার দল দড়বড় করে দৌড়াচ্ছে! চলন্ত মোটরকার দেখলে, এরা সরে দাঁড়ায়—হয়ত ভয় পায়, কিংবা অবাক হয়, কিন্তু তেড়ে আসে না। বিপদ হয় গাড়ী থেকে বেরুলেই—তখনি গাঁক করে লাফিয়ে আসে তারা। এই পার্কের ভেতর আছে অনেক হোটেল, বিশ্রামাগার, দোকানপশার, হাসপাতাল, আর আছে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণাগার—সেখানে গাছপালা এবং জীবজন্তু বিষয়ে সমস্ত রকম জিজ্ঞাসারই উত্তর পাওয়া যায়।

এত বড় এবং এতখানি স্বাভাবিকতা সম্পন্ন না হলেও, ইংলণ্ডের হুইপস্নেড চিড়িয়াখানাও অনেকটা এই আদর্শেই গঠিত। প্রাণীরা যাতে স্বাভাবিক ভাবে নদীনালা, বনজঙ্গল, পাহাড়-প্রান্তরে বসবাস ও চলাফেরা করতে পারে, অথচ দর্শকেরা দূর থেকে নিরাপদে তাদের দেখতে পারে, এমন ভাবেই হুইপস্নেডের ব্যবস্থাপনা হয়েছে এবং প্রাণীদের বংশধারা রক্ষা ও নূতন নূতন প্রাণী সৃষ্টির দিক থেকে তার কৃতিত্বও কম নয়। একই জায়গায় বরফ মুল্লুকের প্রাণী, যেমন সিল ও পেঙ্গুইন, আর মরুভূমির প্রাণী, যেমন উটপাখী, ন্যু ও বেবুনদের স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা কাজ হিসাবে যে খুব সহজ নয়, এ ত বুঝতেই পারছো।

ঠিক এই রকম ন্যাশনাল পার্ক বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল আমাদের দেশে একটাও নেই, এ বড়ই দুঃখের কথা। আমাদের বড় বড় সহরগুলিতে অবশ্য চিড়িয়াখানা আছে, কিন্তু তাতে প্রাণীদের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে রাখার কোনই ব্যবস্থা নেই, আর সব রকমের প্রাণী সংগ্রহ বা সংরক্ষণের কথাও ভাবা হয় না তাতে। ফলে অর্দ্ধাহারে, অযত্নে, উপযুক্ত আলো-বাতাস ও স্বচ্ছন্দ চলাফেরার অভাবে সব প্রাণীই জীর্ণ-শীর্ণ, আধমরা হয়ে থাকে—তাদের সত্যকার স্বাভাবিক রূপটা দেখা যায় না কোন দিনই, আর বেশীর ভাগ প্রাণীরই ছানাপোনাও হয় না এই বন্দী অবস্থায় থাকার ফলে।

অথচ ভারতবর্ষের প্রাণী-সম্পদ কম নয়। এক আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া এত বিচিত্র রকমের জীবজন্তু, সরীসৃপ এবং পাখী আর কোথায় আছে? আমাদের আসাম ও তেরাই অঞ্চলে আছে বিরাটকায় একশিঙা গণ্ডার, আসাম উড়িষ্যা মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে আছে বৃহদাকার হাতী, বাংলার সুন্দরবন ও বাদা অঞ্চলে আছে বিখ্যাত রয়াল টাইগার, মেঘনা ইছামতী প্রভৃতি নদীতে আছে ঘড়িয়াল জাতের অতিকায় কুমীর। এ ছাড়া উড়িষ্যার কালাহাণ্ডিতে এবং বিন্ধ্যাচল এলাকায় আছে সম্বর, নীলগাই, তে-শিঙা, চিতল…নানা জাতের হরিণ।

আর সারা ভারতবর্ষেই বনগোরু, বনমহিষ, গাধা, বানর, পাখী, সাপ, কচ্ছপ ও মাছ যে কত রকম আছে, তার ত তালিকা দিয়েই শেষ করা যায় না। অথচ উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই বহু বিচিত্র প্রাণীর বংশ যে ক্রমেই ক্ষয় হয়ে আসছে, তা আমরা ভেবেও দেখি না। ভারতবর্ষে আজ সিংহ প্রায় নেই বললেই চলে—রাজপুতানা ও গুজরাটের কোন কোন এলাকায় মাত্র অল্প সংখ্যক সিংহ আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন অঞ্চলে এক সময় ছিল গুঁড়ী হাতী এবং ক্ষুদে গণ্ডার—

যা আজ আর পাওয়া যায় না। হিমালয় বেয়ার বা পাহাড়ে ভালুক, রয়াল টাইগার বা রাজবাঘা, টল এলিগেটার বা দীঘল কুমীর···এদের সংখ্যাও ক্রমশই কমে আসছে।

সভ্যতার প্রয়োজনে মানুষ যতই বনজঙ্গল কেটে নগর বসাচ্ছে, যতই যানবাহন বাড়ছে, পাহাড়-পর্ব্বত ও নদীনালায় যতই মানুষের আনাগোনা এবং আধিপত্য বাড়ছে, ততই পুরাণো দিনের মতো আরণ্যক প্রাণীদের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার সুবিধা সারা দুনিয়াতেই কমে আসছে। এ ছাড়া আছে বন্দুকধারী শিকারীদের উৎপাত—তাঁরা আমোদ করার নামে মারতে মারতেও শেষ করে দিয়েছেন বহু সুন্দর সুন্দর প্রাণীকে। চাঁদ-কপালে উড়ন্ত হাঁস, শিস-দেওয়া টিয়া, মাণিকজোড় প্রভৃতি ভারতীয় পাখী এবং রকমারি হরিণকে নির্ব্বংশ করে ফেলছেন অনেকটা তাঁরাই। এ অবস্থায় ক্রুগার পার্ক বা হুইপস্‌নেডের আদর্শে ভারতবর্ষে যদি একটা বৃহদায়তন জাতীয় পার্ক তৈরি করা হয়, এবং ক্ষয়িষ্ণু প্রাণীদের মারা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবেই ভারতের এই আশ্চর্য্য প্রাণী-সম্পদ রক্ষা পাবে, নইলে এমন দিন আসবে, যখন অনেক প্রাণীর আর নামগন্ধও থাকবে না। জাতীয় ঐশ্বর্য্যের দিক থেকে সেটা কত বড় ক্ষতিকর হবে, প্রাণী-সম্পদে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য সারা জগতে স্বীকৃত, তা কি ভাবে নষ্ট হবে, ভাবো তো!

নিরুদ্দেশ

—শ্রীঅরবিন্দ গুহ

দু'হাত বাড়ায়ে আকাশের চাঁদ এনে
ছড়াই আমার ধুলো-ভরা ছোটো ঘরে :
এখন পক্ষীরাজের লাগাম টেনে
রাজার কুমার ছুটেছে তেপান্তরে ?

আমার হাতের ছোটো অঙ্গুলি ভ'রে
সমুদ্র হতে নীল ঢেউ তুলে আনি ;
রাজার কুমার ময়ূরপঙ্খী চ'ড়ে
ভেসেছে এখন—আমি সব কথা জানি।

বিকেলবেলায় বসি জানালার ধারে
কান পেতে শুনি যে-কথা শোনায় হাওয়া ;
ঘুম ছেড়ে পথে নিশুতি অন্ধকারে
কী যে ভালো, আহা সব ছেড়ে চ'লে যাওয়া।

যেতে তো পারি না, তাই শুয়ে শুয়ে একা
নিরুদ্দেশের উধাও স্বপ্ন-দেখা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মিণ্টুর দাদা ছবি আঁকে। কী সুন্দর! পদ্ম, হাঁস, মানুষ, রাজা-রাণী আরও কত কি!

মিণ্টু ও একদিন দাদার ছবি আঁকবার সাদা কাগজ কলম আর কালি নিয়ে ছবি আঁকলো।

ছবির বিষয় হলো, 'মা তার ছোট্ট বোন মিনুকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্চে আর সামনে চুপ করে বসে আছে পুষি। ছবিখানি কী সুন্দর হলো। মিণ্ট ছুটে গেল মাকে দেখাতে। মা তখন ও বাড়ির বুড়ী মাসীর সঙ্গে বারান্দায় বসে গল্প করছেন আর চুল শুকোচ্ছেন।

মা ছবি দেখেই বললেন, "এ কাগজ তুই কোথায় পেলি, অ্যাঁ? রঞ্জনের বুঝি?"

মিণ্ট বললে, "ছবিখানা সুন্দর হয়নি মা?"

"রঞ্জনের দরকারী কাগজ-পত্র নষ্ট করচো?"

"নষ্ট করলাম বুঝি? ছবি এঁকেচি তো! সুন্দর হয় নি?"

"ছাই হয়েচে। ভূত আঁকা হয়েচে। সে এসে তোমায় কি করে দেখো। শিগ্গির রেখে এস তার কলম। আর কখখন হাত দিয়েচো কি মজা দেখবে।"

বুড়ী মাসী বললেন, "আহা! কেন বকচো বাছা! ও কি বোঝে? দেখ তো মুখখানা কেমন হয়ে গেল!"

মিণ্টু কাঁদ-কাঁদ মুখ করে ফিরে এলো। এত সুন্দর ছবিখানা! মা বললেন, ভূত আঁকা হয়েচে! ভূত কি এই রকম দেখতে? সে দাদার চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ছবিখানা রেখে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো, রাতের বেলা চিলে কোঠায় এই রকম ভূত ঘুরে বেড়ায়? ও দিক্কার বেলগাছে যে ভূতটা থাকে সে কি এই রকম? সে ভূত এঁকেচে?

পাশের ঘরে দিদি পরীক্ষার পড়া তৈরি করচিল।

মিন্টু সেখানে গিয়ে দিদির পাশে দাঁড়িয়ে তার সামনে বইয়ের ওপর ছবিখানি রাখতেই দিদি খিঁচিয়ে উঠলো, "কি হচ্চে? নিজেও পড়বে না, অন্যকেও পড়তে দেবে না।"

"লক্ষ্মীটি দিদি! দেখ না ভাই—"

"কি দেখবো?"

"ছবিখানা কেমন হয়েচে?"

"বাঁদর হয়েচে! যা, ভাগ্‌—" বলে ছবিখানা ছুঁড়ে মেঝেয় ফেলে আবার একমনে পড়তে লাগলো—'দূষিত জল পান করিলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা বা কৃমি প্রভৃতি রোগ হয়।'

মিন্টু কাঁদ-কাঁদ মুখে ছবিখানা কুড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। মা বললেন, ভূত! দিদি বললে, বাঁদর! বাঁদর যে হয় নি তা সে জানে। কারণ, সামনের পানওয়ালার যে বাঁদরটা আছে, রাস্তায় যে বাঁদর খেলা দেখায় সে এ রকম দেখতে নয়। চিড়িয়াখানার বাঁদরের চেহারার সঙ্গেও এর মিল নেই।

কিন্তু এ তো মা, তার ছোট বোন মিনু, আর পুষি। কেউই তার মনের কথা বলতে পারচে না।

সেদিন রবিবার। বাবা বৈঠকখানায়। সে ছুটলো সেখানে। কেউ যা বলতে পারে না, বাবা ঠিক তার উত্তর দেন। তার সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন; তবে দু-একটার উত্তর দিতে পারেন না। যেমন, 'বাঘ কুমড়ো খায় কিনা।'—সেদিন এ কথার ঠিক উত্তর দিতে পারেন নি।

সে গিয়ে দেখলো, বাবা একমনে একখানি মোটা বই পড়চেন।

সে পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলো, "বাবা!"

বাবা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "অ্যাঁ!"

মিন্টু বইয়ের ওপর ছবিখানা রেখে বললে, "বাবা, দেখ তো ছবিখানা কেমন হয়েচে?"

"ছবি? কে এঁকেচে?"

"আমি।"

বাবার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি দেখা দিল; জিগ্যেস করলেন, "কি এঁকেচো?"

"এই মা, এই মিনু আর ঐ পুষি। মা মিনুকে দুধ খাওয়াচ্চে আর পুষি বসে বসে দেখচে—"

বাবা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

"কেমন হয়েচে?"

"কেমন হয়েচে? কিন্তু দুধের বাটি কৈ?"

"ওঃ! ভুলে গেচি।" বলেই বাবার লাল-নীল পেনসিলটা তুলে নিয়ে নীল দিয়ে একটি গোল এঁকে বললে, "এই যে—"

বাবা আবার হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "মাকে দেখাও গে—"

"মাকে দেখিয়েছিলুম, মা বললে, 'ভূত হয়েচে,' দিদি বললে, 'বাঁদর হয়েচে'। ভাল হয় নি বাবা ?"

"তুমি দাদার কাছে ছবি আঁকা শিখ—"

"বল না, ভাল হয়েচে কি না ?"

"দাদাকে দেখিও—এখন যাও।" বলে বাবা তার গাল টিপে আস্তে পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন।

অমনি দাদার ঘর থেকে হাঁক এল, "মিণ্টু—এই মিণ্টু—আবার জিনিসে হাত দিয়েচিস্ ?"

মিণ্টু আবার বৈঠকখানায় ঢুকে বাবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

স্যানডাল চট্ চট্ করতে করতে বৈঠকখানায় ঢুকে দাদা বললে, "আমার চাইনিজ্ ইঙকের শিশিটা ভেঙেচিস, কলমটা ভোঁতা করেচিস, কাগজ ছিঁড়ে নিয়েচিস—তোকে না বারণ করেচি আমার জিনিসে হাত দিতে ? কেন এ সব করেচিস্ ?"

মিণ্টু ফ্যাল-ফ্যাল করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "তোমার মতো ছবি আঁকছিলুম।"

দাদা হঠাৎ মুখে রুমাল পুরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মিণ্টু হতভম্বের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার ধারণা হলো, ছবিখানি খারাপ হয়েচে। সে আর দাদার ছবি আঁকবার কিছুতে হাত দেবে না।

পরদিন থেকে দেওয়ালে, নিজের পড়ার বইয়ে, খাতায়, বাবার দামী বইয়ের সাদা পুস্তানিতে মিণ্টুর নানা বিষয়ের ছবি দেখা যেতে লাগলো। এজন্য কেউ তার প্রশংসা করলে না, বরং কানমলা, চাঁটি ও বকুনি দিতে লাগলো।

শেষে তার বাবা দাদাকে ডেকে বললেন, "ওতে হবে না। ওকে আঁকতে শেখা—"

দাদা নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে অগত্যা তাতেই রাজী হলো। মিণ্টুরও ছবি ক্রমে বহির্জগৎ থেকে খাতায় গিয়ে ঢাকা পড়লো এবং এখনও সেখানে সত্যিকারের ছবির রূপ নিচ্চে।

মা তাই দেখেই একদিন বললেন, "বাঃ ! মিণ্টু কী সুন্দর ছবি এঁকেচে !"

মিণ্টু একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নিচু করলো।

শামসুদ্দীন

খলিফা ওমর ইবনে আব্বাস সহচর লয়ে সাথে
নগর-ভ্রমণে হলেন বাহির সেদিন নিশীথ রাতে।
চারিদিক তবে স্তব্ধ নিথর, কোন দিকে কেহ নাই,
সহসা কাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেন দূর ঠাঁই।
দ্রুত পদে আসি দেখিলেন এক পর্ণকুটীর-মাঝে,
বৃদ্ধা জনৈক করিছেন পাক, ছেলেরা কাঁদিছে কাছে।
বৃদ্ধা বলিছে : একটু সবুর, এখনি হইবে পাক,
এখনি খেতে যে দিব সকলেরে, একটুকু চুপ থাক।

বহুক্ষণ হ'ল দেখেন খলিফা ছেলেরে ভুলাতে হায়,
চুলার ডেকেতে জ্বাল দেয় মাতা কাঁদে আর ফিরে চায়।
ছেলেরা সকলে কেঁদে হয় খুন, মায়েরে ঘিরিয়া সবে,
ক্রন্দন করে চীৎকার করি। খলিফা বলেন তবে :
এ কী বাছা তব ব্যবহার শুনি, শিশু কাঁদে অকারণে,
তুমি বসে বসে জ্বাল দাও শুধু, খেতে দিবে কোন্ ক্ষণে ?

কাতর নয়নে চাহিলা বৃদ্ধা, অশ্রু সায়রে নাহি,
কহিল : বাবা, কী খেতে দিব বল, ঘরেতে কিছু যে নাহি।
পানি ও পাথর জ্বাল দিই শুধু পাক করিবার ছলে,
রোহই একটু পেতে পারি তাই, ছেলেরা ঘুমিয়ে প'লে।
খলিফা শুনিয়া উঠেন শিহরি, কহিলেন : মা আমার,
একটু সবুর, দেখিও বাছারা পড়ে না ঘুমিয়ে আর,
এখনি ফিরিব।...এই বলি তিনি দ্রুত অস্থির পদে,
কাঁদিতে কাঁদিতে হলেন বাহির, ছুটিলেন রাজপথে।

বায়তুলমাল হইতে খলিফা ময়দা লাকড়ী আদি
আপনার পিঠে লইলেন তুলি, বাঁকা হ'ল পিঠ-ছাতি!
ললাট বহিয়া ঘর্ম্ম বহিল ঝরিল অশ্রুধার,
ছুটিলেন তিনি দৃকপাত নাই, কোন্ দিকে আঁধিয়ার।
ইবনে আব্বাস আসিলেন কাছে, করিলেন আবেদন :
পেরেশান বড় হয়েছেন প্রভু, দিন্ ভার কিছুক্ষণ।
খলিফা তখন বলিলেন : ভাই, আমি বড় গুনাহ্‌গার,
রোজ হাশরের বিচার দিনে কি নিবে এ পাপের ভার ?
আমার ত্রুটির কারণে সকলে অনাহারে কেঁদে মরে,
এ ভার বয়ে তাই সে ভার পাপের কিছু নি' লাঘব করে।

অনতি পরে আসিলেন ফিরি বৃদ্ধার আঙ্গিনাতে,
একেলা বসিয়া করিলেন পাক সকলি নিজের হাতে।
যত্ন করিয়া খাওয়ালেন তিনি সকল শিশুরে ধরি,
বৃদ্ধার দেখি খুশির অশ্রু পড়িল নয়ন ঝরি।
বলিল বৃদ্ধা : তুমি যদি বাছা, খলিফা হইতে তবে,
ওমর না হয়ে, তা হলে কেমন খুশিতে থাকিত সবে।
আপনার জন কেহ নাই মোর, সকলি গিয়েছে মরি,
খলিফার কাছে বেদনা মোদের জানাব কেমন করি!
হায়রে বৃদ্ধা নারী!
জানিলে না তুমি খলিফা স্বয়ং করে তব তাবেদারী।

যাদুকরী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

লোকে বলে, রাজবাড়ী যেন রূপের পুরী। যে রাজ্যটির কথা বলছি—রূপ যেন সে রাজ্যে ছড়াছড়ি। রাজা যেমন রূপবান, তেমনি তিনি বিলাসী ; আর রূপের তিনি এমনি ভক্ত যে, রূপটি আগে দেখে তবে গুণের বিচার করেন। সেই যে একটা কথা আছে না—'আগাড়ি দর্শনধারী, পিছাড়ি গুণ বিচারি!' এই রাজাটির বিধি-ব্যবস্থাও তাই। রাজা বলেন—চোখেই যে ধরল না, মনে কি করে ধরবে ?

ইনিই হোচ্ছেন পুরাকালের সেই নামজাদা ভোজরাজা। ফুল না হোলে যেমন পূজো হয় না, তেমনি ভোজরাজা ছাড়া রূপকথার গল্প হয় না। এত বড় রূপবিলাসী সৌখীন রাজা আর কেউ কখনো দেখেনি। যেমন রাজার রূপশ্রী, তেমনি রাজপ্রাসাদ, তেমনি তাঁর রাজসভা, সভাসদ, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল ; রাজ-অন্তঃপুর, রাণী, রাজকন্যা, সখী, সহচরী, দাসী, বাঁদী সব। প্রত্যেকেই রূপে যেন ফেটে পড়ছেন! এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায়! কিন্তু যেখানে রূপের এত আদর, রূপ ছাড়া কথা নেই—সেই রূপের রাজ্যে রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে রূপবতী রাজকন্যা ভানুমতীর প্রধান সহচরী সুন্দরীকে দেখলে কিন্তু বিস্ময়ে চমকে উঠতে হয়।

তোমরা হয়তো ভাবছ—রাজকন্যার সহচরীর নামও যখন সুন্দরী, তার বুঝি সৌন্দর্য্যের আর শেষ নেই, রাজবাড়ীর সবাইকে রূপের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে সে বুঝি সবার উপরে উঠে গেছে! কিন্তু আসলে তা নয়, বরং একেবারে উল্টো। ঐ যে কালোবরণ কন্যাটি—পিঠজোড়া কুঁজের বোঝা, লাঠির উপরে দেহভার চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গল্পের গোড়াতেই—উনিই রূপসী রাজকন্যা ভানুমতীর আদরের সহচরী সুন্দরী! এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে, যে রাজ্যে রূপের এমন ছড়াছড়ি, আসবাবপত্রের রূপও যেখানে ধরে না, সে রাজ্যের রাজকন্যার সহচরীর রূপের এমন শ্রী হোলো কি করে—আর, সুন্দরী নামটিই বা সে কি করে পেল? সেই কথাই বলছি।

পরম রূপবান ভোজরাজার কন্যাদুটিও রূপলাবণ্যে অনুপমা। বড় রাজকন্যার নাম ভানুমতী, ছোটটির নাম যশোমতী—দিদির চেয়ে বয়সে প্রায় তিন-চার বছরের ছোট। সেকালে রাজকন্যারা কিশোরী হোলেই তাদের জন্য রাজ-অন্তঃপুরে স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হোত। সখী-সহচরীদের সঙ্গে রাজকন্যারা সেই মহলেই থাকতেন। পড়াশোনা, গানবাজনা, গল্পগুজব, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি যাঁর যাতে অনুরাগ, তারই চর্চ্চা করতেন সেই মহলে। অস্ত্রধারিণী প্রতিহারিণীরা রাজকন্যাদের মহলে দিবারাত্রি অতি সন্তর্পণে পাহারা দিত। কোনো পুরুষ সেই সুরক্ষিত মহলের ত্রিসীমাতেও আসতে পারতেন না; অপরিচিতা মেয়েদের পক্ষেও বিনা মঞ্জুরীতে প্রবেশ করবার সাধ্য থাকত না।

শৈশব অতিক্রম করে কুমারী ভানুমতী কৈশোরে পড়তেই তাঁর জন্যও স্বতন্ত্র মহলের ব্যবস্থা হোয়েছে। একশো সহচরীর সঙ্গে রাজকন্যা তাঁর পুরীতে থাকেন। সখীরা নানাভাবে তাঁর মনোরঞ্জন করে। রূপে গুণে বিদ্যায় কেউ তাদের কমতি নয়; তবু রাজকন্যার মনে হোতে থাকে—কোথায় যেন একটু ফাঁক আছে; একশো সখীর মধ্যে এমন একটি সখীও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না—তাঁর মনটি যার মনের সঙ্গে ঠিক মিলেছে। তাই তিনি একদিন ভোজরাজাকে বললেন: বাবা, আমার একটি সখী চাই, কিন্তু আমি তার রূপ গুণ বিদ্যা পরীক্ষা করে তবে নেব।

রাজা বললেন: খুব ভালো কথা, আমি আজই এর ব্যবস্থা করছি।

সেই দিনই রাজধানীতে ঢেঁড়া দিয়ে ঘোষণা করা হোলো—রাজকন্যার জন্যে একটি সহচরী চাই; রূপে গুণে বিদ্যায় যে উপযুক্ত হবে, তাকেই রাজকন্যা পছন্দ করবেন।

রাজকন্যার সহচরী হওয়া বড় সামান্য ভাগ্যের কথা নয়! ঢেঁড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে সহচরী হবার আশায় অনেক মেয়েই আসতে লাগল—বাপ, জেঠা, কাকা বা দাদা কোন না কোন অভিভাবকের সঙ্গে। কিন্তু কোন মেয়েই রাজকন্যার পছন্দ হোলো না। তিনি যে রকমটি চান, এত মেয়ের মধ্যে তেমন মেয়ে একটিও পেলেন না। সাধারণ সখীও তিনি চাননি, তেমন তো অনেক রয়েছে; এমন একটি মেয়ে তিনি চান, এসেই যে তার কোন বিশেষ গুণ দেখিয়ে চমকে দেবে—রাজকন্যার মনকেও যে ভুলিয়ে দিতে পারবে! তবে না তিনি তাকে তাঁর প্রধানা সহচরী বলে মেনে নিয়ে নিজের মনের দরজাটিও তার কাছে খুলে দেবেন! কিন্তু তেমন মেয়ে তো একটিও এল না!

রাজাও সভাসদগণের সঙ্গে বিমনা হোয়ে পড়েছেন কন্যার মনের মতন মেয়ের সন্ধান করতে না পেরে। ক্রমে মেয়ে আসার ভিড় কমে গেল। শেষে শোনা গেল—আর কেউই আসে না। ভোজ-রাজা সভায় বসে এই কথাই ভাবছেন, এমন সময় প্রতিহারী এসে অভিবাদন করে বলল: মহারাজ! একটি কন্যা এসেছেন—দেখা করতে চান।

ভোজরাজা বললেন: কন্যা যার সঙ্গে এসেছে, তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে কন্যাকে অন্দর-মহলে রাজকন্যার কাছে পাঠাও।

প্রতিহারী জানাল: কন্যা যে একাই এসেছে মহারাজ, সঙ্গে কেউ নেই। তিনি আগে মহারাজের সঙ্গেই কথা বলতে চান।

রাজা একটু বিস্মিত হোলেন। কারণ, অভিভাবক ছাড়া কোন কন্যাই এ পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে আসেনি। এই একমাত্র কন্যা যে একাকিনী এসেছে। তিনি অগত্যা তখন কন্যাকে সভায় আনবার জন্য আদেশ করলেন প্রতিহারীকে। অভিবাদন করে প্রতিহারী চলে গেল।

একটু পরে রাজসভায় এক অপরূপ ভঙ্গিতে সেই অপরূপা কন্যা প্রবেশ করল। তাকে দেখে রাজসভায় উপস্থিত সকলের মনে হোলো—নিকষ কালো পাথরে তৈরী এক কুব্জা নারীমূর্ত্তি যেন যন্ত্রচালিত হোয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করছে। কিন্তু তার বর্ণ কালো আর পিঠের উপর প্রকাণ্ড একটা কুঁজের ভারে দেহ কুব্জ হোলেও, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আশ্চর্য্য রকমের নিটোল আর বলিষ্ঠ, মুখখানিও যেন পাথর কুঁদে তৈরী করে কণ্ঠার উপরে বসানো। আর, চোখ দুটো ঠিক যেন আকাশের শুক-তারার মতন দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে।

রাজা থেকে রক্ষী পর্য্যন্ত সকলের দৃষ্টি এই আশ্চর্য্য মেয়েটির দিকে নিবদ্ধ হোয়ে রইল কিছুক্ষণ। মেয়েটি ধীরে ধীরে রাজার সামনে এসে থামল; তারপর তার হাতের লাঠির উপরে কুব্জ দেহটির ভার দিয়ে যতটা সম্ভব সোজা হোয়ে মাথা নেড়ে হাত তুলে বলল: মহারাজের জয় হোক!

ভোজরাজাও হাতখানি তুলে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গি করে বললেন: তুমি কি বলতে চাও বলো।

কন্যা বলল: আমি রাজকন্যার সহচরী হবো বলেই রাজসভায় এসেছি।

কথাটা শুনেই রাজা গম্ভীর হোলেন, কিন্তু তাঁকে ঘিরে যে সব সভাসদ বসেছিলেন, তাঁরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন হো-হো করে। তাঁদের হাসি দেখে মুখখানা ভার করে কন্যা জিজ্ঞাসা করল: আপনারা হাসছেন যে বড়? কি জন্যে এত হাসি—শুনি?

সভাসদদের হাসি তখনো থামেনি, বরং কন্যার কথায় আরো বেড়ে গেল। একজন বললেন: হাসছি তোমাকে দেখে, আর তোমার আস্পর্দ্ধার কথা শুনে।

কন্যার কালো মুখখানা আরো যেন কালো হোয়ে গেল। তারপর একটু থেমে মনে মনে কি ভেবে কন্যা বলল: আমাকে দেখে হাসবারই বা কি আছে, আর আস্পর্দ্ধাই বা কি আমার দেখলেন?

হাসতে হাসতে একজন পারিষদ বললেন: তোমার রূপ দেখে। রূপের রাজ্যে যে এমন কুরূপা

থাকতে পারে, তা আমরা জানতাম না। আর একজন পারিষদ অতি কষ্টে মুখের হাসি বন্ধ করে বললেন : তোমার রূপ দেখে আমরাই হাসি থামাতে পারছি না, এরপর রাজকন্যার কাছে গেলে তিনি হাসতে হাসতে ভির্মী যাবেন!—এই সভাসদটির কথা শুনে রাজা ছাড়া তাঁর চার পাশের সভাসদ সকলেই একসঙ্গে আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মেয়েটির কালো মুখখানা এতক্ষণে লাল হোয়ে গেল; তার চোখের তুটো তারাও বুঝি দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠল; মুখখানা বেঁকিয়ে বলতে লাগল : রূপ! রূপের গর্ব্ব করছিস্? বটে? কিন্তু এর পরে তোদের রূপ দেখে শিয়াল-কুকুরও শিউরে উঠবে—দুর্ দুর্ করে তোদের তখন নগর থেকে তাড়িয়ে দেবে! দেখবি?...

এর পর বিড়-বিড় করে সেই কুব্জা মেয়েটি প্রত্যেক সভাসদকে লক্ষ্য করে কতকগুলো মন্ত্র পড়ে চলল, সেই সঙ্গে তার হাত মুখ ও চোখ তুটো যেন ঘুরতে লাগল। একটু পরেই ভোজরাজা দেখে স্তম্ভিত হোলেন—তাঁর চার-পাশে যে বারোজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ সভাসদরূপে বসেছিলেন, তাঁদের মুখগুলো একেবারে বদলে গেছে; তাঁদের হাত পা ও আর সব অঙ্গ আগেকার মতই রয়েছে, কেবল মুণ্ডগুলো আলাদা—বাঘ, হরিণ, কুকুর, শিয়াল, গাধা, ছাগল, সাপ, ভোঁদড়, শূকর, ঘোড়া, ষাঁড়, মোষ—এমনি এক একটা মুখ এঁদের

আগের মুখের বদলে বসানো রয়েছে! আর সেই কুব্জার রূপও একেবারে পালটে গেছে—সে এখন এক আশ্চর্য্য রূপসী তরুণী, মুখে তার হাসি ধরে না। কিন্তু যারা এই কন্যাকে দেখে হাসেনি—যেমন রাজা, মন্ত্রী, কোটাল ও রক্ষিগণ তাঁদের মুখের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, কেবল বারোজন রাজবয়স্যের এই তুর্দ্দশা ঘটেছে!

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তাঁদের চোখে আর পলক পড়ে না, মুখ দিয়ে কথা বার হয় না! সবাই ভাবেন—এ কি স্বপ্ন, না সত্য? কিন্তু বিজ্ঞ রাজা বুঝলেন যে, এ কন্যা যাতুকরী, অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী। তিনি কন্যাটিকে সম্বোধন করে বললেন : ভদ্রে, আমি তোমাকে উপহাস করিনি—তুমি শান্ত হও।

কন্যা বলল : সেজন্য আমিও মহারাজের ক্ষতি করিনি ; এখন আজ্ঞা করুন, আমি প্রস্তুত।

রাজা বললেন : আমার সভাসদগণের দোষও তুমি ক্ষমা কর—ওদের সকলকে মুক্তি দাও।

কন্যা তখন আবার আগেকার মত বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল ; কিছুক্ষণ পরে সভাসদগণ যে যার মুখ ফিরে পেলেন। দেখতে দেখতে কন্যাও আবার কুব্জার রূপে ফিরে এল।

সভাসদগণ তখন একসঙ্গে বলে উঠলেন : তুমি সুন্দরী, সুন্দরী, অপরূপ সুন্দরী!

ঠিক এই সময় রাজকন্যার এক সহচরী রাজসভায় এসে সবিনয়ে বলল : মহারাজ! রাজকন্যা উপর থেকে সব দেখেছেন, এই কন্যাকে তিনি পছন্দ করেছেন। এখন আদেশ হোলে আমি একে রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাই।

ভোজরাজা প্রসন্নমনে বললেন : সাধু সাধু! রাজকন্যা এঁকে পছন্দ করেছেন শুনে আমিও প্রসন্ন হয়েছি। এই বয়সেই ইনি যাদুবিদ্যায় সিদ্ধা হয়েছেন—ইনি অদ্ভুত শক্তিশালিনী যাদুকরী।

কুব্জা কন্যা এই সময় করযোড়ে বলল : মহারাজ! আমাকে আশ্রয় দিয়ে বেঁধে রাখলেন। আমার যাদুবিদ্যা এখন থেকে 'ভোজবিদ্যা' হোয়ে ভোজরাজ্যকে পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত করবে।

দুই

রাজসভায় যখন কুব্জা কন্যা আসে, রাজকন্যা সে সময় সহচরীদের সঙ্গে উপরের অলিন্দে উপস্থিত ছিলেন। অলিন্দকে মহিলা-মঞ্চ বলা হয়। অন্দর-মহলের মেয়েরা এখানে বসে রাজসভায় যে সব বিচার বা আলোচনা হয়—দেখেন ও শোনেন। এখান থেকে তাঁরা রাজসভা দেখতে পান, কিন্তু রাজসভা থেকে এঁদের কাউকে দেখা যায় না—এমন কৌশলে এই অলিন্দ তৈরী।

কুব্জীকে নিয়ে রাজকন্যা ভানুমতী নিজের মহলে এলেন। তাঁর বসবার আসনের পাশে আদর করে কুব্জীকে বসিয়ে বললেন : আমি যা খুঁজছিলাম, ভগবান আমাকে তাই মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে পেয়ে আমি যে কি খুশী হয়েছি সুন্দরী দিদি, মুখে তা কি বলব!

কুব্জী রাজকন্যার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছরের বড়ই হবে ; তাই তিনি তার সঙ্গে দিদি সম্পর্ক পাতালেন। সহচরীদেরও বলে দিলেন—তারাও যেন সুন্দরীকে দিদি বলে।

রাজকন্যার আদরে মুগ্ধ হয়ে কুব্জীও বলল : রাজসভায় রাজাকে যা বলেছি, তার একটুও এদিক ওদিক হবে না। আর, আমার ভাঁড়ারের বিদ্যা সব তোমাকে শেখাব—তোমার বিয়েতে এমন হুলস্থূল কাণ্ড বাধাব যে, সারা দেশ চমকে উঠবে।

সহচরীরা মুখ বুজে দুই সখীর কথা শুনতে থাকে। এই কুরূপা কুব্জীর উপরে রূপসী রাজকন্যার দরদ দেখে তারা অবাক হোয়ে চেয়ে থাকে। নিরালায় গিয়ে বলাবলি করে : রাজকন্যাকেও ঐ কুব্জী যাদু করেছে।

কুব্জী কিন্তু মুখে যা বলেছিল, বছর ফিরতে না ফিরতে কাজেও তা দেখিয়ে দিল। এই

অদ্ভুত যাতুকরী তার যাতুবিদ্যার প্রভাবে রাজ্যের মধ্যে এমন সব অলৌকিক কাণ্ড করতে লাগল যে, শান্তিভঙ্গকারী চোর-ডাকাত, এমন কি, বিপ্লবী রাজদ্রোহীরা পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে রাজার বাধ্য হোলো। রাজার শত্রুপক্ষ রাজ্য আক্রমণ করতে এসে ছত্রভঙ্গ হোয়ে পালিয়ে গেল। এর ফলে দেশময় রাষ্ট্র হোলো, পৌরাণিক যুগের দানব রাজাদের মতন ভোজরাজাও মায়াবিদ্যার সাধনা করে এমনি মায়াবী হোয়েছেন যে, ওঁর সঙ্গে কোন রাজাই শত্রুতা করে পেরে উঠবেন না; যিনিই ভোজরাজার বিপক্ষে যাবেন তাঁকে নাস্তানাবুদ হোয়ে হার মানতে হবে। রাজ্যের মধ্যে কোথাও চুরি-ডাকাতি হোলে রাজার মায়াবী চরেরা নল চালিয়ে অপরাধীদের ধরে আনে; চোরাই বা লুঠের মাল—যেখানেই লুকানো থাক না কেন, সন্ধান করে বার করে দেয়। এই নলচালা বিদ্যাটিও যাতুকরী কুজীর কীর্ত্তি।

দেখতে দেখতে আরও কয়েক বছর কেটে গেল। রাজকন্যা ভানুমতীর বিবাহের জন্যে রাজা ব্যস্ত হোয়ে উঠলেন। কিন্তু কুজী গিয়ে রাজাকে বললেন: মহারাজ! আপনার কন্যা পণ করেছেন, যিনি তাঁকে বিদ্যায় হারাতে পারবেন, তাঁকেই তিনি বরণ করবেন।

রাজা অবাক হোয়ে বললেন: সে কি! এমন কি বিদ্যায় কন্যা আমার সিদ্ধা যে, এত বড় পণ করতে পারে? দেশে কি বিদ্বান ব্যক্তির অভাব আছে?

কুজী বলল: রাজকন্যা যে বিদ্যায় সিদ্ধা হোয়েছেন, তাতে তাঁর সমকক্ষ ত কাউকে দেখি না। আপনার ভয় নেই মহারাজ, রাজকন্যা আপনার মুখ রক্ষা করবেন। আর—যে বিদ্যার জন্যে আপনার রাজ্যের এত নামডাক, সেই বিদ্যার পণ রেখে তিনি আপনার রাজ্যেরই মান বাড়াচ্ছেন। আপনি পণের কথা ঘোষণা করুন।

রাজা বুঝলেন, কন্যা তার এই অদ্ভুত যাতুকরী সহচরীর যাতুবিদ্যার জোরে এ পণ করেছে। অগত্যা তাঁকে ঘোষণা প্রচার করতে হোলো। সকলেই শুনলেন—ভোজরাজকন্যা ভানুমতীকে যিনি বিদ্যায় হারাতে পারবেন, রাজকন্যা নির্ব্বিচারে তাঁরই গলায় বরমাল্য দেবেন।

এর পর নানা রাজ্যের রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, সদাগরপুত্র, বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তি রাজকন্যার সঙ্গে বিদ্যার বিচার করবার জন্যে ভোজরাজ্যে ধাওয়া করলেন। কিন্তু কুজীর যাতুবিদ্যার এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব রাজধানীকে ঘিরে রাখল যে, রাজকন্যার সামনে আসা দূরের কথা, কারও পক্ষে নগরে প্রবেশ করা সম্ভব হোলো না! রাজার শত্রুপক্ষ ভোজরাজ্য আক্রমণ করতে এসে যাতুবিদ্যার প্রভাবে যেমন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত হোয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বিদ্যার বিচার করতে এসেও তাঁদের অদৃষ্টে এমনি দুর্ভোগ ঘটতে লাগল; ফলে এরাও অপদস্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে শেষ পর্য্যন্ত পালাবার পথ পেলেন না! এই ভাবে একটি বছর বৃথা হয়রানীর পর কন্যার পাণি-প্রত্যাশায় প্রার্থীদের আসাও বন্ধ হোয়ে গেল।

রাজা তখন ক্ষুব্ধ হোয়ে বললেন: এ কি কাণ্ড তোমরা করলে? পথ থেকে সকলকে ভাগিয়ে দিলে—কেউ প্রাসাদে এসে বিদ্যার বিচার করতে বসতেও পেল না!

কুব্জী বলল : তা হোলে বুঝুন মহারাজ, কেমন তাঁদের বিদ্যার জোর! যুদ্ধক্ষেত্রে ঘেঁষবারই যাদের ক্ষমতা নেই, তারা কি করে যুদ্ধ করবে? এই সব কাপুরুষের মধ্যে আপনার কন্যার যোগ্য বর একজনও ছিল না।

রাজা বললেন : তা হোলে কি উপায় হবে? কি করে ভানুমতীর যোগ্য পাত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে? ব্যাপারটা ত এখন আতঙ্কের মত হোয়ে দাঁড়িয়েছে, আর কেউই সাহস করে আসছে না।

কুব্জী বলল : সন্ধান করে দেখুন, রাজা-রাজপুত্রদের মধ্যে রাজকন্যার বিজ্ঞাপণের ঘোষণা শুনেও কে কে আসেননি। তাঁদের এখন আমন্ত্রণ করে আনবার চেষ্টা করুন। তাঁদের মধ্যেই হয়তো রাজন্যার বর আছেন।

রাজা বললেন : তোমার কথা শুনে প্রথমেই একজনের নাম মনে পড়ছে—যিনি আসেননি এবং এভাবে ঘোষণা শুনে আসতেও পারেন না, তিনি হচ্ছেন রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য।

নামটি শুনেই কুব্জী খুব খুশী হয়ে বলল : হাঁা, হাঁা, এই একজন নাম করবার মত মানুষ বটে। শুনেছি ইনিও নাকি অনেক গুণে গুণী, অনেক রকম বিদ্যাও জানেন। তা উনি যখন ঘোষণায় কান দেননি, ওঁকে নিমন্ত্রণই করুন না—রাজকন্যার পণ জানিয়ে।

রাজা বললেন : ওঁকে নিমন্ত্রণ করতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি ওঁরও আসার পথে ঐভাবে বিঘ্ন ঘটাও বা বাধা দাও, তখন কিন্তু অনর্থ হবে। উনি হচ্ছেন দেশপতি সম্রাট্; উনি ক্রুদ্ধ হোলে তখন কিন্তু নিস্তার থাকবে না। এই ভেবে ভয় হচ্ছে।

হাসতে হাসতে কুব্জী বলল : এ আপনি কি বলছেন মহারাজ! অত বড় রাজার আসার পথেও যদি আমরা বাধা দিতে পারি, তা হোলে বুঝব যে, উনিও ঐ সব পলাতকদের মতন ভীরু, কাপুরুষ অপদার্থ, উনিও আমাদের রাজকন্যার যোগ্য নন।

কুব্জীর কথা ভোজরাজের মনে লাগল; তিনি আর তর্ক না করে সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যকে নিমন্ত্রণ করাই উচিত ভেবে মন্ত্রণাগারে চলে গেলেন। সেখানে মন্ত্রীরাও এই পরামর্শ দিলেন। ফলে, সেইদিনই নানাবিধ উপহার ও নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে বিশিষ্ট রাজদূত উজ্জয়িনী যাত্রা করলেন।

তিন

মহারাজা বিক্রমাদিত্য তখন ভারতবর্ষের সম্রাট্। সকল রাজাই তাঁর নামে তটস্থ। তাঁর রাজ্যের নাম অবন্তী, আর রাজধানী উজ্জয়িনী যেন দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী। ঘর, বাড়ী, মঠ-মন্দির, বাগান-বাগিচা, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট সবই যেন ছবির মত ঝক্‌ঝক্ করছে। উজ্জয়িনীর রাজসভাটিও আশ্চর্য্য বস্তুর মত দর্শনীয়। ধাপে ধাপে বত্রিশটি সোনার পুতুলের উপরে রাজার সিংহাসন—কত রকমের কত কারু কাজ, হীরা মণি মাণিক্য মুক্তায় সে আসন আগাগোড়া খচিত। রাজাকে দেখলেই মনে হয়, এই সিংহাসন তাঁরই যোগ্য বটে। রাজার দিকে তাকালে তাঁর চোখ-

ঝলসানো রূপ চুম্বক পাথরের মতন যেন দৃষ্টিকে টেনে রাখে। যেমন রাজা তেমনি তাঁর রাজসভা। নানা বিদ্যা ও নানাগুণে যাদের দেশযোড়া নাম—এমন বাছা বাছা নয়জন মহাপণ্ডিত এসে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার শোভা বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাজার মত এঁরাও সারা দেশে 'নবরত্ন' নামে বিখ্যাত হোয়েছেন। এঁরা ছাড়াও কত রকমের আরও কত শত গুণী এই রাজসভাকে অলঙ্কৃত করেছেন। এই সব গুণিজনের সমাগমে উজ্জয়িনীর রাজসভা যেন গম-গম করতে থাকে!

রাজার সুশাসনে সবাই সুখী। প্রজারা ভাবে, তারা রামরাজ্যে বাস করছে। কিন্তু একটি অভাবের জন্যে রাজবাড়ী ও রাজধানীর সকলেই মনে মনে কেমন একটা ব্যথা বোধ করে। সেটি হোচ্ছে—রাজার সব আছে, কিন্তু নেই শুধু একটি রাণী। এদিকে রাজার মনও নেই। কত রাজাই ত রাজকন্যা নিয়ে সাধাসাধি করেছেন—রাজা যাতে পছন্দ করে বিবাহ করেন। কিন্তু রাজার তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। এসম্পর্কে মন্ত্রীরা বা নবরত্ন পীড়াপীড়ি করলে রাজা একটু হেসে বলেন: ওরা সব নামেই রাজকন্যা, উজ্জয়িনীর রাণী হবার মত যোগ্যতা ওদের মধ্যে নেই।

রাজার কথা শুনে এঁরা অবাক হোয়ে ভাবেন—কোন কন্যাকে চোখে না দেখে, কেমন করে রাজা একথা বলতে পারেন? একথা বলার মানেই হোচ্ছে, আসলে তাঁর বিয়ে করবার মনই নেই। কিন্তু রাজার মনের আসল কথাটি এঁরা সবাই বুঝতে পারলেন—যেদিন ভোজরাজা দূত পাঠিয়ে রাজাকে কন্যার পণের কথা জানিয়ে নিমন্ত্রণ করলেন।

আগের সব রাজা নিজের নিজের কন্যার রূপ-গুণের ভণিতা করে তাঁকে গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠিয়েছেন মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভায়—একই রকম প্রত্যেকের কথা। দূতেরা এসে সবিনয়ে নিবেদন করেছে—রাজকন্যার রূপ-গুণের সীমা নেই, দেখলেই পছন্দ হবে। এখন মহারাজ কৃপা পূর্ব্বক তাঁর পাণিগ্রহণে সম্মতি দিলে কন্যা ধন্যা ও রাজা কৃতার্থ হবেন।

এই ধরনের প্রার্থনা কি বিক্রমাদিত্যের মত মনীষীর অন্তর স্পর্শ করতে পারে? যিনি হবেন রাজার সহধর্ম্মিণী—অবন্তীর মহারাণী, তিনি কি এতই হেয়? পিতার মনোবৃত্তি যেখানে এত দুর্ব্বল, কন্যার অন্তর কি করে দৃঢ় হতে পারে! এই ভেবেই রাজা তাঁদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু ভোজরাজার দূত সভায় এসে নিজের রাজার মর্য্যাদা বজায় রেখে বললেন: মহারাজ, আমাদের রাজকন্যা পণ করেছেন—তিনি যে বিদ্যায় পটীয়সী, সেই বিদ্যায় যিনি তাঁকে হারাতে পারবেন, রাজকন্যা তাঁকেই বরমাল্য দেবেন। এই শুনে অনেক রাজ্যের রাজা ও রাজপুত্রেরা রাজকন্যার পানি-প্রার্থী হোয়েছিলেন, কিন্তু রাজকন্যার বিদ্যার এমনি প্রভাব যে, কোন প্রার্থীই এ পর্য্যন্ত ভোজরাজ্যে ঢুকতেই পারেন নি—সীমান্ত থেকেই হার মেনে ফিরে গেছেন। এখন আমাদের রাজা তাঁর এই বিদুষী কন্যাটির পণ ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে অবন্তীর পাটরাণী করবার জন্যে মহারাজকে আমন্ত্রণ করেছেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য গম্ভীরমুখে দূতের কথা শুনছিলেন, তাঁর কথা শেষ হোলে প্রসন্নমনে সহাস্যে বললেন: আপনার রাজার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম দূত!

চার

সভার এই খবরটি শুনে রাজপুরী ও রাজধানীর সকলেই আহ্লাদে আটখানা। সবার মুখে এক কথা—আর ভাবনা নেই, রাজা যখন নেমন্তন্ন নিয়েছেন, বিয়ের ফুলও তখন ফুটেছে।

কিন্তু সভাভঙ্গের পর রাজা নবরত্নকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। রাজকন্যার পণ ভাঙবার নিমন্ত্রণ তিনি নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর মনেও রীতিমত ভাবনা হোয়েছে বৈ কি! এমন কি, নানা বিদ্যায় অভিজ্ঞ নবরত্নকেও উদ্বিগ্ন হোতে হোয়েছে রাজকন্যার অজ্ঞাত বিদ্যাটির প্রভাবের কথা শুনে। তাই তাঁরা প্রথমেই রাজাকে বললেন: নিশ্চয়ই রাজকন্যার কোন অলৌকিক শক্তি আছে।

রাজা বরাহ পণ্ডিতকে বললেন: আপনি তো গণনায় সিদ্ধ, গণনা করে বলুন—রাজকন্যার সে শক্তিটা কিসের?

বরাহ পণ্ডিত নবরত্নের এক উজ্জ্বল রত্ন, মহা জ্যোতিষী। তিনি তখনি গণনা করতে বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বরাহ পণ্ডিত বললেন: রাজকন্যার শক্তি হোচ্ছে বিদ্যার।

রাজা কথাটা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন: বিদ্যা কি অমন করে অনর্থ ঘটাতে পারে? তা হোলে সেটি কোন্ বিদ্যা?

বরাহ বললেন: গণনায় আমি শুধু বিদ্যাই পাচ্ছি। আর, সব শক্তির মূলেই তো বিদ্যা। অস্ত্র ও শাস্ত্র এদের ধারা আলাদা হোলেও দুটোই বিদ্যা। দেহের শক্তি চালিয়ে শত্রুকে জয় করা যেমন বিদ্যা, মনের শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়াও তেমনি বিদ্যা। রাজকন্যা এই বিদ্যায় সিদ্ধা।

এর পর নবরত্ন অনেক আলাচনা করে বললেন: রাজকন্যার ঐ বিদ্যা হোচ্ছে মায়াবিদ্যা। এখন মহারাজকে সাবধান হোতে হবে।

রাজা বললেন: ভাবনা কি—নবরত্ন আমার সহায়। মহাকবি কালিদাসের কবিতাই আমাকে···

কিন্তু কালিদাস তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: মহারাজ আমাকে ক্ষমা করবেন। কাব্যের বিচারে যে কোনো পণ্ডিতকে আমি হারাতে পারি, কিন্তু মায়াবিদ্যার আমি কিছুই জানি না।

কালিদাসের পর ধন্বন্তরি, বররুচি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, বরাহ-মিহির প্রভৃতি সব রত্নই একবাক্যে জানিয়ে দিলেন যে, মায়া বা যাদুবিদ্যার ব্যাপারে তাঁরা প্রত্যেকেই অপটু।

রাজা বললেন: নবরত্ন যেখানে অক্ষম, অগত্যা বাধ্য হোয়েই তাল-বেতালকে স্মরণ করতে হয়।

নবরত্ন এ কথা শুনে নীরবেই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, মুখে কিছু বললেন না। আর বলেনই বা কি করে? তাল বেতাল নামে দুটি আশ্চর্য্য রকমের অনুচরের প্রতি রাজার অনুরাগ দেখে নবরত্ন মনে মনে ক্রুদ্ধ হোতেন। মুখে না বললেও রাজা এঁদের মনের ভাব জানতেন। বড় বড় পণ্ডিত হোলেও এই তাল-বেতালের ব্যাপারে এঁরা যেন অধৈর্য্য হোয়ে পড়তেন, রাজা যখন-তখন এদের ডাকেন—এ যেন পণ্ডিতদের ইচ্ছা নয়। রাজাও ভাবতেন, কোন একটা কঠিন কাজকে উপলক্ষ করে তাল-বেতালের ক্ষমতা দেখিয়ে নবরত্নের ভুল ভেঙ্গে দেবেন। সেই সুযোগ বুঝি এতদিনে এসে গেল!

কুচ্‌কুচে কালো দুটি ছেলে—যেন একটি বোঁটায় ফোটা একযোড়া অপরাজিতা ফুল! দুটিতেই মাথায় মাথায় এক রকম, সমান বয়স, চেহারায় আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য—যেন এক মায়ের পেটের যমজ ভাই। দেখলেই মনে হয় বুঝি এখনো এরা কৈশোরের গণ্ডী পার হয়নি; কিন্তু এদের মুখের কথা এমনি পাকা পাকা আর জোরালো যে, শুনলে অবাক হোতে হয়। এই জন্যেই তো এদের পাকামোতে নবরত্নের এত রাগ। রাজার নবরত্ন যখন অনেক মাথা ঘামিয়েও কোনো শক্ত কথার মীমাংসা করতে অক্ষম হন, রাজা তখনি মনে মনে এদের দুটিকে স্মরণ করেন, অমনি এরা ঝড়ের মতন এসে রাজার কানে কানে কি বলে দেয়, তারপরই রাজা যে কথা বলেন—তাই পাকা হোয়ে যায়। নবরত্নের ধারণা ওকথা রাজারই, কেবল ছোঁড়া দুটোকে বাড়াবার জন্যেই ঐ রকম একটা চাল চেলে নবরত্নকে দাবাতে চান। এদিনও নবরত্ন যেই হাল ছেড়ে দিলেন, রাজাও তাঁদের নাম করতেই নাচতে নাচতে ছেলে দুটি হাজির!...দুটি ছেলেরই খোলা গা; গলায় প্রবালের মালা, দুটি বাহু ও কোমরে কড়ির গাঁটছড়া, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা—তাতে পালক আঁটা, পরনে ছোপানো কাপড়, মুখে প্রসন্ন হাসি, টানা টানা চোখের কোলে কাজল—চোখের তারার কি দীপ্তি! এই আশ্চর্য্য দুটি ছেলেই রাজার—তাল-বেতাল।

এসেই দু'জনে বলল: কি হুকুম মহারাজ?

রাজা সহাস্যে বললেন: এসেছ! আমি যে ভারি ভাবনায় পড়েছি।

তাল-বেতাল বলল: জানি মহারাজ!

রাজা বললেন: তা হোলে এখন কি করি বল তো? এগুব, না পেছুব?

তাল বলল: এগুবেন বৈ কি—মহারাজ কি কখনো পেছিয়েছেন?

বেতাল বলল: রাজকন্যার পণ ভাঙ্গতেই হবে—আপনার গলাতেই তিনি মালা দেবেন

রাজা বললেন: কিন্তু রাজকন্যা যে যাদুবিদ্যায় পাকা।

তাল-বেতাল বলল: আপনিই বা কোন্ বিদ্যায় কাঁচা?

রাজা বললেন: তবু ভয় হোচ্ছে—যদি হারি?

তাল বলল: দেশশুদ্ধ সবাই চাইছে—মহারাণী আসেন। আপনার কি হার হোতে পারে?

বেতাল বলল: আপনি তৈরী হোন—আমরাও পথ ঠিক করি।

এই বলেই যেমন এসেছিল সহসা তেমনি ঝাঁ করে তারা অদৃশ্য হোলো।

রাজা নবরত্নকে বললেন: তা হোলে যাওয়াই স্থির, আপনারাও তৈরী হোন।

নবরত্ন বললেন: তাল-বেতাল ত যাচ্ছে; আমাদেরও কি যাবার দরকার হবে?

রাজা বললেন: বিলক্ষণ! ওরা ছেলেমানুষ, পাকা দুটো কথাই না হয় বলতে পারে, কিন্তু বিদ্যা ওদের কতদূর বলুন? সবাই জানে—বিক্রমাদিত্যের ভরসা—নবরত্ন।

নবরত্ন ও চতুরঙ্গ সৈন্য সামন্ত নিয়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সেদিন সন্ধ্যার সময় ভোজরাজ্যের

সীমান্তে উপস্থিত হোলেন। নবরত্ন যুক্তি দিলেন: এইখানেই শিবির ফেলা হোক; সকালেই আবার যাত্রা সুরু করা যাবে। রাজাও সম্মত হোলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মিছিল—সে এক বিরাট ব্যাপার! সৈন্য সামন্ত, রথ, গাড়ী, পাল্‌কী, ঘোড়া, হাতী, উট—তারপর এদের থাকবার ও খাবার মত ব্যবস্থা—কিছুরই অভাব নেই। শিবির পড়তেই শত শত উনান জেলে রান্নার পাট আরম্ভ হোলো। যথাসময় আহার সেরে সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। কেবল প্রহরীরা পালা করে প্রহরে প্রহরে পাহারা দিতে লাগল।

ভোর হয় হয়, এমন সময় রক্ষীরা চীৎকার করে উঠল: বন্যা, বন্যা! জাগো, ওঠ, তৈরী হও—বন্যা ছুটে আসছে।—অমনি সমস্ত শিবিরের লোকজন একসঙ্গে জেগে উঠল। সকলেই অবাক হোয়ে দেখল—দূরের নদী ফুলে উঠে পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ তুলে শিবিরের দিকে ছুটে আসছে! রাজার লোকজনও তাড়াতাড়ি শিবির তুলে তৈরী হোয়েছে পালাবার জন্যে। নবরত্ন সেনানী সৈনিক রক্ষী সবাই তটস্থ, সকলেই চঞ্চল, রাজাজ্ঞা শোনবার জন্যে সবাই ব্যাকুলভাবে চেয়ে আছে। এমনি সময় রাজা নবরত্নকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি করা যায়?

নবরত্ন জানালেন: ফিরে যাওয়া ভিন্ন বাঁচবার উপায় নেই।

রাজা বললেন: ফিরে যাওয়া মানে—হেরে যাওয়া। ভোজরাজ হাসবেন।

নবরত্ন বললেন: জীবন আগে।

রাজা বললেন: জীবন পণ করেই কিন্তু রাজধানী থেকে যাত্রা করি।

নবরত্ন বললেন: বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন নাকি? তখন তো ভাবিনি যে প্রকৃতি বিরূপ হবেন!

বরাহ বললেন: আপনার তাল-বেতাল এ সময় কোথায়?

রাজা বললেন: তাদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম; স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভারি উপকার করলেন।

পরক্ষণে মাটি ফুঁড়ে যেন উঠে এল সেই কালো কালো ছেলে দুটি; এখন তাদের হাতে এক একটি বাঁশী। রাজা তাদের পানে চেয়ে বললেন: ব্যাপার দেখছ ত? এঁরা সব বলছেন ফিরে যেতে, অর্থাৎ পালাতে। তোমাদের কি মত?

তাল জিজ্ঞাসা করল: ও যদি পানি না হোয়ে প্রাণী হোত?

বেতাল কথাটা আরো স্পষ্ট করে বলল: তাল বলতে চাইছে—ঢেউ না হোয়ে ওরা যদি ঘোড়সওয়ার সিপাহীর মতন ছুটে আসত—ভয়ে পালাতেন?

নবরত্নের দিকে চেয়ে রাজা বললেন: শুনছেন ত এদের কথা! এখন কি বলতে চান?

নবরত্ন বললেন: তা হোলে, ওদের কথা শুনে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে যান!

একথা শুনে তাল-বেতালের দিকে চেয়ে রাজা শুধু হাসলেন। তাল অমনি বেতালের হাতখানি ধরে জোর গলায় বলে উঠল: সেই ভালো, আমরা লড়াই করতেই এগুলাম—এখন মহারাজের যা ইচ্ছা হয় করুন।

বলতে বলতে দুই ছেলে হাত ধরাধরি করে অপর হাতের বাঁশী মুখে ঠেকিয়ে ফুঁ দিতে দিতে বন্যার চেয়েও বেগে সেই বন্যার মুখে ছুটল। আর তাদের বাঁশীর সুর বন্যার শব্দের সঙ্গে অদ্ভুত এক শব্দের ঝঙ্কার তুলল। রাজার সৈন্যসামন্ত এই সময় সমস্বরে চীৎকার করে উঠল: আজ্ঞা দিন্ প্রভু, আজ্ঞা দিন্—আমরা ফিরে যাই।

কিন্তু তাদের আর্ত্তস্বরকে স্তব্ধ করে রাজাজ্ঞা তর্জ্জনের সুরে ধ্বনি তুলল: ফিরলেই মৃত্যুদণ্ড—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

আজ্ঞা দিতে দিতেই রাজা সলম্ফে তাঁর ঘোড়ার পিঠে উঠে সেই ভীষণ বন্যার দিকে ধাবিত হোলেন। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের সামর্থ্য ছিল না কোন সৈনিকের—মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই তারা রাজার পিছু পিছু ছুটল। নবরত্ন বুঝলেন, রাজা পাগল হোয়েছেন; কিন্তু তাঁরাও স্থির থাকতে পারলেন না—এক একটি ঘোড়ায় উঠে সেই বন্যার দিকে এগুলেন।

আশ্চর্য্য কাণ্ড! কিছুদূর এগুতেই অবাক হোয়ে সকলে দেখলেন—পাহাড়ের মত উঁচু হোয়ে যে বন্যা ছুটে আসছিল, এখন সে ফিরে চলেছে হু-হু শব্দে! আর সেই দুটি ছেলের বাঁশীর সুর যেন রণভেরীর মত সকলকে ডাকছে—আগে চল, ওরে আগে চল!

দেখতে দেখতে—উষার আলোর সঙ্গে সঙ্গে বন্যার অত বড় বিভীষিকা যেন কুয়াশার মত দিগন্তের কোলে মিশে গেল। অমনি হাজার কণ্ঠে আনন্দধ্বনি উঠল: জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়!

একটু পরেই দেখা গেল, মন্ত্রী সভাসদ পাত্র মিত্র ও রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে ভোজরাজা আমন্ত্রিত মহারাজাকে সম্বর্দ্ধনা করতে আসছেন।

পাঁচ

ভোজরাজার প্রাসাদে রাজভোজের ঘটা চলল সমস্ত দিন ধরে। রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁর দলের প্রত্যেক লোকটিকে আদর-আপ্যায়নে অভিভূত করেছিলেন ভোজরাজের লোকজন। রাজার নবরত্ন বরাবরই ভোজন-বিলাসী; ভোজপুরীতে তাঁদের ভুরিভোজের বহর দেখে ভোজন-বিশারদ ভোজপুরী পালোয়ানদেরও তাক লেগে গেল।

সন্ধ্যার পর রাজবাড়ীতে মধুর সুরে নহবত বেজে উঠতেই ভোজরাজের বৈতালিক মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের কাছে এসে বললেন: সময় হয়েছে, এখন আসবার আজ্ঞা হোক।

নবরত্নের সঙ্গে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজকন্যার মন্দিরে চললেন। রাজকন্যার সহচরীরা ফুলের সাজে সেজে, হাতে এক এক ছড়া ফুলের মালা নিয়ে রাজা ও নবরত্নের অভ্যর্থনা করতে এলেন। এঁরাই পথ দেখিয়ে রাজাকে নিয়ে চললেন।

খানিক পরে প্রকাণ্ড একখানি সাজানো ঘরের সামনে আসতেই রাজকন্যার প্রধানা সহচরী সেই কুব্জা সুন্দরী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল: মহারাজ! এই ঘরে আছেন রাজকন্যা ভানুমতী; এই ঘরেই হবে বিদ্যার পরীক্ষা। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটি অঙ্গীকার করতে হবে।

সহচরীরা রাজা ও নবরত্নকে জানিয়ে দিলেন—ইনিই রাজকন্যার প্রধানা সহচরী। নবরত্নের তো চক্ষুস্থির সহচরী সুন্দরীর অপরূপ রূপ দেখে! তাঁরা মনে মনে ভাবলেন—হ্যাঁ, যেমন আমাদের রাজার তাল-বেতাল, তেমনি রাজকন্যার এই সহচরী!

রাজা সুন্দরীর দিকে একটি বার চেয়ে গম্ভীরমুখে বললেন: বলো!

সহচরী বলল: বিদ্যার পরীক্ষায় যদি রাজকন্যা হারেন, আপনার গলায় মালা দিয়ে চিরজীবনের মত আপনার দাসী হবেন। কিন্তু রাজকন্যার যদি জিত হয়, তা হোলে নবরত্নের সঙ্গে আপনি সারাজীবন ভোজরাজ্যে রাজকন্যার দাস হোয়ে থাকবেন। যদি রাজী হন, তবে পরীক্ষা হবে।

রাজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নবরত্নের দিকে তাকালেন। তাঁরা একবাক্যে জানালেন: মহারাজের সঙ্গেই আমাদের অদৃষ্ট বাঁধা। অন্য মত নেই।

রাজা বললেন: বেশ, আমি স্বীকার করছি।

রাজার কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দর সুসজ্জিত সুবৃহৎ ঘরখানির দরজাগুলি এক লহমায় এক সঙ্গে খুলে গেল। কিন্তু এ কি! সেই ঘরখানি জুড়ে একই বয়সের, একই আকারের, একই চেহারার, একই রকমের সাজ-সজ্জায় সজ্জিতা অসংখ্য রাজকন্যা পুতুলের মতন স্থির হোয়ে বসে রয়েছেন!

সহচরী সুন্দরী বলল: মহারাজ, আসুন! এদের ভিতর থেকে রাজকন্যা ভানুমতীর হাতখানি ধরে তার হাতের মালাটি গলায় পরুন। আর যদি ভুল হয়—দাসত্বের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

নবরত্নের সঙ্গে অবাক হোয়ে রাজা দেখলেন—অত বড় প্রকাণ্ড ঘরখানির চারদিকেই সারি সারি রাজকন্যা, তারা যে কত তা গণনা করে জানাও কঠিন। আবার এমনি আশ্চর্য্য, প্রত্যেক কন্যার চোখের ভুরুটি থেকে পায়ের আঙুলের নখটি পর্য্যন্ত একই রকম। মুখ, চোখ, হাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—কাপড়-চোপড়, গহনা, কোথাও এতটুকু হেরফের নেই। এদের ভিতর থেকে আসল রাজকন্যাটিকে কেমন করে ধরা সম্ভব?

রাজা নবরত্নকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন: এখন উপায়? কি করা যায়?

নবরত্ন ইঙ্গিতে জানালেন যে, তাঁরা নিরুপায়—এ বিদ্যা তাঁদের জানা নেই!

বরাহ কেবল একটি টিপ্পনি কেটে আস্তে আস্তে বললেন: আপনার তাল-বেতালকে আনলেন না কেন? হয়ত উপায় কিছু হোত।

রাজা যেন অকূলে কূল পেলেন, বললেন: ভালো সময়েই কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। তারা এই কৌটাটি আমাকে দিয়ে বলেছিল—তেমন কোন সঙ্কটে পড়লে এর ঢাকনিটা খুলে ফেলবেন।

বলেই রাজা অঙ্গবস্ত্রের ভিতর থেকে কালো রঙের একটি কৌটা বার করলেন। নবরত্নের মুখে বিদ্রূপের রেখা ফুটে উঠল।

কিন্তু রাজা যেমন কৌটাটি খুললেন, অমনি তার ভিতর থেকে কালো কালো ছুটি পোকা একসঙ্গে বেরিয়ে বাতাসে পাক দিয়ে দিয়ে উড়তে উড়তে কন্যাগুলির দিকে এগিয়ে গেল। রাজাও তাদের পিছু পিছু চলতে লাগলেন। পোকা ছুটি ক্রমে ক্রমে প্রথম সারির মেয়েগুলির মুখের উপর দিয়ে উড়ে চলল; কিন্তু একটি মেয়েকেও এতটুকু নড়তে দেখা গেল না। এর পর তারা ছুটল দ্বিতীয় সারিতে। রাজাও চলেছেন তাদের পশ্চাতে পশ্চাতে মেয়েদের মুখের পানে চাইতে চাইতে। কিন্তু এ সারিতেও কোন মেয়েকেই নড়তে দেখা গেল না। রাজা এখানে একটু দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই দেখলেন, পোকা ছুটো তিনের সারিতে উড়ে চলেছে। রাজাও তাদের পিছু পিছু এগুতে লাগলেন। এই সারির গুটি সাতেক মেয়ের মুখে পাখার ঝাপটা দিয়ে তার পরের মেয়েটির চোখের উপরে আসতেই সেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি ডান হাতখানি তুলে দিলেন বাধা পোকা ছুটিকে। এদিকে রাজাও নিকটে ছিলেন, তিনিও অমনি খপ করে সেই কন্যার হাতখানি চেপে ধরে বললেন: ইনিই রাজকন্যা!

অমনি, চোখের পলক পড়তে না পড়তে আর সব কন্যা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, রইলেন শুধু রাজকন্যা ভানুমতী, তাঁর হাতে ফুলের মালা! তিনি তৎক্ষণাৎ মালা ছড়াটি রাজার গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁর পায়ের তলায় মাথাটি নীচু করে বললেন: আজ থেকে আমি আপনার দাসী আর্য্যপুত্র!

সহচরীরা প্রস্তুত ছিল, অমনি শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি তুলে তারা সারা পুরী মাতিয়ে তুলল—রাজরাণী রাজপুরীর মেয়েদের নিয়ে উল্লাসে ছুটে এলেন।

শ্রীতারাপদ রাহা

চোখ খুলে ভাল করে আমরা চেয়ে দেখি না, তাই,—চাইলে দেখতাম জীব-জগতের সর্বত্রই প্রকৃতির অদ্ভুত শিল্প আর খেয়ালের নমুনা। একটু ভেবে দেখলে প্রত্যেক জীবের দৈহিক গঠন আর প্রকৃতিই অদ্ভুত লাগবে আমাদের চোখে,—তারিফ করতে ইচ্ছা করবে প্রকৃতির অদ্ভুত শিল্পজ্ঞানের, আর তাজ্জব বনে যাব তার খেয়ালের পরিচয় পেয়ে, কখনও বা ক্ষুব্ধ হ'ব তার পক্ষপাত দেখে।

খেয়ালী প্রকৃতি জীব-সৃষ্টিতে দরাজ হাতে দান করতে গিয়ে যে সব কাণ্ড করে বসে আছে, তার দু'-একটার নমুনা শুধু তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রত্যেক জীবের চোখ এমনিই এক তাজ্জব জিনিস—তার উপর সবার চোখের অবস্থান আবার এক জায়গায় নয়। এক রকম চিংড়ী আছে তার চোখ হচ্ছে—তার লম্বা ঠ্যাংয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে। স্থলচর এক রকম কাঁকড়ার চোখও এই রকম তার উঁচিয়ে তোলা ঠ্যাংয়ের উপর। খরগোশ তার ড্যাবা ড্যাবা বাঁকা চোখে দেখতে পায় তার পিছন দিকেও। আর তাজ্জব চোখের ব্যাপারে সবাইকে হার মানিয়ে দেয় 'অ্যানাব্লেপস্' (anableps) নামে আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের এক রকমের মাছ। এই মাছ যখন সাঁতরায়—তার চোখের অর্ধেক থাকে তখন জলের উপরে, আর অর্ধেক থাকে জলের নীচে। তার প্রত্যেক চোখেই আছে দুটো করে মণি—এক মণি দিয়ে দেখে সে জলের উপরকার সব কিছু, সঙ্গে সঙ্গে আর এক মণি দিয়ে দেখে সে জলের নীচেকার সব।

জিভের ব্যাপারেও প্রকৃতি কম কাণ্ড করে নি। ব্যাঙের জিভ তার মুখের এত সামনে বসানো হয়েছে যে, এক জায়গায় বসেই সে জিভ বাড়িয়ে অনেক শিকার ধরে মুখে পুরে দিতে পারে। জেকো (gecko lizard) নামে দীর্ঘরসনা এক রকমের গিরগিটি তার জিভ বাড়িয়েই চোখ পরিষ্কার করে নেয়। উইখেকো 'ষ্যাণ্টইটারের' জিভ আরও বেশি বিস্ময়কর: মাথাটা এর বেশ লম্বা বটে, তবে তার চেয়েও অনেক বেশি লম্বা তার জিভটা, আর এটা থাকে তার মুখ বা গলায় নয়—তার বুকের একটা হঁাড়ে। এখান থেকেই তার লম্বা জিভটা বের করে বেশ খানিকটা ঢুকিয়ে দেয় সে উইয়ের ঢিবির ভেতর এবং ঐ জিভ দিয়েই উই ধরে ধরে দেয় সে মুখে পুরে।

প্রকৃতি কোন কোন জীবের জিভ এমন করে গড়েছে যে, দাঁত আর জিভ দুয়ের কাজই চলে যায় তা দিয়ে, আলাদা দাঁতের আর প্রয়োজন হয় না। পেনগুইনের সারা জিভটাই সূচল দাঁতের মত অসংখ্য কাঁটায় ভরা, সুতরাং এই জিভ দিয়ে কোন মসৃণ জীব ধরলেও রেহাই পাবার উপায় থাকে না তার। ফ্লামিনগোর কাঁটাওয়ালা জিভটা আবার ছাকনীর কাজ করে। সমুদ্রের ঘোলাটে জল মুখে তুলে নেবার পর তার খাদ্য ছাড়া আর সব কিছুই এই ছাকনী দিয়ে বাইরে পড়ে যায়। গেরস্থ-বাড়ির বাগানে যে সব সাধারণ শামুক দেখতে পাওয়া যায়, তাদের দেঁতো জিভ আবার এদের সবার জিভকে হার মানিয়ে দেয়। এই সব শামুকের জিভে থাকে ১৩৫ সারি দাঁত, এবং প্রত্যেক সারি দাঁতের সংখ্যা হচ্ছে ১০৫। সুতরাং বাগানের চারাগাছগুলি কাটতে কাটতে যখন তারা চলতে থাকে—তখন ব্যবহার করে তারা ১৪,১৭৫টি চোখা চোখা দাঁত।

আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন বর্ণ ধারণ—জীব-জগতে কম আশ্চর্যের নয়। গায়ে দাগ কাটা হরিণ-গুলির গায়ের রঙ নলখাগড়া বা রোদে ঝলসানো ঝোপের রঙের সঙ্গে এমন বেমালুম মিলে যায় যে, কাছে গেলেও অনেক সময় তাদের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। গিরগিটি ও পতঙ্গ জাতীয় অনেক জীব আবার ইচ্ছামত দেহের রঙ পালটে আত্মরক্ষা করে। সবুজ পাতার মাঝে থাকবার সময় দেখায় তাদের সবুজ, সেখান থেকে শুকনো গাছপাতা বা ঝোপের মাঝে গিয়ে হয়ে যায় তারা ধূসর। Snowshoe rabbit নামে এক রকম খরগোশ এবং dressing weasel নামে বেজি জাতীয় এক রকম জীবের গায়ের রঙ শীতকালে হয়ে যায় বরফের মত সাদা—আর গ্রীষ্মকালে হয়ে যায় মাটির মত ধূসর। Squid নামে শম্বুকজাতীয় এক রকম সামুদ্রিক জীব আছে, তার আত্ম-গোপনের কৌশল সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর। গতিশীল জলের গা দিয়ে নানা দিকে যেমন আলো-ছায়ার খেলা চলে, ধাবনশীল Squid-এর গা দিয়ে তেমনি কম্পমান আলো-ছায়ার রেখা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। গতিহীন স্থির Squidকে দেখলে মনে হয় জলের মাঝে একটা সামুদ্রিক আগাছা ভেসে রয়েছে।

এ ছাড়া water owzel নামে এক রকম ছোট জলো পাখী আছে তাদের চালচলন আরও বিস্ময়কর। এই পাখীগুলি জলো পোকামাকড় খেতে ভালবাসে। ঐ সব খেতে এরা এক ডুবে সোজা জলের নীচে নেমে তার তলদেশে হাজির হয়, তারপর সেখানকার মাটির উপর খাবারের খোঁজে হেঁটে

বেড়ায়। এর গায়ের পালক এত পুরু যে, গা তার কিছুতেই ভিজতে পারে না। আর আর পাখীরা যেমন ডানা নেড়ে আকাশে ওড়ে—owzel তার ডানা নেড়ে তেমনি জলের মাঝে ওড়ে।

প্রকৃতি বিভিন্ন জীবের দেহে যে গতিবেগ সৃষ্টি করেছে সেও কম বিস্ময়কর নয়। অল্প কাল ও দূরত্বের পাল্লায় আমরা ছুটতে পারি ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে,—রেসের ঘোড়া ছোটে ৪৫ থেকে ৫০ মাইল। সাধারণ হরিণ ছোটে ঘণ্টায় ৬০ মাইল—আর কৃষ্ণসার ছোটে ৬৫। এশিয়ার লিকলিকে চিতাবাঘ ছোটে ঘণ্টায় ৭০ মাইল। দুই মাইলের পাল্লায় ভারতীয় এক রকম পাখীর গতিবেগ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে—ঐটুকুর মাঝে গতিবেগ ওর ঘণ্টায় ২০০ মাইল। বিদেশীরা এ পাখীর নাম দিয়েছেন—Indian Swift। Duck hawk নামে বাজপাখী শিকারকে ছোঁ মারতে যে বেগে উপর থেকে নীচে নেমে আসে—সে হচ্ছে ঘণ্টায় ১৮০ মাইল। অষ্ট্রীচ অর্থাৎ উটপাখী তার উড়বার শক্তি হারিয়েছে বটে, কিন্তু দৌড়ের পাল্লায় যে সব গ্রেহাউণ্ড ছোটে, তাদের চেয়েও ঘণ্টায় ১৫ মাইল বেশি ছুটতে পারে এই পাখী।

মানুষ এ যাবৎ সব চেয়ে বেশি যে লাফ দিয়েছে তার রেকর্ড হচ্ছে—২৬ ফুট ৮¼ ইঞ্চি। ক্যাঙ্গারু এক লাফে অনায়াসে ৩০ ফুট যেতে পারে, 'গ্যাজেন' নামে হরিণ যেতে পারে ৪০ ফুট। এক লাফে এর চেয়েও বেশি যেতে পারে—জারবোওয়া (Jerboa) নামে ইঁদুরের মত এক প্রাণী—দৈর্ঘ্যে সে চার-পাঁচ ইঞ্চির বেশি নয়, কিন্তু এক লাফে যায় সে অন্তত ১৫ ফুট। অতটুকু একটা জীবের ১৫ ফুট লাফ একটা মানুষের ২০০ ফুট লাফের সমান।

আকারের বৃহত্ত্বের দিক দিয়ে তিমির সমান আর কেউ নেই। নীল রঙের তিমিগুলি দৈর্ঘ্যে হয় প্রায় ১০৮ ফুট, ওজন হয় এদের প্রায় ২৯৪,০০০ পাউণ্ড। তিমির বাচ্চাগুলিও কম নয়, আকারে জগতের সব-কিছুর বাচ্চার চেয়ে বড় ত বটেই, তা ছাড়া আকৃতির অনুপাতেও বড়; মায়ের পেট থেকে যখন বেরোয়—তখনই তার আকার থাকে তার মায়ের প্রায় অর্ধেক।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে প্রকৃতি মানুষ ছাড়াও অন্য জীবের মাঝে যে অদ্ভুত শিল্পজ্ঞান আর শক্তি দিয়েছে—তাই দেখে। বাবুইয়ের বাসা হয়ত তোমরা সবাই দেখেছ, কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময়কর হচ্ছে নিউগিনীর এক রকম পাখীর বাসা; বাসা বললে হয়ত ভুলই হবে, বলা হয় একে কুঞ্জভবন,—ইংরেজীতে যাকে বলে bower। এই পাখীর নামই হচ্ছে bower bird। মেয়ে ও পুরুষ পাখী একসঙ্গে গাছের নীচে পাতা আর ডালপালা দিয়ে সুন্দর একটা কুঞ্জভবন গড়ে তোলে। এই ঘরের উচ্চতা হয় সাধারণতঃ দুই ফুটের মত উঁচু—উপরের ছাদ শেওলা দিয়ে ছাওয়া। ঐ ঘরের সামনে থাকে শেওলা দিয়ে তৈরী একটা 'লন'— সেই লনটা সাজায় তারা নানা রকম সুন্দর ফুল আর রঙীন বেরী ফল দিয়ে। এইগুলি শুকিয়ে গেলে আবার নূতন ফলফুল চয়ন করে নিয়ে ওর জায়গায় বসিয়ে দেয়।

শ্রীরাধারাণী মিত্র

'এক', 'দুই' অক্ষর পরিচয়ের সময় তোমরা কণ্ঠস্থ কর—আটে অষ্টবসু। এই অষ্টবসু একবার দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—সঙ্গে ছিলেন তাঁদের পত্নীরা। ভ্রমণ করতে করতে তাঁরা মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সুরভি নামে বশিষ্ঠের একটি সুন্দর কামধেনু ছিল। সুরভির দুধের এমনই গুণ ছিল যে, সেই দুধ যে পান করত, সে-ই অক্ষয় যৌবন লাভ করে দশ হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারত। অষ্টবসুর মধ্যে এক বসুর নাম ছিল 'দ্যু'। সুরভিকে দেখে তাঁর পত্নীর বড় লোভ হ'ল। স্ত্রীর প্ররোচনায় 'দ্যু' গাভীটিকে হরণ করে নিজের রাজ্যে চললেন। বশিষ্ঠ সে সময় আশ্রমে ছিলেন না। ফিরে এসে তিনি আর সুরভিকে কোথাও দেখতে পান না। তখন ধ্যানাসনে বসে গাভী হরণের সকল কথা জানতে পেরে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং 'দ্যু'কে এই বলে অভিশাপ দিলেন যে, এই ভীষণ অপরাধের জন্য তাকে পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নিতে হবে। ঋষির অভিশাপ ব্যর্থ হবার নয়—'দ্যু' বসুলোক ছেড়ে মর্ত্ত্যলোকে কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর পুত্ররূপে জন্ম নিলেন।

মহারাজ শান্তনুর প্রথমা মহিষী জাহ্নবীর অষ্টম গর্ভজাত এই পুত্রই জগদ্‌বরেণ্য, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ভীষ্ম। পুত্র জন্ম লওয়ামাত্র জাহ্নবী গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতেন। একটি একটি করে সাতটি পুত্রকে জাহ্নবী গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন। পুত্রশোকে কাতর মহারাজ শান্তনু মহিষীর এই অদ্ভুত আচরণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারতেন না, কারণ বিবাহের পূর্ব্বে জাহ্নবীর কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, জাহ্নবীর কোন কাজের বিরুদ্ধে তিনি কখনও কোন

কথা বলবেন না। যেদিন তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন, সেইদিন জাহ্নবীকে তিনি হারাবেন। কিন্তু অষ্টম পুত্রটিকেও যখন জাহ্নবী গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে গেলেন, তখন শান্তনু আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "দেবী, এ তোমার কেমন আচরণ? এই শিশুটিকে তুমি হত্যা কোরো না।"

তখন জাহ্নবী বললেন, "মহারাজ, আপনার কথামত আমি এই শিশুকে বধ করব না, কিন্তু আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন—আমি এখন আর আপনার সঙ্গে বাস করতে পারি না, আমি চললাম। এই শিশুটিকে আমি সঙ্গে নিয়ে চললাম, সকল রকমে আপনার উপযুক্ত পুত্ররূপে মানুষ করে আপনার কাছে দিয়ে যাব।"

স্ত্রীর আর পুত্রের শোকে রাজা বড় কাতর হয়ে পড়লেন। রাজকার্য্যে আর মন বসে না। বসে বসে কেবল পুত্রের কথাই চিন্তা করেন। এমনি করে অনেক দিন কাটে। একদিন রাজা মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন—ঘুরতে ঘুরতে তিনি গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছলেন। জলের মাঝে এক সুন্দরী নারী মূর্ত্তি ও একটি সুদর্শন যুবককে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। যুবকটিকে নিয়ে নারী মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে জলের মধ্য হতে উঠে এলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, "মহারাজ, আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না—আমি জাহ্নবী আর এই যুবক আপনার পুত্র দেবব্রত। আমি একে যত্নের সঙ্গে পালন করেছি। এই পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং ইন্দ্রের সমান বীর—দেবাসুর সকলেরই প্রিয়। রাজধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, অর্থনীতি সকল বিষয়েই এই পুত্র দক্ষতা লাভ করেছে। আপনি একে গ্রহণ করুন, বিধিমতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।" এই কথা বলে জাহ্নবী অন্তর্হিতা হলেন।

প্রিয়দর্শন, সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেবব্রতকে ফিরে পেয়ে রাজার আনন্দের আর শেষ নেই। রাজ্যে ফিরে গিয়ে শুভক্ষণ দেখে খুব ধুমধামের সঙ্গে তিনি যুবরাজের অভিষেক করলেন। দেবব্রতের শান্ত, নম্র, অমায়িক ব্যবহারে সকলেই পরম সন্তুষ্ট। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটতে থাকে।

এইভাবে কিছুদিন যায়। দেবব্রত একদিন লক্ষ্য করলেন, মহারাজ শান্তনুর মুখে যেন আর আগের মত সে প্রসন্নতার হাসি নেই, তিনি যেন সর্ব্বদাই বিষণ্ণমনে কী চিন্তা করেন। দেবব্রত পিতার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেন আর ভাবেন যে, মহারাজার এমন কি দুঃখ যার জন্য তিনি সকল সময়ই ম্রিয়মাণ হয়ে থাকেন। সে তাঁর উপযুক্ত পুত্র, সে কি পারে না পিতার সব দুঃখ দূর করে তাঁকে শান্তি দিতে! অতঃপর একদিন দেবব্রত বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে পিতার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মন্ত্রী বললেন, "দেবব্রত, তোমার পিতা মৃগয়া করতে গিয়ে ধীবর-রাজকন্যা সত্যবতীর রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ধীবররাজ বলেন যে, মহারাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজত্ব না দিয়ে যদি সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকে রাজত্ব দিতে প্রতিশ্রুত হন, তবেই তিনি মহারাজের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। কিন্তু

তোমাকে রাজত্ব হতে বঞ্চিত করবার ভীষণ প্রতিজ্ঞা মহারাজ করতে পারলেন না। সত্যবতীকে বিবাহ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না।"

দেবব্রত পিতার দুঃখ দূর করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। তিনি নিজে সত্যবতীর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, "ধীবররাজ, আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পিতার বিবাহের ব্যবস্থা করুন। আমি দেবতার নামে শপথ করে বলছি, আজ হতে রাজসিংহাসনের ওপর সকল দাবী আমি ত্যাগ করলাম। আপনার কন্যার গর্ভজাত পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হবে।"

তরুণ যুবকের এই অদ্ভুত ত্যাগ দেখে সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু ধীবররাজ বড় চতুর, তিনি এত সহজে নিষ্কৃতি দেবার মানুষ নন। তিনি বললেন, "যুবরাজ, আপনার ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আপনি একবার যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমি জানি, প্রাণ থাকতে তা' ভঙ্গ করবেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার সন্তানেরা রাজত্বের অধিকার ছাড়বে কি না সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।"

ধীবররাজের অভিসন্ধি বুঝে পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতার সুখের জন্য আর একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন, "আমি সকলের সম্মুখে শপথ করছি, আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম পালন করব।"

ধীবররাজ দেবব্রতের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনে পরম সন্তুষ্ট হলেন এবং মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হলেন। অল্পবয়সী তরুণের এই অদ্ভুত ত্যাগ দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্বর্গ হতে দেবতারা তাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ভীষণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য তখন হতে দেবব্রত সকলের কাছে 'ভীষ্ম' নামে পরিচিত হলেন। অতঃপর ভীষ্ম সত্যবতীকে সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে গেলেন এবং পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। মহারাজ শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ত্যাগ ও অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন।

সত্যবতীর গর্ভে মহারাজ শান্তনুর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করল—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সেই যুদ্ধে নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পর বালক বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে বসিয়ে ভীষ্ম নিঃস্বার্থভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন এবং বিচিত্রবীর্য্য যাতে সকল রকমে সুশিক্ষিত হয়ে কৌরব-কুলের উপযুক্ত নৃপতি হতে পারেন, তার সুব্যবস্থা করলেন।

এইভাবে কিছুদিন যায়। বালক বিচিত্রবীর্য্য এখন তরুণ যুবক—শিক্ষায়, দীক্ষায়, অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ। ভীষ্মের ইচ্ছা হ'ল যে, এইবার বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। এই সময় কাশীরাজের তিন কন্যার স্বয়ম্বরের কথা শুনে ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে বাহুবলে তাঁদের হরণ করে আনবার জন্য কাশীরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সভা থেকে কন্যাদের বাহুবলে হরণ করে নিয়ে এসে বিবাহ করা তখনকার ক্ষত্রিয়-সমাজে বিশেষ প্রশংসার বিষয় ছিল। কাশীরাজার সভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে সম্বোধন করে ভীষ্ম বললেন, "রাজন্, আমার ভ্রাতা কুরুরাজ বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেবার উদ্দেশ্যে আমি আপনার তিন কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে নিয়ে চললাম। উপস্থিত রাজন্যবর্গের কারও যদি

শক্তি থাকে আমাকে বাধা দিন্।”—এই কথা বলে রাজার তিনটি কন্যাকে নিয়ে ভীষ্ম দ্রুতবেগে রথ চালিয়ে দিলেন। স্বয়ম্বর-সভায় যে সব রাজা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কারও পক্ষে ভীষ্মের এই উদ্ধত আচরণ সহ্য করা সম্ভব নয়। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁরা ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী ভীষ্মের সঙ্গে কেউই পেরে উঠলেন না। ভীষ্ম সকলকে পরাজিত করে রাজকন্যাদের নিয়ে এলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ইতিপুর্ব্বেই শাল্বরাজকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। এই কথা জেনে ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং অপর দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন।

এদিকে ভীষ্ম কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন এই অপরাধে শাল্বরাজ অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। নিরুপায় হয়ে অম্বা পরশুরামের শরণাপন্ন হলেন। পরশুরাম অম্বাকে নিয়ে ভীষ্মের কাছে গেলেন এবং অম্বাকে বিবাহ করতে আদেশ করলেন। কিন্তু ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন—কেমন করে তিনি পরশুরামে আদেশ পালন করবেন? আদেশ অমান্য করায় পরশুরাম ভীষ্মকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বললেন, “তুমি এই কন্যাকে বিবাহ কর, নতুবা যুদ্ধে মৃত্যু বরণ কর।”

তখন পরশুরাম ও ভীষ্মের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। দুইজনেই সমান বীর—কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারেন না। অবশেষে ভীষ্মের পরাক্রম ও অস্ত্রচালন-কৌশলে মুগ্ধ হয়ে পরশুরাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং অম্বাকে সম্বোধন করে বললেন, “বৎসে, তোমার ভাগ্য বিরূপ। সূর্য্যের তেজ নিঃশেষ হতে পারে, চন্দ্রের শীতলতা হ্রাস পেতে পারে, অগ্নির দাহিকা শক্তি লোপ পেতে পারে, তবুও ভীষ্মের অটল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে পারে না।”

বার বার প্রত্যাখ্যানের অপমান নীরবে সহ্য করা অম্বার পক্ষে কঠিন—অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন এবং ভীষ্মকে সম্বোধন করে বললেন, “মহাত্মন্, আপনি আমাকে হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন, সেইজন্য আমার এই ভাগ্য-বিড়ম্বনা। এখন মৃত্যু ছাড়া আমার অন্য উপায় নাই। আমি মরবার সময় আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি—ইহজন্মে আপনার জন্য আমাকে যেমন মৃত্যু বরণ করতে হ’ল, পরজন্মে আমিই সেইরূপ আপনার মৃত্যুর কারণ হয়ে জন্ম নেব।”

এই অভিশাপ দিয়ে অম্বা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। এই অম্বাই পরজন্মে দ্রুপদ-রাজপুত্র শিখণ্ডী রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কালের চাকা অবিরাম গতিতে ঘুরে চলেছে। সেই গতির তালে তালে নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে মানুষের জীবন-প্রবাহ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে চলেছে কুরুবংশের ইতিহাসের একটির পর একটি অধ্যায়। বহুদিন কেটে গেছে। ভীষ্ম বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শক্তি, পরাক্রম, মনোবল আজও তেমনি অটুট আছে, তাঁর বিবেক বুদ্ধি আজও আছে তেমনি উজ্জ্বল। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ ধৃতরাষ্ট্রই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী, কিন্তু তিনি ছিলেন জন্মান্ধ, সেইজন্য তাঁর ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র কৌরব এবং পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র পাণ্ডব

নামে পরিচিত। এই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণনায় মহাভারতের এক বিশাল অংশ রচিত হয়েছে। পাণ্ডবেরা ছিলেন সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্ম্মিক আর ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন ছিলেন ক্রূর, ঐশ্বর্য্যলিপ্সু ও পাপাচারী। পাণ্ডুরাজ দেহত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন। তখন হস্তিনাপুরের রাজত্ব নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে লেগে গেল বিষম বাক্-বিতণ্ডা। ন্যায়ত দুই পক্ষেরই সমান অধিকার, কিন্তু কপটাচারী দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের এক কেশাগ্র ভূমিও দিতে সম্মত হলেন না। এহেন অবস্থায় যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল—কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ। ধীমান, ধর্ম্মপরায়ণ পিতামহ ভীষ্ম এই গৃহবিবাদকে কোন রকমেই সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন, এই অন্যায় যুদ্ধে অধর্ম্মাচারী কৌরবপক্ষের পতন অনিবার্য্য। দুর্য্যোধনকে তিনি নানাভাবে বুঝাবার চেষ্টা করলেন এবং ন্যায়তঃ রাজ্যের অর্দ্ধেক ভাগ পাণ্ডবদের দিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু 'চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' যে ছলে বলে কৌশলে অপরের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত, তার কাছে ধর্ম্ম উপদেশের কোনই মূল্য নেই। ভীষ্মের সকল হিতোপদেশই ব্যর্থ হ'ল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সুরু হ'ল—দুন্দুভি, দামামা, ভেরীর শব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল।

কলিঙ্গ, দ্বারকা, পাঞ্চাল প্রভৃতি সকল রাজ্যের রাজন্যবর্গই এই যুদ্ধে কোন না কোন পক্ষে যোগ দিলেন। দ্বারকারাজ শ্রীকৃষ্ণ নিজের সমস্ত নারায়ণী সেনাকে কৌরবপক্ষের সহায়তায় দিয়ে, নিজে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দান করেন। পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের সময় শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, এই যুদ্ধে তিনি সারথিরূপে অর্জ্জুনের রথ চালনা করবেন, কিন্তু নিজে কখনও অস্ত্র ধারণ করবেন না। আর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এই যুদ্ধে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাবেনই। মহাপ্রতাপশালী ভীষ্ম দশ দিন ধরে যুদ্ধ করার ও প্রতিদিন দশ সহস্র রথীকে বধ করায় প্রতিশ্রুতি নিয়ে কৌরবপক্ষের সেনাপতিরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ভীষ্ম ও অর্জ্জুন—দুই পক্ষের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বীর। দুইজনেই সমান যোদ্ধা, সমান অস্ত্রকৌশলী, কেউ কাউকেই পরাজিত করতে পারেন না। বাণে বাণে চারিদিক আচ্ছন্ন, দৃষ্টি চলে না, দেহ ক্ষতবিক্ষত, তবুও কেউ কারু কাছে নতি স্বীকার করেন না। এইভাবে সপ্তম দিন অতিবাহিত হ'ল। অষ্টম দিনে অর্জ্জুন আর কিছুতেই ভীষ্মের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না, তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত, দুর্ব্বল দেহ যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চায়। প্রিয় সখার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। লাফ দিয়ে রথ থেকে নেমে পড়লেন এবং সামনে অন্য কিছু না পেয়ে রথের চাকা নিয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে গেলেন। কিন্তু ভীষ্ম ধীর, স্থির, অচঞ্চল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের অবতার জেনে মন-প্রাণ দিয়ে ভক্তি করতেন। তিনি হাতের ধনুক-বাণ নামিয়ে রেখে স্মিত হাস্যে বললেন, "দ্বারকানাথ, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাবই, আজ আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। এখন তুমি ইচ্ছা হয়, আমায় বধ কর। তোমার হাতে প্রাণ দেব সে আমার পরম সৌভাগ্য।"

প্রিয় ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে না পারলে, কৌরবপক্ষকে ধ্বংস করা অসম্ভব। অথচ কেমন করেই বা এই মহারথীকে পরাস্ত করা যায়! অর্জ্জুনের মত মহাবীরও কোন রকমেই তাঁকে পরাজিত করতে পারছেন না। পাণ্ডবেরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা চললেন তাঁদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরামর্শ নিতে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ভীষ্মের পিতা তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়েছেন। তিনি নিজে ইচ্ছা না করলে তাঁকে কেউ বিনাশ করতে পারবে না। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মৃত্যু-রহস্য জেনে এসো।"

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত পাণ্ডবেরা ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম তাঁদের আদর অভ্যর্থনা করে বসালেন। যদিও তিনি বিপক্ষদলের সেনাপতি, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে তিনি পিতামহ এবং পাণ্ডবেরা তাঁর পৌত্র—সেখানে স্নেহ-ভালবাসার কোন কার্পণ্য নেই। আলাপ-আলোচনায় ভীষ্ম জানতে পারলেন যে, পঞ্চপাণ্ডব তাঁর মৃত্যু-রহস্য জানবার জন্য তাঁর কাছে এসেছেন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরের দিন দশম দিন—তাঁর যুদ্ধের শেষ দিন। গোপন রহস্য না জানলে তো শত্রুপক্ষ তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীকচেতা ভীষ্ম সহাস্যবদনে বিপক্ষ পাণ্ডবগণের কাছে আপন মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করলেন, "হে পাণ্ডব, আমি স্ত্রী-জাতি বা স্ত্রীলোকের নামধারী কোন পুরুষের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করি না। কাশীরাজকন্যা অম্বা দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে সম্মুখে রেখে অর্জ্জুন যদি পিছন হতে আমাকে শর নিক্ষেপ করে, আমি শিখণ্ডীকে স্ত্রীলোক জ্ঞানে তাঁর সম্মুখে অস্ত্রধারণ করতে পারব না। নিরস্ত্র হয়ে অস্ত্রধারী অর্জ্জুনের হাতে আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।"—ভাবতে পার তোমরা, দেশের মঙ্গলের জন্য, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য এ কী অদ্ভুত আত্মত্যাগ, এ কী আশ্চর্য্য নির্ভীকতা!

পরের দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রণাঙ্গনে বেজে উঠল দুন্দুভি—যুদ্ধার্থে দুই পক্ষ আবার এগিয়ে এল। আবার সুরু হ'ল অসির ঝনঝনানি, ধনুকের টঙ্কার, ভেরীর নিনাদ। ভীষ্মের রথ এসে রণাঙ্গনে প্রবেশ করল। ভিতরে উপবিষ্ট মহারথী, সৌম্যমূর্ত্তি ভীষ্ম—মুখে তাঁর স্মিত হাসি, শঙ্কালেশহীন চোখের উদার দৃষ্টি, বিষণ্ণতার কোন ছায়া কোথাও নেই। রথীর নির্দ্দেশে সারথি চারিপাশের বাধা কাটিয়ে রণভূমির মধ্যস্থলে এগিয়ে চলল—পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জ্জুনের রথের সামনে এসে রথ থামল। আপনার অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা জেনেও ভীষ্ম যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, কিন্তু অর্জ্জুনের আজ আর কোন উৎসাহ নেই, শর নিক্ষেপ করতে গিয়ে হাত যে তাঁর আপনা হতেই অবশ হয়ে আসে। যে পিতামহ শৈশব হতে পিতৃতুল্য স্নেহে যত্নের সঙ্গে পালন করেছেন, যাঁর স্নেহ-ভালবাসা পাণ্ডবদের কোনদিন পিতার অভাব অনুভব করতে দেয়নি, আজ তাঁকে অর্জ্জুন কপটযুদ্ধে কেমন করে বধ করবেন!

অর্জ্জুনের এই অবসন্নতা লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উত্তেজিত করতে লাগলেন, "পার্থ, একাজ

তোমাকে করতে হবেই। তোমার হাতে ভীষ্মের মৃত্যু বিধির বিধান—তা' কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। অতএব তুমি শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে প্রস্তুত হও।"

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সামনে বসিয়ে ভীষ্মকে লক্ষ্য করে পিছন হতে বাণ ছুঁড়লেন। শিখণ্ডীকে সামনে দেখে ভীষ্ম নিরস্ত্র হয়ে হেঁটমুখে নীরবে বসে রইলেন এবং সময় আসন্ন জেনে একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন। একটির পর একটি তীর এসে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিল—রক্তের ধারা বয়ে চলল, ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে তাঁর দেহ রথের উপর হতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ তীরবিদ্ধ হওয়ায় দেহ ভূমি স্পর্শ করল না—ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হলেন। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি উভয়পক্ষীয় যোদ্ধবৃন্দ যুদ্ধ ছেড়ে ভীষ্মের পাশে ছুটে এলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন—মাথাটি পিছন দিকে লুটিয়ে পড়েছে। মাথাটিকে সোজা করে তুলে দেবার জন্য দুর্য্যোধন তাড়াতাড়ি একটি কোমল উপাধান নিয়ে এলেন। কিন্তু পিতামহের তা পছন্দ হ'ল না। তিনি অর্জ্জুনের দিকে তাকালেন—বীর বীরের ইঙ্গিত বুঝলেন। অর্জ্জুন ভীষ্মের মাথায় তিনটি তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে মাটিতে লুটিয়ে পড়া মাথাটি উঁচু ক'রে তুলে দিলেন। সারা দেহ বাণবিদ্ধ—অসহ্য যন্ত্রণায় ভীষ্মের কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠেছে—তিনি পান করবার ঠাণ্ডা জল চাইলেন। শিবির হতে সোনার ঝারি করে দুর্য্যোধন সুগন্ধি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন। কিন্তু সে জল ফিরিয়ে দিয়ে ভীষ্ম অর্জ্জুনকে বললেন, "বৎস, আমি তৃষ্ণার্ত্ত, পবিত্র জল পান করিয়ে তুমি আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর।"

অর্জ্জুন মাটি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। দেখতে দেখতে মাটির ভিতর হতে পবিত্র শীতল জলধারা বেরিয়ে এসে ভীষ্মের মুখের মধ্যে পড়তে লাগল—আকণ্ঠ পান করে ভীষ্ম তৃপ্ত হলেন।

ভীষ্ম যে সময় শরশয্যা গ্রহণ করেছিলেন তখন সূর্য্যের দক্ষিণায়ন। শাস্ত্র অনুযায়ী এই সময় দেহত্যাগের উপযুক্ত সময় নয়। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম সেই জন্য এসময় দেহত্যাগের ইচ্ছা করলেন না। সূর্য্যের উত্তরায়ণের অপেক্ষায় তিনি দীর্ঘ ছয়মাস কাল বাণে জর্জ্জরিত হয়ে শরশয্যায় শুয়ে রইলেন। সামান্য একটা ছুঁচ যদি আমাদের আঙ্গুলের ডগায় ফুটে যায়, আমরা চম্‌কে উঠি—ভীষ্মের এই অপরিসীম সহিষ্ণুতা আমাদের কল্পনারও অতীত।

ইতিমধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হ'ল। অধর্ম্মাচারী কুরুবংশকে ধ্বংস করে ধর্ম্মাচারী পাণ্ডবেরা রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। ধার্ম্মিক-প্রবর ভীষ্ম দুর্য্যোধনাদি কৌরবদের পাপাচার কোন দিনই সমর্থন করতে পারেননি। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ পাণ্ডবদের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। পাণ্ডবদের জয়ে তিনি সত্যিই পরম আনন্দিত হন এবং শরশয্যায় শয়ন করে যুধিষ্ঠিরকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ইত্যাদি নানা মহত্বপূর্ণ বিষয়ে উপদেশ দান করেন। যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "বৎস, কখনও সত্যের অমর্য্যাদা কোরো না। ধর্ম্মকে আশ্রয় করে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে নিজের কর্ত্তব্য কাজ করে যেও। পরম সৌভাগ্য বলে শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা বন্ধুরূপে

পেয়েছ। এঁকে সামান্য জ্ঞান কোরো না। ভগবান নারায়ণ সাধুদের রক্ষা ও দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে এসেছেন। এঁর কল্যাণে তোমাদের সকল অমঙ্গল দূর হবে।”

এই কথা বলে ভীষ্ম ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। ভীষ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণের এই স্তুতি ‘বিষ্ণুসহস্র নাম’ নামে পরিচিত। ভক্তমনের সরল ভক্তির সুন্দর নিদর্শন এই ‘বিষ্ণুসহস্র নাম’। এইভাবে ধর্ম্ম আলোচনায় ও ভগবৎ কথায় ছয়মাস কেটে গেল। সূর্য্যের উত্তরায়ণ দেখে ভীষ্ম দেহত্যাগের ইচ্ছা করলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণ ধ্যান করতে করতে এবং তাঁর নাম করতে করতে ভীষ্ম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে তাঁর প্রাণবায়ু বার হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ হতে একটি করে সকল তীর আপনা হতে খসে পড়ল—মহারথী ভীষ্মের অক্ষত অম্লান প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বসুলোক হতে সুন্দর সুসজ্জিত রথ নেমে এল। সেই রথে করে ভীষ্ম ফিরে চললেন বসুলোকে—যাবার সময় পৃথিবীতে রেখে গেলেন নির্ম্মল নিষ্পাপ অনুকরণীয় দৃঢ় চরিত্র। ভীষ্মের ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতাকে পরিপূর্ণতা দান করে জীবনকে মহিমময় করে গড়ে তুলেছে তাঁর ভগবদ্‌ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা। এই ভগবদ্‌ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠাই তাঁর চরিত্রের মেরুদণ্ড।

আমার কিশোর-কিশোরী ভাইবোনেরা—তোমাদের সামনে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র, ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, দেশ তোমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। তোমরা নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোল। তোমাদের আধ-ফোটা কুঁড়ির মত জীবনকে ফুটন্ত সুগন্ধি ফুলের মত ফুটিয়ে তোল। তার জন্য তোমাদের প্রয়োজন উজ্জ্বল জীবন্ত দৃষ্টান্তের। আজ যাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমাদের দিলাম সেই মহান চরিত্র হতে তোমাদের চলার পথে তোমরা পাবে উৎসাহ, পাবে অনুপ্রেরণা। একটা কথা তোমরা মনে রেখো—শুধু কাজ করে গেলেই মানুষের মত মানুষ হওয়া যায় না, তার জন্য চাই দৃঢ় সংকল্প, চাই ত্যাগ, চাই সহিষ্ণুতা—সর্ব্বোপরি চাই সত্যনিষ্ঠা এবং ভগবদ্‌ভক্তি। দেহভরা সাহস নিয়ে তোমরা এগিয়ে চল, আর বিশ্বকবির সুরে সুর মিলিয়ে পরমেশ্বরের কাছে অন্তর ভরে প্রার্থনা কর—

“বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি।
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি ॥
... ...
তব কাজ শিরে বহিতে সংসার তাপ সহিতে।
তব কোলাহলে রহিতে নীরবে করিতে ভকতি ॥”

—তোমাদের জীবন ঘিরে পরিপূর্ণ সার্থকতা নেমে আসবেই।

জীবন স্বপ্ন
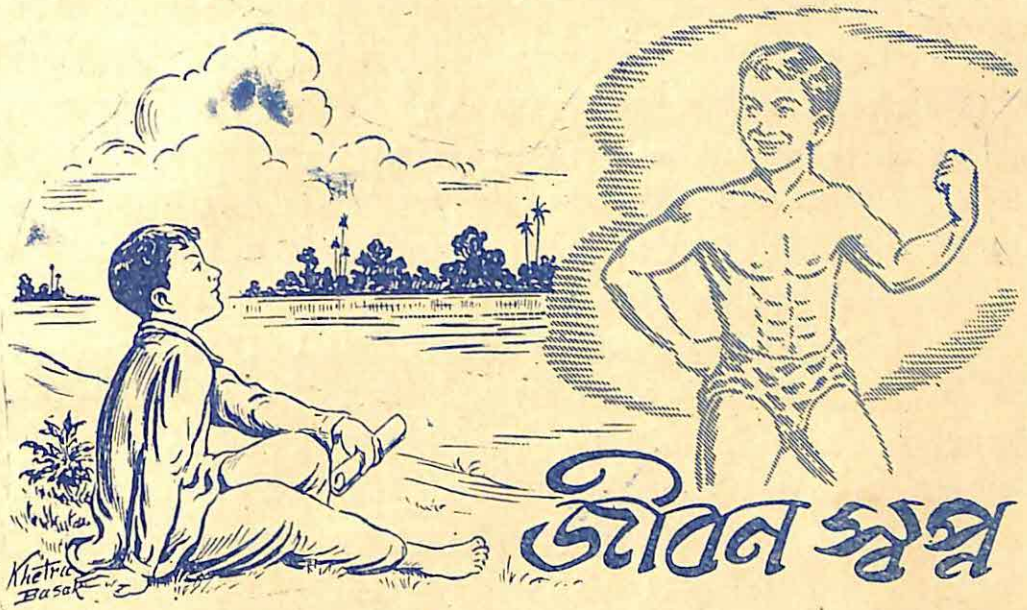
শ্রীমনতোষ রায়

বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর নদীর কিনারায় বসে স্বপ্ন দেখে গ্রাম্য কিশোর, হাতে একখানা ছবি—কলিকাতার কোন এক ব্যায়াম-বীরের।···ছোট্ট কিশোর স্বপ্ন দেখে—এমনি সুন্দর পুষ্ট দেহ আমার যদি হয়! নিশ্চয়ই হবে, বড় হ'ব, খুব ভাল স্বাস্থ্য তৈরী করব। এত ভাল স্বাস্থ্য যদি করা যায় যে, সারা দেশের মধ্যে আমিই হ'ব শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম-বীর, কত নাম হবে, কত দেশে যাব! ভগবান কি আমার এ আশা পূর্ণ করবেন ?

সে প্রার্থনার মধ্যে ছিল ঐকান্তিকতা, অন্তরে ছিল অদম্য প্রেরণা, স্থির বিশ্বাস আর অটল ধৈর্য্য। তাই বোধ হয় ভগবান একেবারে বিমুখ করেন নি।

ব্যায়াম করে ভাল স্বাস্থ্য করব এই সঙ্কল্প নিয়ে কলিকাতায় যখন এলাম, তখন আমার বয়স বোধ হয় তের-চৌদ্দ বৎসর। অন্তরে যার থাকে একাগ্রতা আর নিষ্ঠা, ভগবান তার সহায় হন ; তাই উপযুক্ত গুরুর সন্ধানও ঠিক সময়ে পেলাম। ব্যায়ামাচার্য্য শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুচরণ ঘোষের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তখন থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে সুরু করলাম। ধনীর ঘরের সন্তান ছিলাম না ; তাই দুধ, ঘি, বাদাম, পেস্তার পরিবর্ত্তে গুরুদেবের আদেশানুযায়ী প্রচুর শাকসব্জী, ফেনভাত খেতে লাগলাম পরিতৃপ্তি সহকারে, শরীরও ভাল হতে লাগল আশ্চর্য্যরকমে। একটা জিনিস তাই আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং প্রত্যেককেই বলি, যে খাদ্যের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় বা পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়া যায়, সেই খাদ্যেই শরীরের পুষ্টি হয় সবচেয়ে বেশী।

দীর্ঘ কয়েক বৎসর একাগ্র সাধনার পর গুরুদেবের সহায়তায় এগিয়ে এলাম প্রতিযোগিতার

ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের নানান জায়গায় জয়লাভের পর নিজেকে তৈরী করতে লাগলাম সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্য। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমার শৈশবের স্বপ্ন বুঝি সার্থক হয়ে উঠল। অমরাবতীতে চরম সাফল্যলাভে ভারতের শ্রেষ্ঠ দেহীর সম্মান লাভ করে যুক্তকরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম।

তারপর নিজেকে তৈরী করতে লাগলাম আরও ভাল করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এমন সুযোগ এল না যাতে বিদেশ গিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারি বৈদেশিকদের সাথে। এতদিন পরে সে সুযোগও এল—ভগবান্ আবার মুখ তুলে চাইলেন।

৩০শে জুলাই সংবাদ পেলাম, বিশ্বদেহ-প্রতিযোগিতা 'Mr. UNIVERSE' অনুষ্ঠিত হবে লণ্ডনে এবং যোগদান করার শেষ তারিখ ১লা আগষ্ট। মাত্র দু'দিন সময়। অতি সত্বর জরুরী টেলিগ্রামে আমার Entry fee পাঠিয়ে দিলাম এবং ওই দিনই প্লেনে লোক মারফৎ আমার চারখানা বড় ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার তারিখ জানতাম ২৯শে আগষ্ট।

ওই অল্পদিনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নূতন করে ব্যায়াম সুরু করলাম—শরীরেরও আশাতীত উন্নতি দেখে মনের বাঁধন শক্ত করলাম। রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকালে ১ ঘণ্টা ও বৈকালে ২ ঘণ্টা ব্যায়াম করতাম। দীর্ঘ সময় পরিশ্রমের জন্য আহারের তালিকাও পরিবর্ত্তন করতে হয়েছিল।

হাতে একটুও বেশী সময় পাইনি। ৩০শে জুলাই সংবাদ পেলাম, আর ২৫শে আগষ্ট বেলা ১২টায় 'Mr. UNIVERSE' প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্য দমদম বিমান-ঘাঁটির দিকে রওনা হলাম। বিমান-ঘাঁটিতে অগণিত নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিদায়-অভিনন্দন আমাকে যে ভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জানিয়েছিল, তাতে শুধু ভেবেছিলাম, দেশের জনগণের কাছ থেকে যে আশীর্ব্বাদ পাওনা ছিল আজ তা পাচ্ছি অকুণ্ঠিত ভাবে; শুধু মাতৃভূমির সেবকের যতটুকু আশীর্ব্বাদ ভগবানের কাছ থেকে পাওনা রইল তা থেকে যেন না বঞ্চিত হই। যারা আজ হাসিমুখে আমায় বিদায় দিতে এসেছে, এমনি করেই যেন তাদের হাসির বন্যা আবার আমায় গ্রহণ করে তাদের মাঝে, আনন্দের প্লাবনে যেন হৃদয় আমার এমনি করেই ভেসে যায়।

যাবার পথে করাচী, ডাবহাম, দামাস্কাস্, রোম, আমষ্টারডাম, আর সেখান থেকে লণ্ডনে গিয়ে পৌছুলাম ২৬ তারিখে রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে।...

লণ্ডন! আমার শৈশবের স্বপ্ন—যৌবনের সঙ্কল্প আজ বুঝি বাস্তবে রূপ পেয়েছে। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। গেলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে ২৭নং Stow Street W. C. I. জানা ছিল না National Body Builders' Associationএর সেক্রেটারীর বাড়ী কোথায়। গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। রাত তখন সাড়ে ১১টা। এত রাত্রে সাধারণতঃ কোন হোটেল খোলা পাওয়া যায় না। ট্যাক্সি-ওয়ালা ভদ্রলোক যথেষ্ট সাহায্য করলেন। অত রাত্রে একটি Hotelএ নিয়ে গেলেন—নাম National Hotel. দেখলাম অভ্যাগতদের আদর-যত্নের কোন ত্রুটিই তাঁরা রাখেন না, তবে মাথা ফাটালেও অত রাত্রে লণ্ডনে কোন হোটেলেই থাবার পাওয়া যায় না, তা যত বড় হোটেলই হোক না কেন!

ঘুম থেকে উঠেই প্রচুর ব্রেকফাষ্ট করে অফিসে গেলাম। তাঁদের আদর-আপ্যায়ন, আচার-ব্যবহার আমার চোখে নূতন করে ফুটে উঠল সুন্দর ভাবে। ভাবলাম, কত সত্বর এঁরা পরকে আপন করে নিতে পারে। গিয়ে দেখি আমার স্বদেশীয় আর এক প্রতিযোগী অপেক্ষা করছেন, শ্রীমনোহর আইচ। তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। অফিসে সন্ধান নিয়ে জানলাম, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও অন্যান্য পরিচালকবর্গ দুপুরের আগে আসবেন না। আনুষঙ্গিক কাজ, আমার প্রতিযোগিতার ক্রমিক নম্বর ইত্যাদি নিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আমার ধারণা ছিল, প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে ২৯শে আগষ্ট, কিন্তু শুনলাম, তা ভুল; আরম্ভ হবে ১লা সেপ্টেম্বর, এবং সকালে ও বিকালে দু'বেলাই প্রতিযোগিতা হবে। ভাবলাম—যাক, হাতে তবু দু'দিন সময় পাওয়া গেল।

প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ আমাদের Imperial Hotelএ থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমরা পরদিনই ওই হোটেলে চলে আসি। দেখলাম বেশ সুরুচিপূর্ণ স্থান। রেডিও, ফোন, পাখা, আলো, কার্পেট, প্রচুর আসবাবপত্র, দুগ্ধফেননিভ শয্যা—কোন কিছুরই সামান্যতম অভাব-টুকুও নেই। ২৯ তারিখের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশের প্রতিযোগীরা এসে গেলেন।

৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যায় Russle Squareএ Royal Hotelএ সমস্ত প্রতিযোগী ও বিচারকদের নিয়ে এক Dinner Party দেওয়া হচ্ছে। সেখানে আমাদের পর দিনের ছাড়পত্র, মেরিট সার্টিফিকেট ও ব্রিটিশ ফেষ্টিভেলের মেডেল দেওয়া হ'ল। সেখানে অন্যান্য প্রতিযোগীদের পরিচ্ছদ ও বেশভূষা দেখে বেশ দমে গেলাম। তাঁরা যে আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলেন, তাও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। মনে মনে বললাম, ভগবান, যেন দেশের মান রাখতে পারি। সেদিন রাত্রে গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে বিগত ১৩ বৎসরের ইতিহাস স্মরণ করছিলাম আর প্রার্থনা করলাম—ভগবান, যেন ন্যায় বিচার পাই।

১লা সেপ্টেম্বর। সকাল ৭টায় প্রতিযোগিতা হবে। ঘুম থেকে ৫-৩০ মিনিটে উঠে স্নান করে নিলাম। কিছু খেয়ে ভগবানের নাম নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি প্রবেশপত্রের যথেষ্ট কড়াকড়ি ব্যবস্থা। ভেতরে দেখলাম আমাদের Dress roomএর ব্যবস্থা হয়েছে মাটির তিনতলার নীচে।

সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ জন প্রতিযোগী ছিলেন। তিনটি Groupএ বিভক্ত করা হয়েছিল, ৫'-৬", ৫'-৬"—৫'-৯" এবং ৫'-৯"এর উপরে। আমাদের Groupএ ২৪ জন প্রতিযোগী ছিলেন; তার মধ্যে Jersey-এর Merllo, Spainএর Billord এবং স্বদেশীয় আইচ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিভাগে Spainএর Marllo, Franceএর Mario, Spainএর Serrera বিখ্যাত আর Tall Groupএ Reg Park, Joe Wedder এঁরা ত বিশ্ববিখ্যাত।

বিচারকের সংখ্যা ছিল সর্ব্বশুদ্ধ ৭ জন। বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞ ব্যায়ামবীরগণ কর্ত্তৃক বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই গর্ব্ব বোধ করবে যে, সেই

আন্তর্জ্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে আমার গুরুদেব শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ ও বিচারক নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

আমাদের দলের সর্ব্বপ্রথম call হ'ল। আমরা ২৪ জন গিয়ে দাঁড়ালাম। সকলের স্ফীত দেহের আকৃতি দেখে যতটা সাহস হারিয়েছিলাম, ততটা ফিরে পেলাম বিচারকদের কর্ম্মকুশলতা দেখে। প্রথমে আমাদের দেহের গাত্রচর্ম্মের মসৃণতা, দাঁড়াবার ও চলবার ভঙ্গিমা দেখা হ'ল। তারপর প্রত্যেককে চারটে করে ভঙ্গিমা (Pose) দেখাতে হয়। আমার ক্রমিক সংখ্যা ছিল সর্ব্বশেষে। তাই একমনে লক্ষ্য করছিলাম। নূতন ভঙ্গীতে চারটে Mythological Pose দিলাম, এবং সমগ্র জনমণ্ডলীর প্রচণ্ড হাততালির শব্দে এবং উৎসাহের আধিক্যে মনে হ'ল সে Pose সেখানে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। তারপর দেখাতে হ'ল দেহের 'এজিলিটি'। আমি দেখালাম যোগাসন ও পেশীসঞ্চালন—যা হ'ল একেবারে আমার নিজস্ব আর তাদের দেশের কল্পনা। আমার Show দেখে দর্শকদের এত উৎসাহ-উদ্দীপনা হতে পারে এ ধারণা তার আগে আমার ছিল না। আমার Show হয়ে যাবার পর, যারা আমায় দেখে হেসেছিল, তারা সকলে এগিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে—"How strange you Roy! এ জিনিস তুমি কিছু আমাদের শিখিয়ে যাও।"

সেদিন শুধু ভগবানের অপার করুণার কথা ভেবেছি। মনে হয়েছে, এত সম্মান জীবনে কখনও পাই নি, আজ তাঁর দয়ায় পৃথিবীর কত শ্রেষ্ঠ দেহী যে সম্মানের ভার আমার মাথায় পরিয়ে দিচ্ছেন, তাকে যেন বহন করে যেতে পারি।

তখন ফলাফল একরূপ নির্দ্ধারিত হয়ে গেলেও আমি কিছু জানতে পারিনি। তাই মনে একটা দুর্ভাবনা ছিল। হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়লাম, কিছু খেতে পারলাম না।

তারপর আবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল বিকেলে। এবারেও সকালের মতই প্রতিযোগিতা হ'ল। কতকগুলি নূতন Poseএ নূতন ধরনের পেশীসঞ্চালন সকলের উৎসাহ ও হাততালির মধ্যে দেখালাম। জানলাম, এই প্রতিযোগিতায় যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাবে তাকে ১০ মিনিটের জন্য strong feats দেখাবার জন্য special order দেওয়া হবে। একমাত্র আমিই সর্ব্বপ্রথম এই সুযোগ পাই। আমি তীক্ষ্ণ বর্শার ফলা গলায় দিয়ে লোহার রড বেঁকা করলাম। চারদিক থেকে বিরাট হর্ষধ্বনি আমাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল কয়েক সেকেণ্ড।

এর আগে আমাদের প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নিজের নিজের দেশের পতাকা উত্তোলন করতে হয়েছিল। তখন আমার মনে বিরাট উত্তেজনা আর ভাবনা—কি হবে জানি না। মনে মনে বললাম, ভগবান, যেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ফিরতে পারি।

এরপর call আরম্ভ হ'ল Ist., 2nd., 3rd. হিসাবে। প্রথম যখন ডাক পড়ল মনতোষ রায় ইণ্ডিয়া ফার্ষ্ট, তখন উত্তেজনার প্রাবল্যে হতবাক হলাম মুহূর্ত্তকাল। বিরাট হর্ষধ্বনি, করতালি, উৎসাহের বন্যা আমায় তাড়িয়ে নিয়ে গেল। চারদিক থেকে ফটো তোলার ধুম। দ্বিতীয় হলেন আমারই

স্বদেশের শ্রীমনোহর আইচ। নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। আমাকে গ্রিমিকের একটি statue pose উপহার দিয়ে উপাধি দেওয়া হ'ল Mr. UNIVERSE Class III. 5'6", আর Mr. UNIVERSE উপাধি পেল Reg Park।

একটা কথা, প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি নম্বর পেতে আমিই সমর্থ হয়েছিলাম। আমার mark ছিল ৪০০এর মধ্যে ৩৮৪২, রেগ পার্কের ৩৮১, এবং যিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন তাঁর নম্বর ছিল ৩৮৩৪। তারপর আবার নূতন করে pose, পেশী সঞ্চালন দেখে সমগ্র বিচারক-মণ্ডলী ও দর্শকগণ কয়েক মিনিটের জন্য হতবাক হয়েছিলেন। সে show এত ভাল হয়েছিল যে, আমিও আগে কল্পনা করতে পারিনি, এত ভাল হবে বলে। বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বিচারকগণ, জো ওয়েডার—এঁরা আমায় বহু প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। মিঃ ওয়েডার আমায় নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে বললেন, "তুমিই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলে", এবং আগামী নবেম্বরে আমেরিকায় গিয়ে show দেবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন।

প্রতিযোগিতা শেষ হতে রাত্রি ১০-৩০ হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ফিরতে রাত ১টা হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য নরনারীর autograph নেবার আবদার পূরণ করতে।

তারপর ভারতের হাইকমিশনার শ্রী কৃষ্ণ মেননের আমন্ত্রণে India Houseএ Show দিই। সেখানে বহু ভারতীয় ও স্থানীয় বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন। এরপর Paris, Switzerland, Berlin, Amsterdam প্রভৃতি বহু জায়গা থেকে Show দেবার জন্য আমন্ত্রণ পাই। একমাত্র Berlin ছাড়া সব জায়গাতেই Show দিই। প্রত্যেক জায়গায় প্রচুর উৎসাহ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছি। India Houseএ Show দেবার সময় President ভাষণে বলেছিলেন—"ভারত আজ এ সম্মান প্রথম পেল।"

এর পর বিদায় নিয়ে প্লেনে উঠলাম।

স্বদেশে ফিরে দমদম বিমান-ঘাঁটিতে অবস্থিত অগণিত জনগণের বিপুল আনন্দ-কল্লোল শুধু বহুদিনের একটা কথা মনে করিয়ে দিলে—সেই অখ্যাত পল্লীর নদীর কিনারায় বসা কিশোরের প্রার্থনার মধ্যে যে আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল, তাতেই ভগবান তার শৈশবের স্বপ্নকে জয়ের আশীর্ব্বাদ দিয়ে সার্থক করে তুললেন!

বীর বালক হরিশ্চন্দ্র দেব

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[সম্রাট্ আকবর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মোগল বাহিনীর সাহায্যে পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার কত সুখ্যাতি ও যশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যে বীর বালক রাজা কেবলমাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়সে একাকী অগণিত মুসলমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া কান্যকু'ব্জর প্রাচীন দুর্গ-শীর্ষে গাঃঢ়বাল রাজকেতন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, সেই হরিশ্চন্দ্র দেবের চিরস্মরণীয় নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। আমরা এখানে সেই বীর বালক হরিশ্চন্দ্র দেবের বীরত্ব-কাহিনীই প্রকাশ করিলাম।]

: আমি কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করবো না। আমার দেশের স্বাধীনতা আমি আমার রক্ত দিয়ে রক্ষা করবো। দিল্লীর বাদশাহের এ প্রস্তাব আমি কিছুতেই মেনে নেবো না।

কান্যকুব্জের রাজসভায়—বিচক্ষণ মন্ত্রী, বীর যোদ্ধা সেনাপতি, সভাসদ ও সর্দ্দারগণের সম্মুখে সপ্তদশবর্ষীয় বালক, কান্যকুব্জের রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন : এমন অসম্ভব কথা বলবেন না মহারাজ! পঙ্গপালের ন্যায় অগণিত মুসলমান সেনা উত্তর ভারত ছেয়ে ফেলেছে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়। জয়লাভ অসম্ভব। দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

: কেন উচিত নয়!.. গর্জ্জিয়া উঠিলেন কিশোর নৃপতি হরিশ্চন্দ্র। বলিলেন : বলুন কেন উচিত নয়?

মন্ত্রী বলিলেন : সমুদ্রতরঙ্গের মত মুসলমান সেনা দলে দলে ছুটে আসছে ভৈরব মন্ত্রে, উত্তর ভারত গ্রাস করবার জন্য, কি সাধ্য আছে আমাদের তাদের গতি রোধ করতে পারি? সৈন্য কোথায়? অস্ত্র কোথায়? অর্থবল কোথায়? মহম্মদ বিন্ সাম যে সন্ধির প্রস্তাব করেছেন, সেই প্রস্তাব মেনে নিন।

সভাস্থ সকলে—এমন কি সেনাপতি বীরসিংহ পর্য্যন্ত বলিলেন : এ অতি সঙ্গত প্রস্তাব! মহারাজ, সন্ধি করুন। রাজ্য রক্ষা হউক, দেশে শান্তি আসুক। প্রজার জীবন হউক নিরাপদ।

তরুণ রাজা সগৌরবে উন্নত মস্তকে সকলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন : না না সে হবে না, হতে পারে না।—

বিদ্যুৎঝলকের মত তাঁহার চমকিত চাহনি ও বীর বাণীতে সকলে চমকিত হইয়া উঠিল। সুগৌর-কান্তি, বীরত্বব্যঞ্জক-আকৃতি, সুগঠিত, দীর্ঘকায়, রাজবেশভূষায় সুসজ্জিত তরুণ কিশোরকে দেখাইতেছিল দেবকুমারের মত সুন্দর। চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছিল—সন্ধ্যার তারার মত দীপ্তিমান্। বলিষ্ঠ বাহুতে ছিল দুর্জ্জয় শক্তি, কোষে ঝুলিতেছিল তীক্ষ্ণ তরবারি। রাজা বলিতে লাগিলেন : আপনারা কখনও মনে করবেন না—আমি মুসলমানের অধীনতা মেনে নিয়ে দেশকে বিলিয়ে দেবো শত্রুর কাছে! সে হবে না।

মন্ত্রী ও সভাসদেরা কহিলেন : তবে কি আপনি চান, এই শান্তিপূর্ণ রাজ্যে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে—প্রজার ঘরে ঘরে হাহাকার তুলে দিতে, শস্যপূর্ণ শ্যামল এই কনৌজের প্রান্তরে প্রান্তরে শ্মশানের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে দিতে ?

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কহিলেন : দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন দুর্দ্দিন আমাদের যদি আসে আসুক, তবু আমি যুদ্ধ করবো, আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো। পিতা মহারাজ জয়চন্দ্র স্বদেশদ্রোহী হয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারা তরাইনের যুদ্ধে পাপ করেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করবো তাঁর পুত্র আমি। দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে সে পাপ ক্ষালন করবো। এই আমার পণ।

সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত ভাবে সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ কিশোর রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন —প্রভাতের সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল প্রকৃতির হাসির ন্যায় তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে দীপ্ত মহিমা—প্রসন্ন হাসি।

একজন সভাসদ বলিলেন : মহারাজ! রাজা জয়চন্দ্র চন্দাবারের যুদ্ধে নিজেই ত সে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।

: সে প্রায়শ্চিত্ত নয়। সে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড, পাপের দণ্ড। পিতা যদি অন্যান্য রাজাদের মত, পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেন, তাদের কোন সাহায্য না করতেন, তবে ভারতের ইতিহাসে হতো নবযুগের অভ্যুদয়। আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না। মুসলমান দূতকে বলুন,—আমরা সন্ধি করবো না। সেই মর্ম্মে পত্র দিন্। আমার আদেশ অন্যথা করবেন না। আমি পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—কারো বাধা মানবো না। প্রায়শ্চিত্ত করবো! নিজের রক্ত দিয়ে হবে সে প্রায়শ্চিত্ত!

: হাঁ পুত্র, প্রায়শ্চিত্ত করো—প্রায়শ্চিত্ত করো! আমার আদেশ—মাতৃ-আদেশ—প্রায়শ্চিত্ত করো!

রাজসভার সকলে আশ্চর্য্য হইলেন—দেখিলেন শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা ত্রৈলোক্য-মোহিনী দেবী ভদ্রা—রাজা জয়চন্দ্রের মহিষী—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মাতা রাজসভাতে উপস্থিত।

সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভিবাদন করিলেন। ভদ্রা দেবী বলিতে লাগিলেন : পুত্র, আমি অন্তরাল হতে তোমাদের সব কথা শুনেছি। জান কি পুত্র, যেদিন তোমার পিতা চন্দাবারের রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন—শুনলাম, তিনি বীরের মতই যুদ্ধ করেছিলেন। একদিন যে অন্যায় করেছিলেন, তার যোগ্য দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, তবু আমি তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে এক
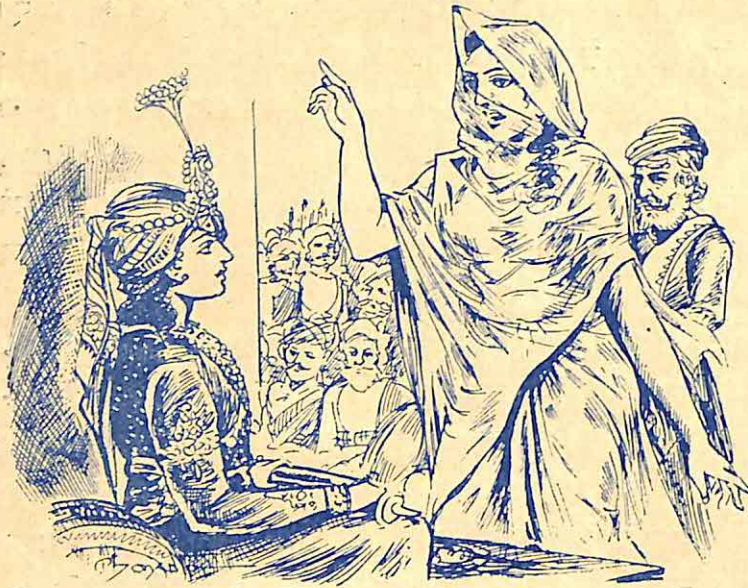
বিন্দু অশ্রুও ফেলিনি। যে অপমানের জ্বালা আমার অন্তরকে দগ্ধ করেছিলে দেশের সর্ব্বত্র বিশ্বাসঘাতকের মহিষী বলে যে গ্লানি আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল, তা কি ভুলতে পারি ? আমার সপত্নীরা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন, আমি যাইনি শুধু তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আজ আমি গর্ব্ব অনুভব করছি যে, তুমি দেশকে নিজের স্বার্থের জন্য বিদেশীর পায়ে বিকিয়ে দিতে যাওনি।—হাঁ, যুদ্ধ করো। শত্রু দমন করো। উপযুক্ত পুত্রের মত পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো। কি বলেন আপনারা ?

সভার সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহাদের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

রাজা হরিশ্চন্দ্র মাতার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন : আশীর্ব্বাদ করো মা, যেন আমি তোমার যোগ্য পুত্র হতে পারি। তোমার মুখ, দেশের গৌরব রক্ষা করতে পারি।

ভদ্রা দেবী পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন : আশীর্ব্বাদ করি, পুত্র, তুমি বিজয়ী হয়ে এসো রাজধানীতে।

নগরে বাজিয়া উঠিল বীর-উৎসব দামামা—মন্দিরে মন্দিরে ধ্বনিত হইল 'হর হর বম্ বম্' রব।

—দুই—

মহারাজ জয়চন্দ্র চন্দাবারের যুদ্ধে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া করিয়াছিলেন স্বদেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু সেই যুদ্ধের পরও গাহড়বাল সাম্রাজ্য মুসলমান অধিকারে যায় নাই। জয়চন্দ্রের

মৃত্যুর পর রাজা হইলেন পুত্র হরিশ্চন্দ্র দেব। হরিশ্চন্দ্র যখন রাজা হইলেন, তখন ছিলেন তিনি বালক। মাতা ভদ্রা দেবী তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন, বালক নরপতিকে অস্ত্রে শস্ত্রে শাস্ত্রে এবং রাজনীতি বিষয়ে যোগ্য বিদ্বান ও যোদ্ধার শিক্ষাধীনে রাখিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন। মাতা ভদ্রা দেবীর সুশিক্ষাগুণে হরিশ্চন্দ্র দেব সাহসী ও বীর রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহায় বয়স যখন মাত্র সপ্তদশ বর্ষ, সে সময়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে হইলেন কান্যকুব্জের রাজা।

শিহাবুদ্দীন ঘোরী জয়চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাখিয়া গেলেন একজন যোগ্য প্রতিনিধিকে। নাম কুতবুদ্দীন আইবেক।

কুতবুদ্দীন সাহসী ও নির্ভীক বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি একে একে ঝাঁসী, মীরাট, দিল্লী, রণথম্বোর প্রভৃতি অধিকার করিলেন। হিন্দুরা তাঁহাদের অনৈক্য, ব্যক্তি ও জাতিগত বিদ্বেষের দরুন মিলিত ভাবে শত্রুকে বাধা দিলেন না। এই কুতবুদ্দীনের একজন সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ খিলিজী বাঙ্গলাদেশে নবদ্বীপ অধিকার করেন বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। সে কথা এখানের আলোচ্য বিষয় নয়।

ইলতুৎমিস্ যখন দিল্লীর সিংহাসনে, তখন তাঁহার পণ হইল যেরূপে পারেন হিন্দু রাজাদের পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিবেন। কুতবুদ্দীনের ন্যায় তাঁহারও আকাঙ্ক্ষা হইল— ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাঁহার লক্ষ্য পড়িল কান্যকুব্জের দিকে। তিনি জানিতে পারিলেন যে, সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ রাজা হরিশ্চন্দ্র কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসিয়াছেন। একজন বালকের অধিকৃত রাজ্য অধিকার করা এমন কি কঠিন কাজ! তারপর স্বদেশদ্রোহী জয়চন্দ্রের পুত্রের পক্ষে ভীরু ও কাপুরুষ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সুলতান ইলতুৎমিস কান্যকুব্জ বিজয়ের ভার দিলেন—তাঁহার দক্ষ সেনাপতি মহম্মদ বিন্ সামের উপর।

মহম্মদ বিন্ সাম সৈন্যদল সহ কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইয়া রাজ্যের প্রান্তদেশে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং সহসা রাজ্য আক্রমণ করিয়া সৈন্য ক্ষয় করা অপেক্ষা কান্যকুব্জ-নরপতিকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সুলতানের প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন।

হরিচন্দ্র দেব যুদ্ধ চাহিলেন—সন্ধি নয়, আত্মসমর্পণ নয়। তরবারির মুখেই মুসলমান নরপতির আত্মসমর্পণ-লিপির উত্তর দিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন। কাজেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

—তিন—

বিশাল রণক্ষেত্র। দূরে গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। সেকালে ফরক্কাবাদ জেলার কাছে ছিল বিখ্যাত কনৌজ বা কান্যকুব্জ নগরী। এখনও সেখানে রাঠোর রাণা জয়চন্দ্রের রাজধানী কনৌজের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে—ভগ্ন মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ এখনও প্রাচীন গৌরব-কথা পথিককে স্মরণ করাইয়া দেয়। দূরে—প্রান্তরের শেষ সীমান্তে একটি ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীর পরপারে ছিল

মুসলমান শিবির। মুসলমানদের পক্ষে ছিল অগণিত পদাতিক, অশ্বারোহী, ধানুকী, হস্তিযূথ, শিবিরের পর শিবির, বিলাসের ছিল তাহাতে প্রচুর আয়োজন। অশ্বের হ্রেষা রবে, সৈন্যদের কলকোলাহলে রণপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইতেছিল। প্রান্তরবাহিনী শীর্ণা নদী বহিয়া যাইতেছিল কুল-কুল-কুল গানে।

এপারে কান্যকুব্জের অদূরবর্তী প্রান্তরে করিয়াছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র দেব সমর-সজ্জা। হস্তিযূথ তিন দিকে সারি সারি শোভা পাইতেছিল প্রাচীরের মত। সহস্র সহস্র অশ্বারোহী, পদাতিক, ধনুকধারী, বর্শাধারী পুরুষ ও নারী সৈন্য চারিদিক বেড়িয়া একটি ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র দেব, সেনাপতি বীরসিংহ, নয়নসিংহ প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষেরা করিতেছিলেন নেতৃত্ব। রাণী ভদ্রা দেবী স্বয়ং লইয়াছিলেন নারী-বাহিনীর পরিচালনা-ভার। কে প্রথম আক্রমণ করিবে তাহাই হইল লক্ষ্য। রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিলেন: মুসলমানেরা আগে আমাদের আক্রমণ করুক, তারপর আমরা করবো প্রতি-আক্রমণ।

এ পরামর্শ সকলেই গ্রহণ করিলেন।

মহম্মদ বিন্ সাম নিশ্চিন্ত ছিলেন—তিনি ভাবেন নাই একজন বালক রাজার হইবে এত বড় দুঃসাহস, যে সাহসের বলে তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে। তিনি নিশ্চিত বিজয়ের আশায় ছিলেন উৎফুল্ল। স্থির করিলেন, তিনিই প্রথমে আক্রমণ করিবেন কান্যকুব্জের সৈন্যদের। রণ-দামামা বাজিল তাঁহার ইঙ্গিতে। মুসলমান সৈন্যবাহিনী 'আল্লাহো আকবর' ও 'দীন্ দীন' রবে ছুটিয়া চলিল কান্যকুব্জের দিকে, স্বয়ং মহম্মদ বিন্ সাম লইলেন সৈন্য-পরিচালনার ভার। আরম্ভ হইল মহারণ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সসৈন্যে প্রস্তুত হইলেন শত্রু-দমন করিতে। বোঁ-বোঁ সোঁ-সোঁ শব্দে তীর ছুড়িতে লাগিল উভয় পক্ষ। অশ্বারোহী সৈন্যেরা উন্মুক্ত তরবারি ও বর্শা হস্তে ছুটিয়া আসিতে লাগিল প্রান্তর-বাহিনী নদীর তীরের দিকে, কিন্তু কনৌজ সৈন্যগণের প্রতি-আক্রমণে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতে-ছিল না। নদী ক্ষুদ্রকায়া হইলেও খরস্রোতা এবং গভীর ছিল, কাজেই কোন দিক দিয়াই তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। সেনাপতি বীরসিংহ নদীর দূর সীমানার অপর পার্শ্ব হইতে এবং নয়নসিংহ অপর দিক হইতে নদী যেখানে অগভীর সেখান দিয়া নদী পার হইলেন এবং অতি বেগে মুসলমান সেনাদের দুই দিক হইতে বেষ্টন করিয়া আরম্ভ করিলেন প্রবল আক্রমণ। মহম্মদ বিন্ সাম সম্মুখের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এবং অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত। হস্তিসহ নদী পার হইয়া একেবারে কনৌজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। অমনি নারী-বাহিনী তীর নিক্ষেপ করিয়া যে সব অশ্বারোহী সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। মহম্মদ বিন্ সাম অপর পারে—কাজেই তাহারা প্রমাদ গণিল।

এইবার প্রবল আক্রমণ ও যুদ্ধ চলিতে লাগিল উভয় পক্ষে। নদীর অপর তীরে কনৌজ সেনাপতি ও সৈনিকেরা দুইদিকে ব্যূহ রচনা করিয়া এমনভাবে মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করিতে লাগিল যে, তাহারা হতভম্ব হইয়া দিকে দিকে পলায়নপর হইল।

সেনাপতি মহম্মদ বিন্ সামকে দেখিতে পাইয়া সম্মুখে ছুটিয়া আসিলেন সসৈন্যে স্বয়ং বালক রাজা হরিশ্চন্দ্র দেব। শ্বেতবর্ণের এক অশ্বে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় শোভা পাইতেছিল স্বুবর্ণ-রত্ন-খচিত উষ্ণীষ, দেহ বর্ম্মে আবৃত, কোষে তরবারি, হস্তে বর্শা। মুসলমান সেনাপতিকে দেখিতে পাইয়া তিনি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিলেন এবং যে হস্তীর উপর ছিলেন মহম্মদ বিন্ সাম, সেই হস্তীর শুণ্ডের উপর বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাতে হস্তী ভীষণ বৃংহিতনাদে রণস্থল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। তাহার শুণ্ড হইতে প্রবলবেগে রক্ত ঝরিতেছিল। হস্তী কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাণভয়ে আরোহী সহ হিন্দু সৈন্য অনেককে দলিত ও মথিত করিয়া
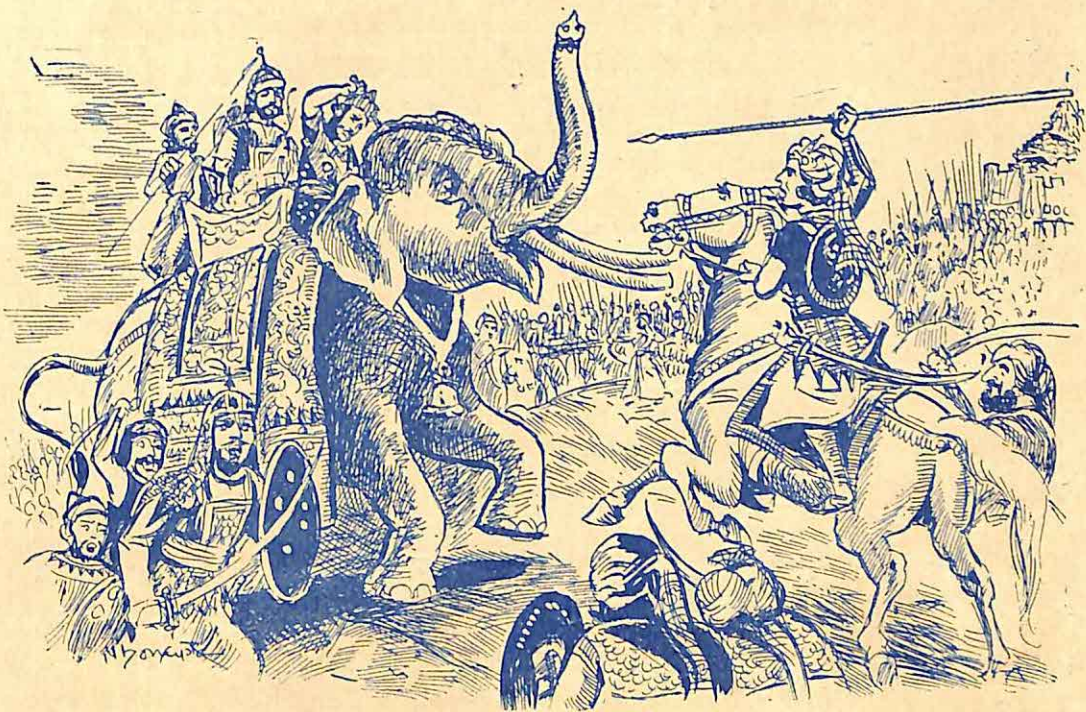
ছুটিতে লাগিল। হস্তীকে লক্ষ্য করিয়া কনৌজের ধানুকীরা, বর্শাধারী পদাতিক সৈন্যেরা তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দুঃসাহসিক হরিশ্চন্দ্র দেব তাঁহার রণতুরঙ্গম ছুটাইয়া দিলেন মুসলমান সেনাপতির দিকে। কিন্তু সুনিপুণ হস্তিচালক বর্শাবিদ্ধ অবস্থায়ই সেনাপতিসহ সেই আহত রণহস্তীকে বেগে নদীর অপর দিকে লইয়া গেল। যে সকল মুসলমান সেনা মহম্মদ বিন্ সামের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের একজনও প্রাণ লইয়া শিবিরে ফিরিতে পারিল না।

মহম্মদ বিন্ সাম দেখিলেন, তাঁহার সৈন্য-বাহিনী ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ হিন্দুসেনাদের আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে, আবার নদীর অপর পার হইতে বিজয়ের মহা উৎসবে উৎফুল্ল

হইয়া 'হর হর বম্ বম্' রবে আকাশ ও প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া দলে দলে হিন্দু সৈন্য ছুটিয়া আসিতেছে। চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী পলায়ন করিতেছে, সকলেই প্রাণ রক্ষার জন্য নিয়ম-নির্দ্দেশ না মানিয়া যে যেদিকে পারে ছুটিতেছে! কে সেই গতি ফিরাইবে?

মহম্মদ বিন্ সাম যাহা ভাবিতে পারেন নাই, তাহাই হইল। পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সসৈন্যে তিনি সুকৌশলে পশ্চাদপসরণ করিলেন। যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা তাঁহার অনুসরণ করিল। সহস্র সহস্র মুসলমান সেনার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল শোণিত-রঞ্জিত রণক্ষেত্রে।

সূর্য্যকরোজ্জল অপূর্ব্ব দীপ্তিমান্ প্রভাতে যে সমর আরম্ভ হইয়াছিল, রক্তমেঘরাগ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার হইল অবসান। রাজা হরিশ্চন্দ্র দেব, রাজমাতা ভদ্রা দেবী এই যুদ্ধে যে অসাধারণ সমর নৈপুণ্য, সাহস ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় বলিতে হইবে।

পিতা জয়চন্দ্র স্বদেশ ও স্বজনদ্রোহিতার দ্বারা বিদেশী শত্রুর সহায়তা করিয়া যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছিলেন নিজবংশে ও ভারতের ইতিহাসে, পুত্র সেই পাপের করিলেন প্রায়শ্চিত্ত। শত্রুর রক্তে তাঁহার তরবারি রঞ্জিত হইয়া জবাপুষ্পের লোহিতরাগের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল বিজয়-গৌরবে।

স্বাধীন গাহড়বাল রাজকেতন কান্যকুব্জের প্রাচীন দুর্গ-শীর্ষে পত্‌পত্ করিয়া উড়িতে লাগিল। এই বিজয়ে ভারতের অন্যান্য হিন্দু নৃপতিরা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলেন এবং শতমুখে প্রশংসা করিতেছিলেন এই বালক রাজার। যে মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ্‌গণ রাজাকে পরাজয়ের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন শতমুখে বালক রাজার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও রণ-কৌশলের জন্য ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

মাতা ভদ্রা দেবী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন: পুত্র, আমি তোমার বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছি। পিতার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করেছ তুমি। আর আমি অশ্রু বিসর্জ্জন করবো না। এবার আমি বীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাতা এই গৌরবের অধিকারিণী হয়ে আনন্দে মৃত্যুকে বরণ করবো। ধন্য তুমি!

মায়ের চরণধূলি মাথায় লইয়া অসি স্পর্শ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র দেব বলিলেন: জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই বাণী নিত্য স্মরণ করে আমি করবো আমার রাজ্যশাসন। কার সাধ্য কনৌজের স্বাধীনতা হরণ করে?

বালক রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহার এই পণ রক্ষা করিয়া স্বাধীন কান্যকুব্জের নৃপতি রূপে চির-স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

প্রত্যেকখানি ।/০ পাঁচ আনা

চাণক্য	—	নীলকমল সেন
তিলক	—	ঐ
শিবাজী	—	নবগোপাল দাস
* সার সৈয়দ আহম্মদ	—	ঐ
কবীর	—	ধীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতাপাদিত্য	—	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ঈশা খাঁ	—	ঐ
* গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	—	হরিশ্চন্দ্র সেন
চিত্তরঞ্জন	—	ঐ
গোখেল	—	ঐ
অশ্বিনীকুমার দত্ত	—	জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষাল
তৈলঙ্গ স্বামী	—	সুরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
ভক্তকবি তুলসীদাস	—	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	—	ঐ
* অক্ষয়কুমার দত্ত	—	অক্ষয়কুমার রায়

প্রত্যেকখানি ॥০ আট আনা

ছোটদের আলিবাবা	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ছোটদের আলাদিন	—	ঐ
ছোটদের আবুহোসেন	—	ঐ
* ছোটদের ঈশপ	—	তারাপদ রাহা
* ছোটদের গ্রিম	—	ঐ
ছোটদের গোপাল ভাঁড়	—	ঐ
* ছোটদের রবিন হুড্	—	ঐ
* ছোটদের জাতক	—	ঐ
* ভক্তির ডোর (নাটক)	—	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
কর্ণেল চট্পটি	—	রবীন্দ্রনাথ সেন
* কৃষ্ণ-সখা	—	মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত

প্রত্যেকখানি ॥৵০ দশ আনা

বই		লেখক
ছোটদের আনন্দমঠ	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ছোটদের রাজসিংহ	—	ঐ
* ধ্রুব	—	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
* ছেলেদের পূজার কথা	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
* মহাকাশ	—	কালীপদ চট্টোপাধ্যায়
* বাংলা সাহিত্যের কাহিনী	—	নীরেন্দ্র গুপ্ত
মহাযুদ্ধের দান	—	প্রভাতকুমার গোস্বামী
পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ	—	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
* জীবনের আলো	—	সারদারঞ্জন পণ্ডিত
* ছোট হলেও ছোট নয়	—	দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
* রাজা সীতারাম (নাটক)	—	ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
* বাংলার কুটীর-শিল্প	—	ঐ
* বিজ্ঞানী ও বীজাণু	—	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* ভীষ্ম	—	নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
প্রহ্লাদ	—	ঐ
পদ্মিনী	—	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শকুন্তলা	—	অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

প্রত্যেকখানি ৸০ বার আনা

বই		লেখক
* ছোটদের রামায়ণ	—	তারাপদ রাহা
* হর্‌রা	—	সুনির্ম্মল বসু
* কুমকুম্	—	ঐ
* ঝিল্‌মিল্	—	ঐ
* আল্‌পনা	—	ঐ
* পাতাবাহার	—	ঐ
তারাবাই	—	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
* সাতসমুদ্র তেরনদীর পাড়ে	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রত্যেকখানি ৷৷৹ বার আনা

বই		লেখক
* পরশমণি	—	বরদাকুমার পাল
* জ্ঞান-বিজ্ঞান	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
* বাজিকর	—	ললিতমোহন নন্দী
ছেলেখেলা	—	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
* চূড়ামণি	—	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
* সাঁঝের বাতি	—	ঐ
* বাদুড়-বয়কট	—	ঐ
* সেয়ানে সেয়ানে	—	ঐ
* পূজার ছুটি	—	ঐ
* রত্নপুরী	—	ঐ
* রূপকথার আসর	—	প্রভাতকুমার শর্ম্মা
সুরের পরশ	—	অনিন্দিতা চৌধুরী
* ঝুমঝুমি	—	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
* পারিজাত	—	ঐ
* মণ্টুর এক্সপেরিমেণ্ট	—	ঐ
* জয়ডঙ্কা	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
* আগডুম-বাগডুম	—	ঐ
* ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি	—	ঐ
* নাগরদোলা	—	হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
নবান্ন	—	ঐ
* খুকুর ছড়া	—	ঐ
* খুকুরাণীর খেলা	—	বরদাকান্ত মজুমদার
* চোর জামাই	—	বন্দে আলী মিয়া
নন্দের পাগল (নাটক)	—	বঙ্কিম দাশগুপ্ত
* মহরম	—	নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
দুর্গাদাস	—	অলকা দেবী

(স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের "দুর্গাদাস" নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)

প্রত্যেকখানি ৸৹ বার আনা

ঠেকে হাবুল শেখে	—	ধীরেন বল
ছবি ও গাথা	—	চিত্তরঞ্জন মাইতি
* সরল রামায়ণ	—	রামকমল বিদ্যাভূষণ
একলব্য (নাটক)	—	মতিলাল দাশ
হারানো মাণিক	—	মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
* কাজের বিজ্ঞান	—	রাধাভূষণ বসু
* ছেলে-চুরি	—	রবীন্দ্রনাথ সেন
* জাহাজের কথা	—	ঐ
রাম-চরিত	—	
আমার বন্ধু ভাস্কর	—	ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
* রঙ্‌মহল (কিশোর নাটিকা-সমষ্টি)	—	ধীরেন্দ্রলাল ধর
আনন্দমঠ (নাট্যরূপ)	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্যেকখানি ৸৶৹ চৌদ্দ আনা

* রাজকুমার	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
* যিশুখৃষ্ট	—	বরদাকান্ত মজুমদার
* এশিয়ার ছেলেমেয়ে	—	ভীমাপদ ঘোষ
* সপ্ত-বৈচিত্র্য	—	হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
লর্ড পাওএল	—	বসন্তকুমার দাস
* মজার দেশ	—	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা

* হাবুল-চন্দোর	—	ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
* রাণা প্রতাপ সিংহ	—	নারায়ণচন্দ্র চন্দ
মেনির কুটুম	—	সুরেন্দ্রনাথ সেন
* বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু (১ম)	—	বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
* রূপকথা	—	সরোজকুমার সেন
কেবল মজা	—	প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
* দুনিয়ার আজব	—	মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা

* রবিন্‌সন্ ক্রুশো	—	দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা
* টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার	—	হেম চট্টোপাধ্যায়
যমরাজার বিপদ	—	চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
খেয়াল খুশী	—	আশা দেবী
* ছোট্‌ঠাকুর্দ্দার কাশীযাত্রা	—	আশাপূর্ণা দেবী
হে বীর কিশোর	—	মণীন্দ্র দত্ত
* নতুন যুগের রূপকথা	—	ঐ
* ঠাকুর্দ্দা	—	বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
মানুষ হও	—	ঐ
* তুমি কোন্ দলে ?	—	ঐ
* শঙ্কর (১ম)	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
* শঙ্কর (২য়)	—	ঐ
* আলিবাবা	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
* আলাদিন	—	ঐ

(সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালা)

* আনন্দমঠ	(সম্পাদক)	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
* কপালকুণ্ডলা	—	ঐ
* চন্দ্রশেখর	—	ঐ
* রাজসিংহ	—	ঐ
* রজনী	—	ঐ
* দেবী চৌধুরাণী	—	ঐ
* ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী (একত্রে)	—	ঐ
* সীতারাম	—	ঐ
* মৃণালিনী	—	ঐ
বিষবৃক্ষ	—	ঐ
* দুর্গেশনন্দিনী	—	ঐ
কৃষ্ণকান্তের উইল	—	ঐ

প্রত্যেকখানি ১৲ এক টাকা

* সাংগ্রিলার মঠে	—	দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
* ভোলানাথ	—	কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
* দাদুর বৈঠক	—	কাদের নওয়াজ
দেওয়ালীর আলো	—	অমিতাকুমারী বসু
* কল্প-কথা	—	শিবরতন মিত্র
* বিজ্ঞানের হাতছানি	—	তারাপদ রাহা
বহুরূপী	—	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
মুখোসের দোকান	—	কুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রত্যেকখানি ১৷৹ পাঁচসিকা

* ছুটির গল্প	—	বরদাকুমার পাল
পদ্মাপার	—	জসীম উদ্‌দীন
* রবিন্‌সন্ ক্রুশো	—	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* জান কি ?	—	গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
অন্তিমে গান্ধীজি	—	কালীপদ চট্টোপাধ্যায়
মহাচীনে মহাসমর	—	ধীরেন্দ্রলাল ধর
* টম কাকার কাহিনী	—	ঐ
* ডেভিড কপারফিল্ড	—	ঐ
* হরে মাঝি	—	কুমুদরঞ্জন মল্লিক
* বাংলার মনীষী	—	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
* কাজের কথা	—	ভীমাপদ ঘোষ
* বিজ্ঞান ও বিস্ময়	—	রাধাভূষণ বসু
* পূজার পড়া	—	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
* কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ	—	ঐ
* বিজ্ঞানের মায়াপুরী	—	পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
* আরব্যোপন্যাসের গল্প	—	সুরেন্দ্রনাথ রায়
* হাসির দেশ	—	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
* সুন্দরবন	—	রবীন্দ্রনাথ সেন

প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা

সপ্তকাণ্ড	—	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
* গল্পের আল্পনা	—	হেমেন্দ্রলাল রায়
* ছোটদের বেতার	—	দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
* যারা জ্বেলেছিল জীবনের দীপ	—	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
* মধুমতীর বাঁকে	—	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* আলোকের দেশ	—	ঐ
* আফ্রিকার জঙ্গলে	—	ঐ
* পাঁচ শিকারী	—	ঐ
* ডাকাতের ডুলি	—	ঐ
* গল্প-সপ্তক	—	ঐ
* রাজতরঙ্গিণীর গল্প	—	দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
* মণ্টু	—	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* লৌহ মুখোস	—	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নীল-দর্পণ	—	বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কাদম্বরী	—	ঐ
* জোয়ান অব আর্ক	—	নারায়ণচন্দ্র চন্দ
* অজানা দেশে মঙ্গোপার্ক	—	ঐ
* মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত	—	সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী
* বঙ্গ-বিজেতা	—	ঐ
পয়গম্বরদের গল্প	—	বন্দে আলী মিয়া
* হাদিসের গল্প	—	ঐ
* গল্পের আসর	—	ঐ
* ঈশপের গল্প	—	তারাপদ রাহা
* সাতরাজ্যের গল্প	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
* জীবন জেগেছে যার	—	গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ
প্রাত্যহিক বিজ্ঞান	—	লতিকা মুখোপাধ্যায় ও গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা

* প্রকৃতির পরাজয় — আবদুর রশিদ
* বাদলা দিনের গল্প — ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
দু চোখ যেদিকে যায় — ঐ
Bankim Chandra's
* **Ananda Math** — Edited by S. N. Chaudhuri

প্রত্যেকখানি ১॥০ দেড় টাকা

* কাফ্রি-মুল্লুকে — বরদাকুমার পাল
* গল্পের ঝরণা — হেমেন্দ্রলাল রায়
* পাঁচ সাগরের ঢেউ — ঐ
* রামধনু — ললিতমোহন নন্দী
ওমর ফারুক — মহম্মদ হবীবুল্লাহ
* ঝাঁসীর রাণী — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
* গান্ধীজীকে জানতে হলে — হরপদ চট্টোপাধ্যায়
* সাগরিকা (১ম) — রমেশচন্দ্র দাস
* সাগরিকা (২য়) — ঐ
* টলষ্টয়ের আরো গল্প — দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
* মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র — রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
* বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু (২য়) — বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
* ভোম্বোল সর্দ্দার — খগেন্দ্রনাথ মিত্র
* বন্দী কিশোর — ঐ
মেবার-গৌরব — বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
* আলালের ঘরের দুলাল — ঐ
* হোঁদল কুৎকুৎ — প্রফুল্লচন্দ্র বসু
* ঘ্যাং-ব্যাং — কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
* স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — ভীমাপদ ঘোষ
সোনালী সকাল — বীরেন দাশ
* জঙ্গলের খবর — বন্দে আলী মিয়া
* কোরাণের গল্প — ঐ

শ্যামশ্রী
কেশ চর্চার
শ্রেষ্ঠ উপকরণ
আয়ুর্বেদীয়
সুবাসিত কেশ তৈল
- উপাদান -
মধুর
- গন্ধ -
আশুতোষ ঔষধালয়
৫ নং বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২